পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত
ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার

পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত

ড° দীনেশচন্দ্র সরকার

সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে আমি যখন এক বৎসরের জন্য বিশ্ব-ভারতীর Visiting Professor হয়ে শান্তিনিকেতন যাই, তখন থেকে সেখানকার প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক অশীতিপর-বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। তার পূর্বে তাঁর সংগে আমার সাক্ষাৎ বা পত্রব্যবহার খুব কমই হয়েছিল। কিন্তু আমি দেখে অবাক হলাম যে, আমার ঐতিহাসিক রচনা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অতি উচ্চ। তিনি আমাকে অগ্রজের স্নেহে গ্রহণ করলেন এবং প্রথম থেকেই দাবি জানালেন যে, আমাকে প্রাচীন বাংলার একখানি পূর্ণাংগ ইতিহাস লিখতে হবে ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত আমার Inscriptions of Asoka পুস্তকখানির মত একখানি বই বাংলাভাষায় প্রকাশ করতে হবে। অশোক বিষয়ক বইটি সম্পর্কে তিনি বললেন, "It is worth its weight in gold." শুনে আমি হতবাক হয়েছিলাম। কারণ তিনি স্বয়ং 'ধর্মবিজয়ী অশোক' (১৯৪৭)-এর গ্রন্থকার। এই উদার মত প্রকাশে তাঁর যে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি গভীর নিষ্ঠা প্রকাশ পেল, আমার দীর্ঘজীবনে আমি এমন আর কখনও দেখিনি। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কারণ আমি পরে জেনেছি। সেনমহাশয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একজন অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক নিযুক্ত হয়ে প্রথমে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও পরে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়-দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলার ইতিহাসের আদিযুগ নিয়ে গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি এই কাজ অসম্পূর্ণ রেখে জীবন-সংগ্রামের তাগিদে বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করতে বাধ্য হন। এই নূতন ক্ষেত্রে তিনি প্রচুর সম্মানের অধিকারী হয়েছেন, কিন্তু তবু তাঁর প্রথম জীবনের প্রিয় ক্ষেত্রটিকে ভুলতে পারেন নি। 'দেশ' পত্রিকায় (৭.১১.৮১, পৃষ্ঠা ১১ থেকে) প্রবোধচন্দ্র সেন কৃত 'আমার সহপাঠী বন্ধু নীহাররঞ্জন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যা হোক, আমি অগ্রজপ্রতিম সুহৃদের পরামর্শ শিরোধার্য করলাম এবং প্রথমে আমার 'অশোকের বাণী' (জানুয়ারী, ১৯৮১) প্রকাশিত হল। এই সময়ে আমার 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসংগ' (জানুয়ারী, ১৯৮২) বইখানি

প্রকাশের ব্যবস্থা হয় এবং সেনমহাশয় সেটিকে আমার 'প্রাচীন বাংলার ইতিহাস'-এর এক ধরনের উপক্রমণিকা হিসাবে গ্রহণ করে তার একটা মুখবন্ধ রচনা করে দেন। মুখবন্ধে আমার ও আমার ঐ বইদুটির তিনি যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, তাতে আমি অভিভূত হই। 'শিলালেখ-তাম্রশাসনের প্রসঙ্গ' সম্পর্কে তিনি পরেও আমাকে লিখেছেন,
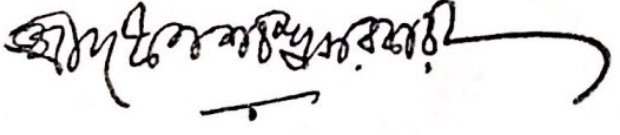
"তোমার এই বই আমাদের ইতিহাস-সাহিত্যে একটি অমূল্য রত্ন বলে গণ্য হবে। তোমার লেখনী রত্নপ্রসূ হোক, আরও সুসম্মান পাক। এই কামনা করি সর্বান্তঃকরণে। আমার দীর্ঘায়ু হওয়া সার্থক হয়েছে তোমার বই পড়বার সুযোগ পেয়ে। অনেক দুঃখ-নৈরাশ্যের মধ্যেও আর কিছুদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছা হয় শুধু তোমার লেখা প্রাচীন বাংলার ইতিহাস দেখে ও পড়ে যাবার জন্য। এটাই আমার শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা।" তাঁর এই ইতিহাস-পাগল মনোভাবের কারণও তিনি একটা চিঠিতে প্রকাশ করেছেন।—"আমার জীবনের ব্যর্থবাসনা সার্থক হয়েছে তোমার মধ্যেই। আমি ঠিক যে জিনিস চেয়েছি সারাজীবন তা-ই দেখতে পেয়েছি তোমার মধ্যে, তোমার মনের গঠনে আর তোমার লেখাতে। এটাই আমার vicarious satisfaction। জীবনের শেষধাপে পা দিয়ে অবশেষে যে আমার অভীষ্টের সাক্ষাৎ পেলাম এই চরিতার্থতা লাভের আনন্দও তো অপরিমেয়।"

বর্তমান পুস্তকখানিকে আমার প্রাচীন বাংলার ইতিহাস-রচনা প্রয়াসের আংশিক ফল মনে করতে হবে। এটিকে যথাসম্ভব শীঘ্র সেনমহাশয়ের হস্তে অর্পণ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য তিনি যা চান, এ তার অংশমাত্র। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস তিনি আমাকে ইংরেজীতেও লিখতে বলেছেন। যাই হোক, আমার ভরসা নেই যে, আমার বই পড়ে সেনমহাশয় সম্পূর্ণরূপে পরিতোষ লাভ করবেন। কারণ এ বিষয়ে তাঁর মনে একটা দীর্ঘদিনের আদর্শ আছে। আমার রচনা হয়তো পুরোপুরি তদনুযায়ী হবে না।

এই গ্রন্থে যথাসম্ভব বাগ্‌বিস্তার বর্জনের চেষ্টা করেছি যাতে অকারণে এর আয়তন বৃদ্ধি না হয়। কিন্তু আমার জ্ঞান-বিশ্বাসমত মূল্যবান তথ্যাবলী কিছুই বাদ দেওয়া হয় নি। বরং এতে অনেক নূতন তথ্যের স্থান হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে গয়া সংগ্রহশালায় রক্ষিত পালবংশীয় রাজা ১ম শূরপালের ১২শ রাজ্যবর্ষের একটি মূর্তিলেখ। যখন এই অভিলেখটির পাঠোদ্ধারের সুযোগ পাই, তখন পুস্তকখানির প্রথমদিকের কিয়দংশ (পৃষ্ঠা ১-৩২) ছাপা হয়ে গিয়েছিল। পৃষ্ঠা ৩৯ এবং ১৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট ... দ্রষ্টব্য।

যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও বইটি ছাপাতে মুদ্রণাশুদ্ধি এড়াতে পারি নি। সেজন্য পাঠকগণের কাছে মার্জনা চাই। তাঁরা এতে যে-কোনও রকমের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখতে পাবেন, দয়া করে আমাকে জানালে আমি অবশ্যই সাধ্যমত যথাসময়ে সেটা সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হব।

পুস্তকখানি অল্প সময়ের মধ্যে ছেপে বের করার কৃতিত্ব 'সাহিত্যলোক'-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহেই আমার পক্ষে বইটি বের করা সম্ভব হল। তিনি আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আনন্দবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগারিক শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল মহাশয় গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছেন। তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

৬৪৫ নিউ আলিপুর,
কলকাতা ৭০০০৫৩।
৯. ৮. ১৯৮২

শ্রীসুধাংশুশেখর চক্রবর্তী

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ

উপক্রমণিকা

গ্রন্থরচনার মৌলিক উপাদান

পরিশিষ্ট

চিত্রসূচি

প্রথম ভাগ

উপক্রমণিকা

গ্রন্থ রচনার মৌলিক উপাদান

'পাল-সেন যুগ' নামের সার্থকতা

ভারতের ইতিহাসে বাংলা-বিহারের পালবংশ অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা প্রথম গোপাল (আ ৭৫০-৭৫ খ্রী) অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্বদক্ষিণ বাংলার সিংহাসন লাভ করেন। ক্রমে তাঁর রাজ্যের বিস্তার ঘটে এবং তাঁর পুত্র ধর্মপালের (আ ৭৭৫-৮১২ খ্রী) সময়ে বাংলা-বিহারের বাইরে পঞ্চালদেশের রাজধানী কান্যকুব্জ অর্থাৎ আধুনিক উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত ফররুখাবাদ জেলার কনৌজে পর্যন্ত কিছুকালের জন্য পালসম্রাটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পালবংশের অষ্টাদশ নরপতি মদনপাল (১১৪৩-৬১ খ্রী) যে প্রথম গোপালের জনৈক উত্তরপুরুষ ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। তিনি বিজয়সেন (আ ১০৯৬-১১৫৯ খ্রী) ও তৎপুত্র বল্লালসেনের (আ ১১৫৯-৭৯ খ্রী) সমসাময়িক ছিলেন। আনুমানিক ১১৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরবাংলায় মদনপালের অধিকার স্বীকৃত হত। তারপর সেখানে বিজয়সেনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মদনপাল বিহারে রাজত্ব করতে থাকেন। বিহারে মদনপালের পর আর দুজন পালবংশীয় নরপতির শাসনের কথা জানা যায়। তাঁরা হলেন গোবিন্দপাল (আ ১১৬১-৬৫ খ্রী) এবং পলপাল (আ ১১৬৫-১২০০ খ্রী)। সুতরাং পালবংশের রাজত্বকাল মোটামুটি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ৪৫০ বৎসর। অবশ্য এর শেষের অর্ধশতাব্দীতে পালরাজারা বাংলার অধিকারচ্যুত ছিলেন। কিন্তু পাল-ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আগেও ঘটেছে। দীর্ঘকালের জন্য রাজা নারায়ণপালকে (আ ৮৬০-৯১৭ খ্রী) তাঁর রাজত্বের শেষার্ধে এবং রাজ্যহীন অবস্থায় কালাতিপাত করতে হয়েছিল।

তাঁর পুত্র রাজ্যপালের (আ ৯১৭-৫২ খ্রী) রাজত্বের প্রথমভাগে বাংলায় পাল অধিকার স্বীকৃত হত না।

পালরাজ্যের তুলনায় সেনরাজ্য অল্পকালস্থায়ী। বিজয়সেন প্রথমজীবনে পালরাজের সামন্ত ছিলেন। জীবনের শেষভাগে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় তাঁর অধিকার সুদৃঢ় হয়। তাঁর পুত্র এবং পৌত্র লক্ষ্মণসেনের (আ ১১৭৯-১২০৬ খ্রী) আমলে অল্পকালের জন্য বিহারের অঞ্চলবিশেষে সেন-অধিকার প্রসারিত হয়েছিল। লক্ষ্মণসেনের সেনাদল নাকি পুরী, বারাণসী এবং প্রয়াগ অঞ্চলে অভিযান করেছিল। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষদিকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলার দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তর-ভাগে রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চলে তুর্কী মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেনরাজারা পূর্ববাংলায় রাজত্ব করতে থাকেন। লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের (আ ১২০৬-২৫ খ্রী) উত্তরাধিকারীরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন। অতঃপর দেববংশীয় অরিরাজদনুজমাধব উপাধিধারী দশরথদেব বিক্রমপুর অধিকার করে নেন এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী রাজত্ব করেন। এর পর পূর্ববাংলায় মুসলমান অধিকার প্রসারিত হয়।

বর্তমান গ্রন্থে আমরা পাল, সেন ও দেববংশের এবং অন্যান্য সমসাময়িক রাজবংশসমূহের রাজনীতিক ইতিহাস আলোচনা করেছি। এদের মধ্যে পালদের সাড়ে চারশত বৎসরের পর প্রথম সেনেরা আর অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত এবং তারপর দেববংশীয় রাজগণ আরও অর্ধশতাব্দী রাজত্ব করেছিলেন। অবশ্যই পালবংশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী এবং দেববংশের গুরুত্ব সবচেয়ে কম। যা হোক, আমাদের আলোচিত যুগকে 'পালযুগ', 'পাল-সেন যুগ' কিংবা 'পাল-সেন-দেব যুগ' বলা যেতে পারে। তবে দেববংশীয়রাজগণের রাজ্য বাংলার একাংশে মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইতিহাসে তাঁদের কৃতিত্বও পাল এবং সেন-বংশীয় রাজাদের তুলনায় নগণ্য বলতে হবে। সুতরাং তাঁদের পাল ও সেন-বংশীয়দের সমকক্ষ হিসাবে উল্লেখ করে সমান মর্যাদা দেওয়া নিরর্থক। এমন কি কেউ যদি সেনবংশের ইতিহাসকেও পাল-যুগের অন্তর্ভুক্ত করেন, ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু স্বল্পকাল-স্থায়ী হলেও উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশে লক্ষ্মণসেনের অভিযান সেনরাজত্বের কৃতিত্বের দাবি ধর্মপালের গৌরবের স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। তাছাড়া বৌদ্ধ পালবংশীয়দের পরে দক্ষিণভারতের গোঁড়াহিন্দু সেনরাজগণ এবং তাঁদের দাক্ষিণাত্য থেকে আগত অনুগামীরা যে

ও ধর্মজীবনে নূতন সূত্র যোগ করেছিলেন, সেটা উপেক্ষার বিষয় নয়। বল্লালসেনের 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' এবং হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সেনযুগের উল্লেখযোগ্য অবদান। লক্ষ্মণসেনের প্রসাদপুষ্ট পাঁচজন কবির মধ্যে উমাপতিধরের দেওপাড়া প্রশস্তি, ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্য এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ইত্যাদি বিশেষ মূল্যবান। ভারতীয় রাজগণের মধ্যে লক্ষ্মণসেন এক অতি-সম্মানিত আসনের অধিকারী ছিলেন, মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীন এ কথা বলে গেছেন। সেন-রাজাদের আমলে দক্ষিণভারতের বহুলোক বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করে। এই সব কারণে বাংলার ইতিহাসে তাঁদের একটা বিশিষ্ট মর্যাদা আছে। তাই আমরা 'পাল-সেন যুগ' নামটি বাঞ্ছনীয় মনে করেছি।

আরও একটা কারণে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেটা এই যে, তাঁর সময়েই ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী রাঢ় ও বরেন্দ্র অধিকার করেন। তিনি মুহম্মদ ঘূরী অর্থাৎ মুইজ উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ সামের নামে 'গৌড়বিজয়' জ্ঞাপক সোনার টঙ্ক প্রচার করেছিলেন। ঘটনাটির তারিখ ৬০১ হিজরী সালের ১৯শে রমজান অর্থাৎ ১২০৫ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী শহর সম্ভবতঃ নোদীয়া বা নবদ্বীপের কিছু পরে অধিকৃত হয়েছিল।

আমাদের গ্রন্থের নামে 'বংশানুচরিত' কথাটি পুরাণ থেকে নেওয়া। পুরাণের 'পঞ্চলক্ষণ'; এটা তার মধ্যে একটি।

দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য এবং লেখ-মুদ্রাদির সাক্ষ্য

প্রাচীন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলারও সেকালের লিখিত কোনও ইতিহাসগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নি। তাই নানাধরণের পুস্তকাদি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সেযুগের বাংলার ইতিহাস রচনা করতে হয়েছে। লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধারকার্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য পাওয়া গেছে পাল ও সেন-বংশীয় রাজগণের লেখাবলী থেকে। এ পর্যন্ত আমরা যা জেনেছি, তার বেশীর ভাগ ঐ সূত্রে জানা গিয়েছে। তাই আমরা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়াংশে লেখমালার একটি তালিকা উদ্ধৃত করেছি।

ইতিহাস উদ্ধারের এই কাজে দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থে উল্লিখিত কোনও কোনও বিষয় থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। পাল-সেন যুগসম্পর্কে দেশীয়সাহিত্যের কথা উঠলে প্রথমতঃ তিনখানি সংস্কৃতকাব্যের কথা মনে হয়। সেগুলি অভিনন্দরচিত 'রামচরিত' (নবম শতাব্দী), সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রাম-চরিত' (দ্বাদশশতাব্দী) এবং আনন্দভট্টের 'বল্লালচরিত' (১৫২০ খ্রী)। অভিনন্দ যুবরাজ হারবর্ষনামক পালবংশীয় বা ধর্মপালবংশীয় নরপতির সভায় তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই যুবরাজ সম্ভবতঃ ধর্মপালের পুত্র ছিলেন ; কারণ তাঁকে 'বিক্রমশীল-নন্দন' বলা হয়েছে এবং 'বিক্রমশীল' ধর্মপালের উপাধি ছিল বলে বোধ হয়। আনন্দভট্টের গ্রন্থে বল্লালসেনের সম্পর্কে কতকগুলি কিংবদন্তী আছে। কিন্তু সেগুলির ঐতিহাসিকতায় পণ্ডিতেরা সন্দিহান। গোপালভট্ট নামক এক ব্যক্তিও ঐ নামের এবং ঐ ধরনের একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং তার অনুকরণও হয়েছিল। সন্ধ্যাকরনন্দীর গ্রন্থের শ্লোকসমূহে রামায়ণ-কাহিনীর নায়ক রামচন্দ্র এবং পালবংশীয় রাজা রামপালের বিবরণ দ্ব্যর্থক ভাষায়

বর্ণনা করা আছে। ঐতিহাসিকের কাছে এই গ্রন্থ এবং এর টীকা (সম্ভবতঃ সন্ধ্যাকরের নিজেরই রচিত) অত্যন্ত মূল্যবান। গ্রন্থশেষের কয়েকটি শ্লোকে রামপালের উত্তরাধিকারীদের উল্লেখ আছে। তাতে দেখা যায়, মদনপালের রাজত্বকালে গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়। তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন এবং বিদ্রোহীদের অন্যতম নায়ক কৈবর্তবংশীয় দিব্য বা দিব্বোক বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীদেশে (উত্তরবাংলায়) স্বাধীনরাজ্যের পত্তন করেন। কয়েক বৎসর পরে দিব্বোকের ভ্রাতা রুদোকের পুত্র ভীমের রাজত্বকালে দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা রামপাল কৈবর্তরাজকে পরাজিত ও নিহত করে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' থেকে এই কাহিনী জানা যায়। অন্তিম পালযুগে বৌদ্ধসাধু বিদ্যাকর কর্তৃক 'সুভাষিতরত্নকোষ' সংকলিত হয়। অনেকে মনে করেন, তিনি মালদহ অঞ্চলে অবস্থিত জগদ্দলবিহারের অধিবাসী ছিলেন এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যভাগে গ্রন্থখানি সংকলন করেন।

সেনযুগে রচিত ধোয়ীর 'পবনদূত', বল্লালসেনের 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত-সাগর' প্রভৃতি গ্রন্থে কিছু কিছু ইতিহাসের উপদান খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

সেকালে ছাত্রগণ পাঠের জন্য পাঠ্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করত। বড়-লোকেরা পুণ্যের জন্য ধর্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে উপযুক্ত পাত্রে বা ধর্ম-স্থানের গ্রন্থশালায় দান করতেন। লিপিকরগণ অনেকসময় পাণ্ডুলিপির সমাপ্তির তারিখে দেশের রাজার নাম উল্লেখ করতেন। এইরূপ কতকগুলি পাণ্ডুলিপির কথা আমরা এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে লেখমালার তালিকামধ্যে সন্নিবেশিত করেছি।

বিদেশীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সুলেইমান-কৃত 'সিলসিলতুৎ তওয়া-রীখ' (৯৫১ খ্রী) এবং অনুরূপ অন্যান্য আরবী গ্রন্থ পালযুগের বিষয়ে এবং মিনহাজ উদ্দীনের 'তবকাৎ-ই নাসিরী'-সংজ্ঞক পারসী ইতিহাসগ্রন্থ সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেন' সম্পর্কে আলোকপাত করে। পালযুগে ভারতীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজকের চীনদেশ ভ্রমণ এবং চীনদেশীয় পর্যটকের ভারত ভ্রমণের কথা চীনা গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত আছে। একাদশ শতাব্দীর এইরূপ জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু বরেন্দ্রদেশের অধিবাসী ছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের তিব্বতীয় ইতিহাসলেখক লামা তারনাথ (জন্ম ১৫৭৩ খ্রী এবং 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' রচনা ১৬০৮ খ্রী) তাঁর গ্রন্থে পাল প্রভৃতি

রাজবংশ সম্পর্কে কতিপয় কিংবদন্তী লিপিবদ্ধ করেছেন। পালরাজ্য থেকে তিব্বতে গিয়ে যে সকল বৌদ্ধাচার্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অতিশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অন্যতম। তাঁর তিব্বতীয় জীবনবৃত্তান্তে নয়পালের দ্বারা চেদিরাজ কর্ণের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। লদাকের তিব্বতীয় কিংবদন্তীতে ধর্মপাল ও দেবপালের আমলে বাংলার বিরুদ্ধে তিব্বতীয় রাজগণের অভিযানের উল্লেখ আছে। পাল, চন্দ্র ও সেনবংশীয় রাজগণ সম্বন্ধে লামা তারনাথ, 'আইন-ই-আকবরী'-প্রণেতা আবুল ফজল এবং 'রাজাবলী'র রচয়িতা যে বিবরণ দিয়েছেন, তার মধ্যে বেশীর ভাগই কল্পনাপুষ্ট জনশ্রুতি। এমনকি রাজগণের নামের তালিকাতেও নানাপ্রকারের ভুলভ্রান্তি দেখা যায়। প্রাচীনযুগের ইতিহাসবিষয়ে এগুলি আসামের ইতিবৃত্তসম্পর্কিত 'হরগৌরীসংবাদ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ, 'ত্রিপুরার রাজমালা' এবং উড়িয়া 'মাদলাপাঞ্জী'র সমগোত্র। আমরা নানা স্থানে এই ধরণের রচনার অনির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি; যেমন Assam Publication Board-এর History of Assam, Vol. I, শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, Studies in the Yugapurana and Other Texts ইত্যাদি।

প্রাচীনভারতের অনেকাংশের ইতিহাস-উদ্ধারের কার্যে মুদ্রার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু পূর্বভারতীয় পাল-সেন রাজাদের ইতিহাসের আলোচনায় তাঁদের মুদ্রার অবদান সামান্য। কারণ প্রাচীন ভারতের অনেক পরাক্রান্ত রাজবংশের রাজগণ যেমন মুদ্রাপ্রচার করেন নি, পাল ও সেন রাজারাও তা করেননি। এর কারণ এই যে, তখন পুরাতন আমলের এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত রাজগণের এবং পোদ্দারদের তৈয়ারী মুদ্রা এদেশের বাজারে চলত। সে সময় অনেকদিন থেকে ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে ৩২০ রতি ওজনের যে রৌপ্যমুদ্রা জনপ্রিয় ছিল, তাকে বলা হত রূপক, দ্রম্ম, পুরাণ, ধরণ বা কার্ষাপণ। পালবংশের লেখাবলীতে এই মুদ্রার উল্লেখ আছে। কিন্তু পাল আমলের ব্যবসায়বাণিজ্যে কড়ির ব্যবহার ছিল সর্বাধিক। সেনযুগে কার্ষাপণ (কাহন) নামক রৌপ্যমুদ্রা হিসাবের মান ছিল; কিন্তু লেনদেন কড়িতে চলত। এই মানকে কপর্দক-পুরাণ বা চূর্ণী বলা হত। লক্ষ্মণসেন নাকি কোনও প্রার্থীকেই শুধু-হাতে ফেরাতেন না এবং কাউকে লক্ষ কড়ির কম দান করতেন না। সুতরাং অনেক বেশী-বেশী মুদ্রার কাজও কড়িতে সম্পন্ন হত। তবে কুমিল্লা অঞ্চলে কিছু স্থানীয় মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

লক্ষ্মণসেনের সময়ে মুহম্মদ ঘুরীর সেনানীরা গৌড়নগর অধিকার করেছিল। উপরে আমরা দেখেছি, তাঁর গৌড়বিজয়ের স্মারক স্বর্ণমুদ্রায় ঘটনাটির তারিখ লিপিবদ্ধ আছে। Journ. Num. Soc. Ind., Vol. XXXV, 1973, pp. 197, 210, Plate XV, No. 1 দ্রষ্টব্য।

সেকালের স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির নিদর্শন থেকে সাংস্কৃতিক ইতিহাস উদ্ধার করা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মূর্তিপ্রতিষ্ঠার তারিখে রাজার নাম উল্লিখিত দেখা যায়। এইরূপ বহু মূর্তিলেখ আমরা পরে লেখাবলীর তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

অভিলেখ ও পাণ্ডুলিপিতে রাজার উল্লেখ

অভিলেখাদির প্রকাশস্থল উল্লেখ করতে গিয়ে, ঐ সম্পর্কে যে রচনা সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য, আমরা এখানে তারই নাম উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু কখনও কখনও প্রয়োজনের তাগিদে একাধিক গ্রন্থ কিংবা পত্রিকার নামও করতে হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মূল্যবান যে কোনও আলোচনার প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ। অনেকক্ষেত্রে প্রথমবারের পরবর্তী উল্লেখে নাম প্রভৃতিতে কিছু সংক্ষেপ করা হয়েছে; যেমন প্রথমে 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা' লিখে পরে হয়তো কেবল 'গৌড়লেখমালা' লিখেছি।

ক—পালবংশ

১। প্রথম গোপাল (আ ৭৫০-৭৫ খ্রী)।—তাঁর রাজত্বকালীন কোনও অভিলেখ বা পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় নি।

২। ধর্মপাল (আ ৭৭৫-৮১০ খ্রী)।—

(১) বোধগয়া (গয়া জেলা, বিহার) শিলালেখ ; ২৬শ বর্ষ। নীলমণি চক্রবর্তী, Journ. As. Soc. Beng., N. S., Vol. IV, 1908, p. 101 ; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা, রাজসাহী, ১৩১৯ (১৯১২), পৃষ্ঠা ২৯।

(২) খালিমপুর (মালদহ জেলা, পশ্চিমবাংলা) তাম্রশাসন ; ৩২শ বর্ষ। F. Kielhorn, Ep. Ind., Vol. IV, pp. 243 ff. ; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ৯ হতে।

(৩) নালন্দা (বিহার) তাম্রশাসন। পরেশনাথ ভট্টাচার্য, Ep.

Ind., Vol. XXIII, pp. 290 ff. ; হীরানন্দ শাস্ত্রী, A. S. I. Memoir, No. 66, p. 84.

(৪) নালন্দা শিলালেখ। A. S. I. Memoir, No. 66, p. 85.

(৫) বালগদর (মুঙ্গের জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXVIII, p. 140.

(৬) পাহাড়পুর (রাজশাহী জেলা, বাংলাদেশ) সীলমোহর লেখাবলী। কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত, Excavations at Paharpur, A. S. I. Memoir, No. 55, 1938 ; A. S. I. An. Rep., 1926-27, p. 149 ; ibid., 1929-30, p.129. সোমপুরের ধর্মপাল-নির্মিত বিহারের উল্লেখ আছে।

৩। দেবপাল (আ ৮১২-৪৫ খ্রী) ।—

(১) নালন্দা পিত্তলমূর্তিলেখ ; ৩য় বর্ষ। A. S. I. Memoir, No. 66, p. 87.

(২) কুরকীহার (গয়া জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ ; ৯ম বর্ষ। অনন্তপ্রসাদ ব্যানার্জী শাস্ত্রী, Journ. Bih. Or. Res. Soc., Vol. XXVI, 1940, p. 251.

(৩) হিলসা (পাটনা জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ ; ২৫শ বর্ষ। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী, ibid., Vol. X, 1924 p. 33 ; A. S. I. Memoir, No. 66, p. 87.

(৪) মুঙ্গের (বিহার) তাম্রশাসন ; ৩৩শ বর্ষ। L. D. Barnett, Ep. Ind., Vol. XVIII, pp. 304 ff. ; গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ৩৩ হতে।

(৫) নালন্দা (বিহার) তাম্রশাসন ; ৩৫শ বর্ষ। তারিখটি কেউ কেউ ৩৯শ বর্ষ পাঠ করেছেন। হীরানন্দ শাস্ত্রী, ibid., Vol. XVII, pp. 318 ff. ; ননীগোপাল মজুমদার, V. R. S. Monograph, No. 1 ; রমেশচন্দ্র মজুমদার Journ. As. Soc. Beng., Letters, Vol. VII, 1941, pp. 215 ff.

(৬) ঘোষরাবা (পাটনা জেলা, বিহার) শিলালেখ। F. Kielhorn, Ind. Ant., Vol. XVII, 1888, p. 307 ; গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ৪৫ হতে।

(৭) নালন্দা অভিলেখ। A. S. I. Memoir, No. 66, p. 88.

(৮) নালন্দা মূর্তিলেখ। Ibid., p. 88.

(৯) কলকাতা আশুতোষ যাদুঘরে রক্ষিত (বিহার প্রান্তে প্রাপ্ত) শিলালেখ। An. Rep. Ind. Ep., 1949-50, No. B 2.

৪। প্রথম শূরপাল (আ ৮৪৭-৬০ খ্রী)।—

(১) লখনৌ যাদুঘরে রক্ষিত (উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলায় প্রাপ্ত) তাম্রশাসন ; ৩য় বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Journ. Bih. Res. Soc., Vol. LXI, 1975, pp. 131 ff., এবং শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ৭৭-৮০, ২১৩-১৮।

(২) বিহার (উদ্দণ্ডপুরবিহার অর্থাৎ বিহারশরীফ, পাটনা জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ : ৩য় বর্ষ। রাখালদাস ব্যানার্জী, The Palas of Bengal, p. 57; নীলমণি চক্রবর্তী, Journ. As. Soc. Beng., N. S., Vol. IV, 1908, p. 108 ; সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, Journ. R. A. S. B., Letters, Vol. IV, 1938, p. 390.

(৩) বিহার (পূর্বোক্ত) মূর্তিলেখ ; ৩য় বর্ষ। রাখালদাস ব্যানার্জী, The Palas of Bengal, p. 57.

(৪) রাজৌনা (মুঙ্গের জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ ; ৫ম বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ind. Hist. Quart., Vol. XXVI, 1950, p. 139 ; প্রিয়তোষ ব্যানার্জী, Journ. Anc. Ind. Hist., Vol. VII, 1973-74, pp. 102 ff.

(৫) নালন্দা (বিহার) মূর্তিলেখ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ind. Hist. Quart., Vol. XXIX, 1953, pp. 301-02.

(৬) সারনাথ (বারাণসী জেলা, উত্তরপ্রদেশ) মূর্তিলেখ। (৭) A. S. I. An. Rep., 1907-08, p. 75.

৫। প্রথম বিগ্রহপাল (আ ৮৬০-৬১ খ্রী)।—তাঁর কোনও অভিলেখ আবিষ্কৃত হয় নি।

৬। নারায়ণপাল (আ ৮৬১-৯১৭ খ্রী)।—

(১) গয়া (বিহার) মন্দির লেখ ; ৭ম বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXV, pp. 225 ff.

(২) কলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত শিলালেখ ; ৯ম বর্ষ। The Palas of Bengal, pp. 61-62.

(৩) ভাগলপুর (বিহার) তাম্রশাসন ; ১৭শ বর্ষ। E. Hultzsch, Ind. Ant., Vol. XV, 1886, pp. 304 ff. ; গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ৫৫ হতে।

(৪) বিহার শরীফ (বিহার) মূর্তিলেখ ; ৫৪ বর্ষ। রাখালদাস ব্যানার্জী, Ind. Ant., Vol. XLVII, 1918, p. 110.

(৫) বাদাল (দিনাজপুর জেলা, বাংলাদেশ) শিলাস্তম্ভলেখ। F. Kielhorn, Ep. Ind., Vol. II, pp. 110 ff. ; গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ৭০ হতে ; দীনেশচন্দ্র সরকার, শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১৯৪-৯৫।

৭। রাজ্যপাল (আ ৯১৭-৫২ খ্রী)।—

(১) মুঙ্গের (বিহার) শিলালেখ ; ১৩শ বর্ষ। প্রিয়তোষ ব্যানার্জী, Patna Univ. Journ., Vol. I, No.1.

(২) নালন্দা (বিহার) শিলাস্তম্ভলেখ ; ২৪ বর্ষ। রাখালদাস ব্যানার্জী, Ind. Ant., Vol. XLVII, p. 111 ; দীনেশচন্দ্র সরকার, Journ. R. As. Soc., Letters, Vol. XV, 1949, pp. 7 ff.

(৩) কুরকীহার (গয়া জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ ; ২৮শ বর্ষ। অনন্তপ্রসাদ ব্যানার্জী শাস্ত্রী, Journ. Bih. Or. Res. Soc., Vol. XXVI, 1940, pp. 37 and 240.

(৪) কুরকীহার মূর্তিলেখ ; ৩১শ বা ৩২শ বর্ষ। Ibid., p. 247.

(৫) কুরকীহার মূর্তিলেখ ; ৩২শ বর্ষ। Ibid., p. 248.

(৬) ভাতুড়িয়া (রাজশাহী জেলা, বাংলাদেশ) শিলালেখ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXIII, pp. 150 ff.

৮। দ্বিতীয় গোপাল (আ ৯৫২-৭২ খ্রী)।—

(১) নালন্দা মূর্তিলেখ ; ১ম বর্ষ। নীলমণি চক্রবর্তী, Journ. As. Soc. Beng., N. S., Vol. IV, 1908, p. 105 ; গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ৮৬।

(২) মনধুক (কুমিল্লা জেলা, বাংলাদেশ) মূর্তিলেখ ; ১ম বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ind. Hist. Quart., Vol. XXVIII, p. 55.

(৩) জাজিলপাড়া (মালদহ জেলা, পশ্চিম বাংলা) তাম্রশাসন ; ৬ষ্ঠ বর্ষ। রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং প্রমথনাথ মিশ্র, Journ. As. Soc., Letters, Vol. XVII, 1951, pp. 137 ff.

(৪) বোধগয়া মূর্তিলেখ। নীলমণি চক্রবর্তী, Journ. As. Soc. Beng., N. S., Vol. IV, 1908, p. 105 ; গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ৮৮।

(৫) বিক্রমশীলদেববিহারে (ভাগলপুর জেলার কাহলগাঁয়ের নিকটবর্তী আনটিচকে) অনুলিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি ; ১৫শ বর্ষ। Journ. R. As. Soc., 1910, pp. 150-51.

(৬) 'মৈত্রেয়ব্যাকরণ'-এর পাণ্ডুলিপি ; ১১শ (দেবদত্ত ভাণ্ডারকর) কিংবা ১৭শ (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) বর্ষ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠ '৫৭ বর্ষ' অবশ্যই ভ্রান্ত ; কারণ প্রথম অংকটি স্পষ্টই '১'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Goverment Collection under the Care of the Asiatic Society of Bengal, Vol. I, p. 13 ; রাখালদাস ব্যানার্জী, Journ. Bih. Or. Res. Soc., Vol. XIV, 1928, pp. 490-91.

৯। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (আ ৯৭২-৭৭ খ্রী)।—এই রাজার সময়ের কোনও অভিলেখ বা পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে মনে হয় না।

১০। প্রথম মহীপাল (আ ৯৭৭-১০২৭ খ্রী)।—

(১) সারনাথ শিলালেখ ; বিক্রমসংবৎ ১০৮৩। E. Hultzsch, Ind. Ant., Vol. XIV, pp. 139f. ; A. Venis, Journ. Proc. As. Soc. Beng., Vol. II, 1906, pp. 445 ff. ; গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ১০৪।

(২) বাঘাউড়া (কুমিল্লা জেলা, বাংলাদেশ) মূর্তিলেখ ; ৩য় বর্ষ। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, Ep. Ind., Vol. XVII, p. 355.

(৩) নারায়ণপুর (কুমিল্লা জেলা. বাংলাদেশ) মূর্তিলেখ ; ৪র্থ বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ind. Cult., Vol. IX, 1942, pp. 121-25 এবং শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসংগ, পৃষ্ঠা ৮১-৮৪।

(৪) বেলোয়া (দিনাজপুর জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন ; ৫ম বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXIX, pp. 1 ff.

(৫) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একখানি 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি ; ৫ম বর্ষ। C. Bendall, Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, pp. 100-01. পুঁথিটির চিত্রাবলীর শিল্পরীতির উপর নির্ভর করে কেউ কেউ তারিখটিকে দ্বিতীয় মহীপালের ৫ম রাজ্যবর্ষ বলে মনে করেছেন (সরসীকুমার সরস্বতী-কৃত 'পালযুগের চিত্রকলা' দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আমাদের ধারণা, দ্বিতীয় মহীপাল অল্পকালমাত্র রাজত্ব করেছিলেন ; ৫ বৎসর রাজত্ব করেন নি।

(৬) নালন্দায় অনুলিখিত নেপালে প্রাপ্ত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি ; ৬ষ্ঠ বর্ষ। Proc. As. Soc. Beng., 1899, pp. 69-70 ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, A Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Goverment Collection under the Care of the Asiatic Society of Bengal, Vol. I, pp. 1-2.

(৭) দারভাঙ্গা (বিহার) পারিবারিক সংগ্রহে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি ; ৭ম বর্ষ। সরসীকুমার সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, পৃষ্ঠা ৩৯।

(৮) বাণগড় (পশ্চিমদিনাজপুর জেলা, পশ্চিমবাংলা) তাম্রশাসন, ৯ম বর্ষ। রাখালদাস ব্যানার্জী, Ep. Ind., Vol. XIV, pp. 384 ff. ; গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ৯১ হতে।

(৯) নালন্দা (বিহার) শিলালেখ ; ১১শ বর্ষ। নীলমণি চক্রবর্তী, Journ. As. Soc. Beng., N. S., Vol. IV, 1908, p. 106 ; গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ১০১।

(১০) বোধগয়া মূর্তিলেখ ; ১১শ বর্ষ। The Palas of Bengal, p.75.

(১১) কুরকীহার (বিহার) মূর্তিলেখ ; ২১শ কিংবা ৩১শ বর্ষ। অনন্তপ্রসাদ ব্যানার্জী শাস্ত্রী, Journ. Bih. Or. Res. Soc., Vol. XXVI, 1940, p. 245.

(১২) পাটনা (বিহার) ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি ; ২৭শ বর্ষ। সরসীকুমার সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, পৃষ্ঠা ৩৯।

(১৩) ইমাদপুর (মুজফফরপুর জেলা, বিহার) মূর্তিলেখদ্বয় ;

৪৬শ বর্ষ। Hoernle, Ind. Ant., Vol. XIV, p. 165; রমেশচন্দ্র মজুমদার, Journ. R. As. Soc. Beng., Letters, Vol. VII, 1941, p. 218, and Vol. XVI, p. 247; দীনেশচন্দ্র সরকার, Ind. Hist. Quart., Vol. XXX, 1954, pp. 392 ff. রমেশচন্দ্র তাঁর ১৪৮ নেপালাব্দ পাঠ পরে ত্যাগ করেছিলেন।

(১৪) তেত্রাবন (বিহারশরীফের নিকটবর্তী ; পাটনা জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ। Cunningham, A. S. I. Reports, Vol. I, p. 39 ; Vol. III, p. 123, No. 11.

১১। নয়পাল (আ ১০২৭-৪৩ খ্রী)।—

(১) রাজৌনা (বিহার) মূর্তিলেখ ; ১৩শ বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXVIII, p. 138 ; প্রিয়তোষ ব্যানার্জী, Journ. Anc. Ind. Hist., Vol. VII, 1973-74, pp. 108-09.

(২) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত রাজ্ঞী উদ্দাকার নির্দেশে অনুলিখিত পাণ্ডুলিপি ; ১৪শ বর্ষ। C. Bendall, Catalogue of the Buddhist Manuscripts in the University Library, Combridge, p. 175, No. 1688.

(৩) আমেরিকার নিউইয়র্কে রক্ষিত নালন্দা মহাবিহারে অনুলিখিত ধারণীগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ; ১৪শ বর্ষ। সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, পৃষ্ঠা ৪০-৪১।

(৪) গয়া (বিহার) কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দির লেখ ; ১৫শ বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXVI, pp. 84 ff. ; গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ১১০।

(৫) গয়া নরসিংহ মন্দিরলেখ ; ১৫শ বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXVI, pp. 86 ff.

(৬) বাণগড় শিলালেখ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Journ. Anc. Ind. Hist., Vol. VII, 1973-74, pp. 135 ff., 264 এবং শিলালেখ-তাম্র-শাসনাদির প্রসংগ, পৃষ্ঠা ৮৫ থেকে।

(৭) সিয়ান (বীরভূম জেলা, পশ্চিমবাংলা) শিলালেখ। দীনেশচন্দ্র সরকার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৮৩তম বর্ষ, ১৩৮৩, সংখ্যা ৩-৪, পৃষ্ঠা ১-২২ ; Journ. Anc. Ind. Hist., Vol. VI, 1972-

73, pp. 39 ff. এবং শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১০২ থেকে।

(৮) গয়া গদাধরমন্দির শিলালেখ। লেখটির নিম্নাংশের প্রতিলিপি পাওয়া যায় নি। তাই সে অংশ অপ্রকাশিত রয়েছে। এটি পরবর্তী রাজার সময়কালীন হওয়াও অসম্ভব নয়। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXVI, pp. 88-89.

২। তৃতীয় বিগ্রহপাল (আ ১০৪৩-৭০ খ্রী)।—

(১) কুর্কীহার পিত্তলমূর্তিলেখ ; ১ম বা ২য় বর্ষ। অনন্তপ্রসাদ ব্যানার্জী শাস্ত্রী, Journ. Bih. Or. Res. Soc., Vol. XXVI, 1940, pp. 37, 240.

(২) গয়া মন্দির লেখ ; ৫ম বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXVI, p. 89.

(৩) কুর্কীহার মৃন্মূর্তি লেখ ; ৮ম বর্ষ। ব্যানার্জী শাস্ত্রী, op. cit., p. 37.

(৪) বেলোয়া তাম্রশাসন ; ১১শ বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXIX, pp. 9 ff.

(৫) আমগাছি (দিনাজপুর জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন ; ১২শ বর্ষ। রাখালদাস ব্যানার্জী, Ep. Ind., Vol. XV, pp. 293 ff. ; গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ১২১ থেকে।

(৬) বিহার (বিহারশরীফ) মূর্তিলেখ : ১৩শ বর্ষ। The Palas of Bengal, p. 112.

(৭) বনগাঁও (সাহারসা জেলা, বিহার) তাম্রশাসন ; ১৭শ বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXIX, pp. 48 ff. এবং শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১২৩-২৭।

(৮) কুর্কীহার পিত্তলমূর্তি-লেখ : ১৯শ বর্ষ। অনন্তপ্রসাদ ব্যানার্জী শাস্ত্রী, Journ. Bih. Or. Res. Soc., Vol. XXVI, 1940, pp. 36.

(৯) কুর্কীহার পিত্তলমূর্তিলেখ, ১৯শ বর্ষ। Ibid., pp. 57, 240.

(১০) নৌলাগড (বেগুসরাই জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ : ২৪শ বর্ষ।

দীনেশচন্দ্র সরকার, Journ. Bih. Res. Soc., Vol. XXXVII, Part III, 1951, pp. 1 ff.

(১১) ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত 'পঞ্চরক্ষা'র পাণ্ডুলিপি ; ২৬শ বর্ষ। The Palas of Bengal, pp. 66-67 ; C. Bendall, Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the British Museum, p. 232 ; Journ. R. As. Soc., 1910, p. 151.

১৩। দ্বিতীয় মহীপাল (আ ১০৭০-৭১ খ্রী)।—এই রাজার সময়ের কোনও অভিলেখ বা পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় নি।

১৪। দ্বিতীয় শূরপাল ('রামচরিত'-এ 'সুরপাল' ; আ ১০৭১-৭২ খ্রী)।—তাঁর সময়ের কোনও অভিলেখ কিংবা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি।

১৫। রামপাল (আ ১০৭২-১১২৬ খ্রী)।—

(১) নেপালের পাটনে ব্যক্তিগতসংগ্রহে রক্ষিত 'আর্য-কারণ্ড-ব্যূহ'-এর পাণ্ডুলিপি ; ২য় বর্ষ। সরসীকুমার সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, পৃষ্ঠা ৪২।

(২) তেত্রাবন (পাটনা জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ, ৩য় বর্ষ। The Palas of Bengal, p. 93 ; নীলমণি চক্রবর্তী, Journ. As. Soc. Beng., N. S., Vol, IV, 1908, p. 109 ; সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ibid., Letters, Vol. IV, 1938, p. 390.

(৩) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতকলাভবনে রক্ষিত 'পঞ্চরক্ষা'র পাণ্ডুলিপি ; ৯ম বর্ষ। পালযুগের চিত্রকলা, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩।

(৪) উরেন (মুঙ্গের জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ ; ১৪শ বর্ষ। An. Rep. Ind. Ep., 1949-50, No. B 37 ; প্রিয়তোষ ব্যানার্জী, Journ. Anc. Ind. Hist., Vol. VII, 1973-74, p. 111.

(৫) মগধবিষয়ের অন্তর্গত নালন্দাতে অনুলিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি ; ১৫শ বর্ষ। Th. Aufrecht, Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford, Vol. II, p. 250 ; Journ. As. Soc. Beng., Vol. LXIX, 1900, Part I, p. 100.

(৬) আমেরিকার নিউইয়র্কে রক্ষিত আপনক-মহাবিহারে অনুলিখিত

'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি ; ১৮শ বর্ষ। সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, পৃষ্ঠা ৪৩।

(৭) আরমা (মুঙ্গের জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ, ২৬শ বর্ষ। An. Rep. Ind. Ep., 1960-61, p. 17.

(৮) লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়মে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি ; ৩৬শ বর্ষ। পালযুগের চিত্রকলা, পৃষ্ঠা ৪৫।

(৯) সংসারপোখরী (মুঙ্গের জেলা, বিহার) শিলালেখ, ৩৭শ বর্ষ। An. Rep. Ind. Ep., 1949-50. No. B 26.

(১০) আমেরিকার নিউইয়র্কে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি ; ৩৯শ বর্ষ। পালযুগের চিত্রকলা, পৃষ্ঠা ৪৫।

(১১) চণ্ডীমাউ (পাটনা জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ, ৪২শ বর্ষ। The Palas of Bengal, pp. 93-94.

(১২) নূতনদিল্লীর জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি ; ৫৩তম বর্ষ। প্রিয়তোষ ব্যানার্জী, Indo-Asian Culture, January, 1969, p. 61.

(১৩) কলকাতা আশুতোষ যাদুঘরে সংরক্ষিত (বিহার হইতে সংগৃহীত) মূর্তিলেখ। An. Rep. Ind. Ep., 1949-50, No. B. 1.

(১৪) উরেন মূর্তিলেখ। Ibid., No. B. 38 ; প্রিয়তোষ ব্যানার্জী, Journ. Anc. Ind. Hist., Vol. VII, p. 111.

১৬। কুমারপাল (আ ১১২৬-২৮ খ্রী)।—তাঁর রাজত্বের কোনও অভিলেখ বা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। তাঁর অমাত্য বৈদ্যদেব কামরূপের বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে দমন করতে গিয়ে সেখানে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। বৈদ্যদেবের রাজত্বের ৪র্থ বৎসরের কমৌলি তাম্রশাসন অন্যত্র উল্লিখিত হচ্ছে। শাসনটি কুমারপালের জীবনকালের কিনা তা বলা যায় না। নিম্নে দ্রষ্টব্য।

১৭। তৃতীয় গোপাল (আ ১১২৮-৪৩ খ্রী)।—

(১) আমেরিকার বস্টনে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি ; ৪র্থ বর্ষ। সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা। পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭।

(২) রাজীবপুর (দিনাজপুর জেলা, বাংলাদেশ) মূর্তিলেখ ; ১৪শ

বর্ষ। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, Ind. Hist. Quart., Vol. XVII, pp. 317 ff., ননীগোপাল মজুমদার, A. S. I. An. Rep., 1936-37, p. 130; রমেশচন্দ্র মজুমদার, Journ. R. As. Soc. Beng., Letters, Vol. VII, p. 261; দীনেশচন্দ্র সরকার, শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১২৮-৩১। কেউ কেউ অভিলেখটিকে দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালীন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে ধারণা ভ্রান্ত। কারণ লেখটির অক্ষর দ্বাদশ শতাব্দীর, দশমশতাব্দীর নয়। এর অক্ষর তৃতীয় গোপালের নিমদীঘি শিলালেখের অক্ষরের অনুরূপ।

(৩) লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত বিক্রমশীলদেব-বিহারে অনুলিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি; ১৫শ বর্ষ। Journ. R. As. Soc., 1910, pp. 150-51.

(৪) নিমদীঘি (মান্দা গ্রামের নিকটবর্তী, রাজশাহী জেলা, বাংলাদেশ) শিলালেখ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXV, pp. 228 ff.

১৮। মদনপাল (১১৪৩-৬১ খ্রী)।—

(১) বিহার (বিহারশরীফ) মূর্তিলেখ; ৩য় বর্ষ। Cunningham, A. S. I. Reports, Vol. III, p. 124, No. 6.

(২) মনহলি (দিনাজপুর জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন; ৮ম বর্ষ। নগেন্দ্রনাথ বসু, Journ. As. Soc. Beng., Vol. LXIX, Part I, 1900, pp. 66 ff.; গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ১৪৭ থেকে।

(৩) জয়নগর (মুঙ্গের জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ; ১৪শ বর্ষ। Cunningham, A. S. I. Reports, Vol. III, p. 125; রমেশচন্দ্র মজুমদার, Journ. R. As. Soc. Beng., Letters, Vol. VII, 1941, p. 216.

(৪) আরমা স্তম্ভলেখ; ১৪শ বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXVI, pp. 42-44.

(৫) আমেরিকার নিউইয়র্কে রক্ষিত 'পঞ্চরক্ষা'র পাণ্ডুলিপি; ১৭শ বর্ষ। সরসীকুমার সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, পৃষ্ঠা ৪৮।

(৬) বালগুদর মূর্তিলেখ; শকাব্দ ১০৮৩, ১৮শ বর্ষ। দীনেশচন্দ্র

সরকার, Ep. Ind., Vol. XXVIII, p. 145 এবং শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১৩২-৩৬।

(৭) নোণগড় (মুঙ্গের জেলা, বিহার) মূর্তিলেখ: বিক্রমসংবৎ ১২০১। দীনেশচন্দ্র সরকার ibid., Vol. XXXVI, p. 41.

(৮) মহাসান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেবের রাজঘাট (বারাণসী, উত্তর-প্রদেশ) শিলালেখ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXII, pp. 277 ff., Vol. XXXVII, pp. 245-46, এবং শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১৩৬-৩৯। এ শিলালেখে মদনপালের নাম নেই; কিন্তু ভীমদেব যে মদনপালের মন্ত্রী ছিলেন, সেকথা মনহলি তাম্রশাসন (উপরের ২ নং) থেকে জানা যায়।

১৯। গোবিন্দপাল (আ ১১৬১-৬৫)।—

(১) লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত সম্ভবতঃ নালন্দায় অনুলিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি; পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্গোবিন্দপালের বিজয়রাজ্য-সংবৎসর ৪র্থ। Journ. R. As. Soc., N. S., Vol. VIII, 1879, p. 3; The Palas of Bengal, p. 112.

(২) বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত কলাভবনে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি; রাজা গোমীন্দ্র(গোবিন্দ)-পালের ৪র্থ বর্ষ। সরসীকুমার সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, পৃষ্ঠা ৫১-৫২।

(৩) লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি; পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্গোবিন্দপালের বিজয়রাজ্য-সংবৎ ৯ম। ঐ, পৃষ্ঠা ৪৯।

(৪) গয়া শিলালেখ; বিক্রমসংবৎ ১২৩২, বিকারী সংবৎসর, শ্রীগোবিন্দপালের 'গত' রাজ্যের ১৪শ বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXV, pp. 233 ff.

(৫) কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি; শ্রীমদ্গোবিন্দপালদেবের অভা[বর্ধমান*]...সংবৎ ১৮। কেউ কেউ 'অতীত-সংবৎস...১৮' পাঠ উদ্ধৃত করেছেন।

pp. 83 ff. এবং Select Inscriptions, Vol. II, Delhi, 1981, pp. 744 ff.

শালবনবিহার (ময়নামতী) খননকালে আরও তিনটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। সেগুলির পাঠোদ্ধার হয় নি। Morrison, Lalmai, pp. 103-04.

২. হরিকেলীয় রাজবংশ

১। ভদ্রদত্ত।

২। ধনদত্ত।

৩। কান্তিদেব (আ ৮০০-২৫ খ্রী)।—

চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) তাম্রশাসন (অসমাপ্ত)। রমেশচন্দ্র মজুমদার, Ep. Ind., Vol. XXVI, pp. 313 ff.

৩. চন্দ্রদ্বীপ বা বঙ্গালদেশের চন্দ্রবংশ

১। পূর্ণচন্দ্র (আ ৮৬৫-৮৫ খ্রী)।—কোনও অভিলেখ নেই।

২। সুবর্ণচন্দ্র (আ ৮৮৫-৯০৫ খ্রী)।—কোনও অভিলেখ আবিষ্কৃত হয় নি।

৩। ত্রৈলোক্যচন্দ্র (আ ৯০৫-২৫ খ্রী)।—কোনও অভিলেখ পাওয়া যায় নি।

৪। শ্রীচন্দ্র (আ ৯২৫-৭৫ খ্রী)।—

(১) পশ্চিমভাগ (শ্রীহট্ট জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন ; ৫ম বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXVII, pp. 289 ff., Epigraphical Discoveries in East Pakistan, pp. 19ff., 63ff. এবং Select Inscriptions, Vol. II, pp. 92 ff.

(২) মদনপুর (ঢাকাজেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন ; ৪৬শ বর্ষ। রাধাগোবিন্দ বসাক, Ep. Ind., Vol. XXVIII, pp. 51 ff., এবং দীনেশচন্দ্র সরকার, ibid., pp. 337-38.

(৩) রামপাল (ঢাকা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন। রাধাগোবিন্দ বসাক, Vol. XII, pp. 136 ff. ; ননীগোপাল মজুমদার, Ins. Beng., Vol. III, pp. 1ff.

(৪) কেদারপুর (ফরিদপুর জেলা, বাংলাদেশ) অসম্পূর্ণ তাম্রশাসন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী, Ep. Ind., Vol. XVII, pp. 188 ff.; ননীগোপাল মজুমদার, op. cit., pp. 10 ff.

(৫) ধুল্লা (ঢাকা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXIII, pp. 134 ff.

(৬) ইদিলপুর (ফরিদপুর জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, Ep. Ind., Vol. XVII, pp. 189-90; ননীগোপাল মজুমদার, op. cit., pp. 166-67.

৫। কল্যাণচন্দ্র (আ ৯৭৫-১০০০ খ্রী)।—

ঢাকা (বাংলাদেশ) তাম্রশাসন; ২৪শ বর্ষ। আহমদ হাসান দানী, Proc. Ind. Hist. Cong., Aligarh Session XXIII, Part I, pp. 36ff. দ্রষ্টব্য। পাঠ এখনও অপ্রকাশিত।

৬। লড়হচন্দ্র (আ ১০০০-২০ খ্রী)।—

(১) প্রথম ময়নামতী তাম্রশাসন; ৬ষ্ঠ বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXVIII, pp. 197 ff.,; Epigraphical Discoveries in East Pakistan, pp. 41 ff., 69 ff. এবং শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৮।

(২) দ্বিতীয় ময়নামতী তাম্রশাসন; ৬ষ্ঠ বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., op. cit., pp. 207 ff.; Epigraphical Discoveries in East Pakistan, pp. 48-49, 75 ff. এবং শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৮।

(৩) ভারেল্লা (কুমিল্লা জেলা, বাংলাদেশ) মূর্তিলেখ; ১৮শ বর্ষ। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, Ep. Ind., Vol. XVII, pp. 349 ff.

৭। গোবিন্দচন্দ্র (আ ১০২০-৫৫ খ্রী)।—

(১) কুলকুড়ি (ফরিদপুর জেলা, বাংলাদেশ) মূর্তিলেখ; ১২শ বর্ষ। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, Ep. Ind., Vol. XXVII, pp. 24 ff.; দীনেশচন্দ্র সরকার, ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯৭।

(২) বেতকা বা পাইকপাড়া (ঢাকা জেলা, বাংলাদেশ); ২৩শ বর্ষ। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ind. Cult., Vol. VII, 1941, pp. 405-15, ও শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১৪৯-৫০ এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী, Ep. Ind., Vol. XXVII, pp. 26 ff.

উপরি সাম্রাজ্য ও গ্রন্থসমাপ্তির ভার দিয়ে পত্নীসহ নির্জরপুরে (অর্থাৎ স্বর্গে) গমন করেন। এই সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'নানা-দান-তিলাম্বু-সংবলনতঃ সূর্যাত্মজা-সঙ্গমং বিরচয্য' অর্থাৎ রাজার গঙ্গাজলে স্নানরত অবস্থায় দেওয়া অগণিতদানে ব্যবহৃত তিলমিশ্রিত জল পড়ায় গঙ্গাজলকে তিনি কৃষ্ণবর্ণ করে ফেললেন; ব্যাপারটা গঙ্গাতে কৃষ্ণবর্ণজল-বিশিষ্ট যমুনার সঙ্গম রচনার মত মনে হল। এ শ্লোকটি অবশ্যই বল্লালসেনের রচনা হতে পারে না। এটিও কিংবদন্তীমূলক; তবে এ ক্ষেত্রেও কিংবদন্তীটি আধুনিক মনে করি না। যা হোক, শ্লোকটি থেকে বল্লাল গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, মনেকরা সম্ভব; কিন্তু গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে অর্থাৎ ত্রিবেণীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, এ ধারণা সিদ্ধ হয় না। রমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজমালা পৃষ্ঠা ৬৩; ননীগোপাল মজুমদার, Ins. Beng., Vol. III, pp. 173-76; আব্দুল মোমিন চৌধুরী, Dynastic History of Bengal, pp. 216-17 ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৫। অরিরাজমদনশঙ্কর লক্ষ্মণসেন (আ ১১৭৯-১২০৬ খ্রী)।—

(১) গোবিন্দপুর (২৪-পরগণা জেলা, পশ্চিমবাংলা) তাম্রশাসন; ২য় বর্ষ, রাজ্যাভিষেক-সময়। ননীগোপাল মজুমদার, op. cit., pp.94 ff.

(২) তর্পনদীঘি (দিনাজপুর জেলা, পশ্চিমবাংলা) তাম্রশাসন; ২য় বর্ষ। রাখালদাস ব্যানার্জী, Ep. Ind., Vol. XII, pp. 8 ff.; ননীগোপাল মজুমদার, op. cit., pp. 101 ff.

(৩) আনুলিয়া (নদীয়া জেলা, পশ্চিমবাংলা) তাম্রশাসন; ৩য় বর্ষ। ননীগোপাল মজুমদার, op. cit., pp. 85 ff.

(৪) রামপাল (ঢাকা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন; ৩য় বৎসর। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, Ep. Ind., Vol. XVII, p. 360; ননীগোপাল মজুমদার, op. cit., pp. 116 f.

(৫) ঢাকা (বাংলাদেশ) মূর্তিলেখ, ৩য় বৎসর। ননীগোপাল মজুমদার, op. cit., pp. 116.

(৬) শক্তিপুর (মুর্শিদাবাদ জেলা, পশ্চিমবাংলা) তাম্রশাসন; ৬ষ্ঠ বর্ষ। ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী, Ep. Ind., Vol. XXI, pp. 211 ff.

(৭) ভাওয়াল (ঢাকা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন; ২৭শ বর্ষ। H. N. Randle, Ibid., Vol. XXVI, pp. 1 ff.

(৩) মাধাইনগর (পাবনা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন।
ননীগোপাল মজুমদার, op. cit., pp. 109 ff. ; দীনেশচন্দ্র সরকার,
Select Inscriptions, Vol. II, pp. 124 ff.

মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস তাঁর 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছিলেন
'শাকে'ত্র সপ্তবিংশত্যধিক-শতোপেত-দশ-শতে শরদাম্' অর্থাৎ ১১২৭
শকাব্দে এবং 'শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন-ক্ষিতিপস্য রসৈক-বিংশে'ব্দে' অর্থাৎ লক্ষ্মণ-
সেনের 'রসৈকবিংশ' রাজ্য-সংবৎসরে। রস=৬ এবং একবিংশ=২১ মিলে
২৭শ রাজ্যসংবৎসর; ফাল্গুনমাসের ২০ তারিখে গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়।
গয়া অঞ্চলে লক্ষ্মণসেনের অতীত রাজ্যবর্ষ গণনা আরম্ভ হয়েছিল।

৬। অরিরাজবৃষভশঙ্কর বিশ্বরূপসেন (আ ১২০৬-২৫ খ্রী)।—

মধ্যপাড়া (ঢাকা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন। এটি
সাধারণতঃ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাম্রশাসন' নামে উল্লিখিত হয়।
ননীগোপাল মজুমদার, op. cit., pp. 140 ff., 177 ff. ; দীনেশচন্দ্র
সরকার, Journ. As. Soc., Letters, Vol. XX, 1954,
pp. 201 ff., এবং Studies in the Political and
Administrative Systems of Ancient and Medieval
India, pp. 199 ff.

৭। অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর সূর্যসেন (আ ১২১০-১৫ খ্রী)।—

(১) মদনপাড়া (ফরিদপুর জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন; সূর্য-
সেনের ২য় বর্ষে প্রদত্ত এবং বিশ্বরূপসেনের ১৪শ বর্ষে সংশোধিত ও পুনঃ-
প্রদত্ত। ননীগোপাল মজুমদার, op. cit., pp. 133 ff. ও দীনেশচন্দ্র
সরকার, Journ. As. Soc., Letters, Vol. XX, pp. 209 ff.,
Stud. Pol. Adm. Syst. Anc. Med. Ind., pp. 211 ff., Ep.
Ind., Vol. XXXIII, pp. 315 ff., Select Inscriptions,
Vol. II., pp. 131 ff. এবং শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা
১৫৮-৬৪ (১৯-২০ নং চিত্রে প্রথমটির ২২শ পঙ্ক্তির বামভাগ ও দ্বিতীয়টির
৮ম পঙ্ক্তির বামভাগ এবং বিশেষ করে মলাটের উভয় পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য)।

(২) ইদিলপুর (ফরিদপুর জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন, ৩য় বর্ষ।
ননীগোপাল মজুমদার, op. cit., pp. 121 ff., এবং দীনেশচন্দ্র
সরকারের উপরে উদ্ধৃত রচনাবলী (বিশেষতঃ শেষ গ্রন্থের ২১-২২ নং চিত্রে

প্রথমটির ২৪শ পঙ্‌ক্তির ডানভাগ এবং দ্বিতীয়টির ১২শ পঙ্‌ক্তির বামভাগ দ্রষ্টব্য)। এই তাম্রশাসনদাতার নাম সাধারণতঃ 'কেশবসেন' রূপে গৃহীত হয়। কিন্তু ওটা 'বিশ্বরূপসেন'-এর ভ্রান্ত পাঠ। দুই-অক্ষরে লিখিত ও অল্প-পরিসরে উৎকীর্ণ 'সূর্য্য' নামটি ঘষে তুলে চার অক্ষরের বৃহৎ 'বিশ্বরূপ' নাম উৎকীর্ণ করার ফলে এই ভ্রান্ত পাঠের উৎপত্তি। একই ব্যাপার মদনপাড়া শাসনেও দেখা যায়। যা হোক, তাম্রশাসন থেকে কেশবসেন নামক সেন-রাজের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নি।

ঘ—অন্যান্য রাজবংশ

১. যদুকুলোৎপন্ন বঙ্গের বর্মবংশ

১। জাতবর্মা (আ ১০৫৫-৭৩ খ্রী)।—কোনও অভিলেখ নেই।

২। হরিবর্মা (আ ১০৭৩-১১২৭ খ্রী)।—

(১) নেপালে আবিষ্কৃত এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র যাদুঘরে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপি; হরিবর্মার ১৯শ রাজ্যবর্ষ। রাখালদাস ব্যানার্জী, The Palas of Bengal, pp. 97-98; ননীগোপাল মজুমদার, Ins. Beng., Vol. III, p. 28.

(২) নেপালে আবিষ্কৃত এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত 'লঘুকালচক্রটীকা'র পাণ্ডুলিপি; হরিবর্মার ৩৯শ রাজ্যবর্ষ। কেউ কেউ ৩২শ বর্ষ পাঠ করেছেন। কিন্তু এই তারিখের পর হরিবর্মার ৪৬শ রাজ্যবর্ষের উল্লেখ আছে। শেষোক্ত তারিখটির বিবরণ ১১১৯ খ্রীস্টাব্দের সঙ্গে মেলে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, Desc. Cat. Buddh. Sans. Mss., Vol. I (1917), p. 79; ননীগোপাল মজুমদার, Ins. Beng., Vol. III, p. 28; দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, Ind. Hist. Quart., Vol. XXII, p. 135.

(৩) সামন্তসার (ফরিদপুর জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন। নলিনী-কান্ত ভট্টশালী, Ep. Ind., Vol. XXX, pp. 255 ff.

৩। হরিবর্মার অজ্ঞাতনামা পুত্র (আ ১১২৭ খ্রী)।—তাঁর সময়ে মন্ত্রী ভবদেবভট্টের প্রশস্তি উৎকীর্ণ হয়। বাংলার স্থানবিশেষ থেকে সংগৃহীত এই অভিলেখটি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ভ্রমবশতঃ উড়িষ্যায় প্রেরিত হয় এবং সেখানে এটি ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব মন্দিরের একটি

দেয়ালে লাগানো হয়। F. Kielhorn, Ep. Ind., Vol. VI, pp. 203-07. ; ননীগোপাল মজুমদার, Ins. Beng., Vol. III, pp. 25 ff. ; দীনেশচন্দ্র সরকার, Select Inscriptions, Vol. II, pp. 105 ff. এবং Stud. Yugapur. Oth. Texts, pp. 101 ff.

৪। শামলবর্মা (আ ১১২৭-৩৭ খ্রী)।—

বজ্রযোগিনী (ঢাকা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন (খণ্ডিত)। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, Ep. Ind., Vol. XXX, pp. 259 ff.

৫। ভোজবর্মা (আ ১১৩৭-৪৫ খ্রী)।

বেলাবো (ঢাকা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন ; ৫ম রাজ্যবর্ষ। রাধাগোবিন্দ বসাক, Ep. Ind., Vol. XII, pp. 37-43 ; ননীগোপাল মজুমদার, Ins. Beng., Vol. III, pp. 14-24.

২. ঢেক্করীর নাগজাতীয় ঘোষবংশ

১। ধূর্তঘোষ।—কোনও অভিলেখ পাওয়া যায় নি।

২। বালঘোষ।—অভিলেখ নেই।

৩। ধবলঘোষ।—অভিলেখ পাওয়া যায় নি।

৪। ঈশ্বরঘোষ পরাক্রমমল্ল (আ ১০৫০-১০৮০ খ্রী)।—

দিনাজপুর জেলার (বাংলাদেশ) অন্তর্গত রামগঞ্জে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন ; ৩৫শ রাজ্যবর্ষ। ননীগোপাল মজুমদার, Ins. Beng., Vol. III, pp. 149-57.

৩. পালবংশের সামন্ত প্রাগ্জ্যোতিষ-কামরূপের দেববংশ

১। বৈদ্যদেব (আ ১১২৮-৩৫ খ্রী)।—

কুমারপালের (১১২৬-২৮ খ্রী) রাজত্বকালে প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপের বিদ্রোহী শাসনকর্তা তিমগ্যদেবকে দমনের জন্য বৈদ্যদেবকে প্রেরণ করা হয়। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর নিকটে কমৌলি গ্রামে এই বৈদ্যদেবের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে, তাতে তিনি পালপ্রভুত্ব অস্বীকার করেন নি ; কিন্তু শাসনটি তাঁর নিজ রাজ্যের ৪র্থ বৎসরে প্রদত্ত বলে মনে হয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ১২৭-৪৬।

৪: সেনবংশের সামন্ত পূর্বখাটিকার অধোষ্যা-বিনির্গত পালবংশ

১। শ্রীবাস(?)পাল।—অভিলেখ নেই।

২। ডোম্মনপাল (আ ১১৯৫-১২১৫ খ্রী)।—

রাক্ষসখালি (২৪-পরগণা জেলা, পশ্চিমবাংলা) তাম্রশাসন ; ১১১৮ শকাব্দ। বিনয়চন্দ্র সেন, Ind. Hist. Quart., Vol. X, 1934, pp. 321 ff. ; দীনেশচন্দ্র সরকার, Ind. Cult., Vol. I, April 1935, pp. 379-82, এবং Ep. Ind., Vol. XXX, pp. 42 ff. ডোম্মনপালের নাম প্রথমে 'মডোম্মন পাল' পড়া হয়েছিল।

৫. সমতট ও বঙ্গের দেববংশ

১। পুরুষোত্তম (আ ১১৮০-১২০০ খ্রী)

২। মধুমথন বা মধুসূদন (আ ১২০০-১৫ খ্রী)

৩। বাসুদেব (আ ১২১৫-৩০ খ্রী)

৪। অরিরাজচাণূরমাধব দামোদর (আ ১২৩০-৫৫ খ্রী)।—

(১) মেহার (কুমিল্লা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন ; শকাব্দ ১১৫৬ এবং রাজ্যবর্ষ ৪র্থ। বেণীমাধব বড়ুয়া ও পুলিনবিহারী চক্রবর্তী, Ep. Ind., Vol. XXVII, pp. 182 ff. ; দীনেশচন্দ্র সরকার, ibid., Vol. XXX, pp. 51 ff. ও Select Inscriptions, Vol. II, pp. 140 ff.

(২) শোভারামপুর (ঢাকা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন ; শকাব্দ ১১৫৮। আহমদ হাসান দানী, Ep. Ind., Vol. XXX, pp. 184 ff.

(৩) চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) তাম্রশাসন ; শকাব্দ ১১৬৫। ননীগোপাল মজুমদার, Ins. Beng., Vol. III, pp. 158 ff.

৫। অরিরাজদনুজমাধব দশরথ (আ ১২৫৫-৯০ খ্রী)।—

(১) আদাবাড়ী (ঢাকা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন। Ins. Beng., Vol. III, pp. 181-82.

(২) পাকামোড়া (কুমিল্লা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন। দীনেশচন্দ্র সরকার, ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১৩৬৪-৬৫ সাল, পৃষ্ঠা ১৬০ হতে, এবং শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১৬৫-৬৮।

বিক্রমপুররাধিপতি দশরথই জিয়া উদ্দীন বারানীর সোনারগাঁয়ের রাজা দনুজরায় যিনি আ ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

৭. পট্টিকেরার দেববংশ

হরিকালদেব রণবঙ্কমল্ল (আ ১২০৪-৩০ খ্রী)।

ময়নামতী (কুমিল্লা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন, শকাব্দ ১১৪২ এবং রাজ্য বর্ষ ১৭শ। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, Ind. Hist. Quart., Vol. IX, pp. 282 ff.

বীরধরদেব (আ ১২৩০-৫০ খ্রী) চারপত্রমুড়া (ময়নামতী, কুমিল্লা জেলা, বাংলাদেশ) তাম্রশাসন ; ১৫শ বর্ষ। এফ. এ. খাঁ, Mainamati, Karachi, 1965, pp. 23-24 ; দীনেশচন্দ্র সরকার, Chhabi, Varanasi, 1971, pp. 104ff. এবং Epigraphical Discoveries in East Pakistan, pp. 57-59, 81 ; Barrie M. Morrison, Political Centers, p. 170 এবং Lalmai, pp. 109-10.

প্রতিহাররাজ প্রথম মহেন্দ্রপালের (আ° ৮৮৫-৯০৮ খ্রী) রাজত্বকালীন পূর্ব-ভারতীয় লেখাবলী

ক—বিহার

(১) ব্রিটিশ মুাজিয়মে (লণ্ডন) রক্ষিত অভিলেখ (মূর্তিলেখ ?) —২য় সংবৎসর। দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, Inscriptions of Northern India, No. 1641 দ্রষ্টব্য।

(২) বিহারশরীফ (নালন্দা জেলা, বিহার) বৌদ্ধমূর্তিলেখ ; ৪র্থ সংবৎসর। Ibid., No. 1742. রাজার নাম 'মহিন্দ্রপাল' লেখা হয়েছে।

(৩) ব্রিটিশ মুাজিয়মে (লণ্ডন) রক্ষিত অভিলেখ (মূর্তিলেখ ?) —৬ষ্ঠ সংবৎসর। Ibid., No. 1644 দ্রষ্টব্য।

(৪) রামগয়া (গয়া জেলা, বিহার) অভিলেখ ; ৮ম সংবৎসর। Ibid., No. 1645. এখানে রাজার নাম 'মহীন্দ্রপাল' আছে।

(৫) গুণারিয়া (গয়া জেলা, বিহার) অভিলেখ ; ৯ম সংবৎসর। Ibid., No. 1646. রাজার নাম 'মহীন্দ্রপাল'। Cunningham সাহেব তারিখটি '১৯' পাঠ করেছিলেন (Reports, Vol. III, p. 123).

(৬) বিহারশরীফ (নালন্দা জেলা, বিহার) অভিলেখ ; ১৯শ (?) সংবৎসর। দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, op. cit., No. 1647.

সারণ জেলার দিঘোয়া-দুবৌলী গ্রামে মহেন্দ্রপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে উল্লিখিত লেখাবলীর সম্পর্ক নেই। কারণ ঐ শাসনানুসারে প্রদত্ত ভূমি বিহারে অবস্থিত ছিল না।

খ—বাংলা

(১) পাহাড়পুর (রাজশাহী জেলা, বাংলাদেশ) অভিলেখ ; ৫ম সংবৎসর। দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, op. cit., No. 1643 দ্রষ্টব্য।

(২) মহীসন্তোষ (দিনাজপুর জেলা, বাংলাদেশ) মূর্তিলেখ ; ১৫শ সংবৎসর। দীনেশচন্দ্র সরকার, Ep. Ind., Vol. XXXVII, pp. 204 ff.

বাংলার ইতিহাসের উপর আলোকপাত করে, এমন অভিলেখ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুলসংখ্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সংখ্যাবাহুল্যের জন্য সেগুলি সমস্ত এখানে উল্লেখ করা হল না।

দ্বিতীয় ভাগ

পাল রাজবংশ

পাল রাজগণের কালপঞ্জী

পালবংশীয় রাজগণের লেখাবলী সম্পর্কে গোড়াতেই দুটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, তাম্রশাসনগুলিতে শাসনদাতা নরপতির বংশলতা দেওয়া হত। তাই রাজার পরিচয়বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু মূর্তিলেখে রাজার পিতৃপরিচয় না থাকায় এক নামের একাধিক নরপতির অভিন্নতা ব্যাপারে সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। কারণ একই নামের দুজন রাজার মধ্যে ব্যবধান কম থাকলে, প্রত্নলিপিবিদ্যা থেকে সব সময় আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না। মূর্তিলেখ সম্পর্কে যা বলা হল, পুস্তকসমূহের পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত পুষ্পিকা সম্বন্ধেও অনেক ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য।

পালরাজগণের দলিলে কোনও অব্দের ব্যবহার হত না ; ঐগুলিতে কেবলমাত্র তাঁদের রাজ্যবর্ষের উল্লেখ থাকত। তা থেকে রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য অনুমান করা সম্ভব হয় এবং প্রত্নলিপিবিদ্যার সাহায্যে দলিলের সময় মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। যা হোক, নানা কারণে পাল-আমলের কোনও কোনও লেখে এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই। যেমন সারনাথে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালের সময়কালীন একখানি শিলালেখের তারিখ বিক্রমসংবৎ ১০৮৩ অর্থাৎ ১০২৬ খ্রীস্টাব্দ। সুতরাং মহীপাল ঐ সময়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ; কিন্তু তিনি কবে রাজ্যলাভ করেছিলেন, তা ও থেকে জানা যায় না। সেদিক থেকে মদনপালের রাজত্বকালীন বালুগুদর মূর্তিলেখ অত্যন্ত মূল্যবান। অভিলেখটির তারিখ মদনপালের রাজত্বের ১৮শ বর্ষ এবং ১০৮৩ শকাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ। সুতরাং জানা গেল যে, মদনপাল ১১৪৩-৪৪ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন এবং অন্ততঃ ১১৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। আবার গোবিন্দপালের সময়কালীন গয়া শিলালেখের তারিখ বিক্রমসংবৎ ১২৩২ (বার্হস্পত্যচক্রের 'বিকারী' সংবৎসর) অর্থাৎ ১১৭৫ খ্রীস্টাব্দ এবং পালরাজের 'বিনষ্ট' রাজ্যের চতুর্দশ বৎসর। এ থেকে জানা যায় যে, গোবিন্দপাল ১১৬১-৬২ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ মদনপালের উত্তরাধিকারী রূপে তাঁর অব্যবহিত পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন ; কিন্তু

আমরা মনে করি, রাজা গোপালের ১৪শ রাজ্যবর্ষে উৎকীর্ণ রাজীবপুরের সদাশিবমূর্তি'র অভিলেখ সম্পর্কে মজুমদার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। সদাশিবমূর্তি'র ভাস্কর্য এবং প্রত্নলিপিবিদ্যা অনুসারে রাজীবপুরলেখটি দশম শতাব্দীর পরবর্তী ; তাই এই অভিলেখ সম্বন্ধে যাঁরাই আলোচনা করেছেন, তাঁরা স্বভাবতঃই ঐ রাজা গোপালকে তৃতীয় গোপাল বলে স্থির করেছেন। কারণ দ্বিতীয় গোপাল দশম শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং তৃতীয় গোপালের উচ্চরাজ্যবর্ষ অজ্ঞাত এবং তিনি ১১৪০-৪৪ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ মাত্র ৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন, মজুমদার মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। তৃতীয় গোপালের ১৫শ রাজ্যবর্ষে অনুলিখিত একখানি চিত্র-সংবলিত পুথিও পাওয়া গিয়েছে। সরসীকুমার সরস্বতীর মতে এই পুথির চিত্রগুলি দশম শতাব্দীর পরবর্তী।

যখন মদনপালের রাজত্বের তারিখ (১১৪৩-৬১ খ্রী) অজ্ঞাত ছিল, তখন গোবিন্দপালের ৪র্থ বিজয়রাজ্য-সংবৎসরে অনুলিখিত একটি পুথি এবং ১১৭৫ খ্রীস্টাব্দে ও গোবিন্দের 'বিনষ্ট' রাজ্যের ১৪শ বর্ষে উৎকীর্ণ গয়া শিলালেখের ভিত্তিতে অনেকে ভাবতেন যে, ১১৬১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর রাজ্য বিনষ্ট হয় এবং ১১৫৭-৬১ খ্রী মধ্যে তিনি চার বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তখনও কেউ কেউ ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে, ১১৬১ খ্রীস্টাব্দে গোবিন্দ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মদনপালের রাজত্বের তারিখ জানার পরও মজুমদার মহাশয় মনে করেন, গোবিন্দ ১১৬১-৬২ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যভ্রষ্ট হন অর্থাৎ তিনি ১১৫৮-৬২ খ্রী রাজত্ব করেছিলেন। আমরা এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক মনে করি। কারণ মদন এবং গোবিন্দ উভয়েরই পাটনা-গয়া অঞ্চলে রাজত্বের প্রমাণ আছে। গোবিন্দ-পালের রাজত্বের দৈর্ঘ্য অনুমান করা কঠিন। কারণ তাঁর ৪র্থ রাজ্যাঙ্কের পুথিতে যেমন আছে 'পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্‌গোবিন্দ-পালস্য বিজয়রাজ্যে সম্বৎ ৪' তেমনই অন্য একখানি পুথির পুষ্পিকায় আছে 'পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্‌গোবিন্দপালস্য বিজয়রাজ্যে সম্বৎ ৯' অর্থাৎ তিনি ৯ম রাজ্যবর্ষ পর্যন্তও রাজত্ব করে থাকতে পারেন। আসলে 'রাজ্যবর্ষ' ও 'বিজয়-রাজ্যবর্ষ' একই অর্থে 'বিনষ্ট-রাজ্যবর্ষ'-এর সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। গোবিন্দপালের ১৪, ১৮, ২২, ৩২ ও ৩৮ বর্ষের সঙ্গে যেমন 'গত', 'অতীত', 'হত' ও 'বিনষ্ট' রাজ্যের উল্লেখ পাই, তেমনই ২৪, ৩৭, ৩৮, ও ৩৯ রাজ্যবর্ষের উল্লেখে ঐরূপ কোনও বিশেষণ নেই। আরও একটি কথা এই যে, একখানি পুথিতে 'শ্রীমদ্‌-গোবিন্দপালস্যাভি······সংবৎ ১৮' দেখা যায়।

এখানে স্পষ্টতঃ 'বর্ধমান-বিজয়-রাজ্যে' অক্ষরগুলি বিলুপ্ত; অথচ গয়া শিলালেখে দেখা যায়, ১৪শ রাজ্যবর্ষের পূর্বেই গোবিন্দপালের রাজ্য বিনষ্ট হয়েছিল। সুতরাং গোবিন্দপালের সর্বাধিক জ্ঞাত রাজ্যবর্ষ কি তা স্থির করা কঠিন। কোনও কোনও পুথিতে গোবিন্দপালকে গোমীন্দ্রপাল বলা হয়েছে। পলপাল নামক জনৈক রাজা গোবিন্দপালের পর এবং আনুমানিক ১২০০ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের বিহারবিজয়ের পূর্বে ৩৫ বৎসর রাজত্ব করে-ছিলেন। একটি মূর্তিলেখ অনুসারে পলপালের ৩৫শ রাজ্যবর্ষে ভাগলপুর শহরের প্রান্তস্থিত চম্পানগরীতে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজাকে History of Bengal, Vol. I (১৯৪৩) গ্রন্থে মজুমদার মহাশয় একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। ঐ বইতে যা বলা হয়েছিল, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য করা উচিত ছিল যে, ইতিমধ্যে ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে মূর্তিলেখটি প্রকাশিত হয়েছে এবং মজুমদার মহাশয়ের মতের অযৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। গৌড়েশ্বর পলপাল ভাগলপুর অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। পাদশতাব্দী পূর্বে এ সম্পর্কে মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে History of Ancient Bengal লিখতে গিয়ে তার কিছুই তিনি মনে করতে পারেন নি।

পলপাল গোবিন্দপালের উত্তরাধিকারী ছিলেন কিনা, নিশ্চিত বলা কঠিন। তাঁর অনধিক ৩৫ বৎসরের রাজত্বকাল আনুমানিক ১২০০ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী মুসলমান কর্তৃক বিহারবিজয়ের পূর্বেই শেষ হয়েছিল মনে করতে হবে কিনা, তাও বলা যায় না। কারণ মুসলমানবিজয়ের বহুদিন পরেও পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরমরাজাধিরাজ-শ্রীমদ্‌গৌড়েশ্বর-মধুসেনদেবের প্রবর্ধমান-বিজয়-রাজ্যে ১২১১ শকাব্দে (১২৮৯ খ্রী) অনুলিখিত একখানি বৌদ্ধপুথির কথা আমরা জানি।

মহীপালের ৫ম রাজ্যবর্ষে অনুলিখিত একখানি পুথিকে আগে প্রথম মহীপালের রাজত্বকালীন বলে ধরা হত। কিন্তু পুথিতে অংকিত চিত্রাবলীর চিত্রণশৈলীর আলোচনা করে এখন সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয় বলছেন যে, এই পুথির মহীপাল প্রথম মহীপাল নন, দ্বিতীয় মহীপাল। কিন্তু প্রথম মহীপাল থেকে মদনপাল পর্যন্ত রাজগণের রাজ্যকাল সম্পর্কে যেসব তথ্য আমাদের জানা আছে, তাতে দ্বিতীয় মহীপালের ৫ বৎসরের মত দীর্ঘ রাজত্ব কল্পনা করা কিছু কঠিন মনে হয়।

যা হোক, উপরিলিখিত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা পালবংশীয় রাজগণের যে কালপঞ্জী নির্ধারণ করতে চাই, তা নিম্নরূপ।[৭]

রাজা	সর্বাধিক জ্ঞাতরাজ্যবর্ষ	আনুমানিক রাজত্বকাল
১। গোপাল (আদিরাজা)	অজ্ঞাত	৭৫০-৭৫ খ্রী
২। ধর্মপাল (গোপালের পুত্র)	৩২	৭৭৫-৮১০ ,,
৩। দেবপাল (ধর্মপালের পুত্র)	৩৫	৮১০-৪৭ ,,
৪। প্রথম শূরপাল (দেবপালের পুত্র)	১২	৮৪৭-৬০ ,,
৫। প্রথম বিগ্রহপাল (দেবপালের খুল্লতাত জয়পালের পুত্র)	অজ্ঞাত	৮৬০-৬১ ,,
৬। নারায়ণপাল (প্রথম বিগ্রহপালের পুত্র)	৫৪	৮৬১-৯১৭ ,,
৭। রাজ্যপাল (নারায়ণপালের পুত্র)	৩২	৯১৭-৫২ ,,
৮। দ্বিতীয় গোপাল (রাজ্যপালের পুত্র)	১১ বা ১৭	৯৫২-৭২ ,,
৯। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (দ্বিতীয় গোপালের পুত্র)	অজ্ঞাত	৯৭২-৭৭ ,,
১০। প্রথম মহীপাল (দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র)	৪৮ ও ১০৮৩ বিক্রমাব্দ	৯৭৭-১০২৭ ,,
১১। নয়পাল (প্রথম মহীপালের পুত্র)	১৫	১০২৭-৪৩ ,,
১২। তৃতীয় বিগ্রহপাল (নয়পালের পুত্র)	২৬	১০৪৩-৭০ ,,
১৩। দ্বিতীয় মহীপাল (তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র)	অজ্ঞাত	১০৭০-৭১ ,,
১৪। দ্বিতীয় শূরপাল বা স্থরপাল (দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা)	অজ্ঞাত	১০৭১-৭২ ,,
১৫। রামপাল (দ্বিতীয় শূরপালের ভ্রাতা)	৫৩	১০৭২-১১২৬ ,,
১৬। কুমারপাল (রামপালের পুত্র)	অজ্ঞাত	১১২৬-২৮ ,,

	রাজা	সর্বাধিক জ্ঞাতরাজ্যবর্ষ	আনুমানিক রাজত্বকাল
১৭।	তৃতীয় গোপাল (কুমারপালের পুত্র)	১৫	১১২৮-৪৩ „
১৮।	মদনপাল (তৃতীয় গোপালের খুল্লতাত)	১৮। ১০৮৩ শকাব্দ	১১৪৩-৬১ „
১৯।	গোবিন্দপাল (মদনপালের পুত্র ?)	৪ (?)	১১৬১-৬৫ „
২০।	পলপাল (গোবিন্দপালের পুত্র ?)	৩৫	১১৬৫-১২০০ „

প্রথম পরিচ্ছেদ

অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গদেশের অবস্থা

কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মার (আ ৭২৫-৫৩ খ্রী) সভাকবি বাক্‌পতি-রাজের 'গৌড়বহো' সংজ্ঞক প্রাকৃত-কাব্যে তৎকালীন বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাব্যটির নামের সংস্কৃত রূপ 'গৌড়বধঃ' অর্থাৎ গৌড়রাজের নিধন, এবং যশোবর্মার দ্বারা নিহত এই গৌড়রাজকে মগধ-নাথও বলা হয়েছে। সুতরাং মগধ বা দক্ষিণবিহার তখন গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আবার বলা হয়েছে যে, গৌড়-মগধ রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধের পরে যশোবর্মা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বঙ্গপতিকে পরাজিত করেন। এর কারণ বোধহয় এই যে, বঙ্গেশ্বর গৌড়-মগধপতির মিত্র, সামন্ত বা বশীভূত-মিত্র রূপে তাঁকে যশোবর্মার বিরুদ্ধে সাহায্য করছিলেন।

যশোবর্মার দ্বারা নিহত গৌড়-মগধপতি কে ছিলেন, তা ঠিক জানা যায় না। উত্তরকালীন গুপ্তবংশীয় রাজগণ মহাসেনগুপ্ত পর্যন্ত মালব বা পূর্বমালবে রাজত্ব করছিলেন; কিন্তু গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিজেতা হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর মহাসেনের পৌত্র আদিত্যসেন মগধের সম্রাট হন। আদিত্যসেনের সময়ের একখানি অভিলেখে হর্ষাব্দের ৬৬ বর্ষ (অর্থাৎ ৬৭২ খ্রী) তারিখ পাওয়া যায়। তাঁর পর তাঁর নিম্নলিখিত বংশধরগণ পর পর মগধের সিংহাসন লাভ করেন— তাঁর পুত্র দেবগুপ্ত, পৌত্র বিষ্ণুগুপ্ত এবং প্রপৌত্র দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত। এই জীবিতগুপ্ত অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে মগধে রাজত্ব করতেন এবং তাঁর পরেই গৌড়েরা মগধ অধিকার করে। এমন হতে পারে যে, উত্তরকালীন গুপ্তবংশীয় রাজা কান্যকুব্জেশ্বর যশোবর্মার সাহায্যপ্রার্থী হওয়ায় যশোবর্মা কান্যকুব্জের দীর্ঘ-কালের শত্রু গৌড়রাজকে দমন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিছুকাল পূর্বে রামগুপ্তের পুত্র জীবগুপ্তের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। উভয়েরই রাজোপাধি পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর এবং ভূমি দান করা হয়েছিল তীরভুক্তি বা উত্তরবিহারে। এই রাজগণের সময় অষ্টম

শতাব্দীর প্রথমার্ধ অর্থাৎ দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের সময়ের কাছাকাছি। এঁরা যদি জীবিতগুপ্তের বংশধর হন, তবে অনুমান করা যায়, গৌড়রাজ কর্তৃক মগধ অধিকৃত হলে উত্তরকালীন গুপ্তবংশের অধিকার তীরভুক্তিতে সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু রামগুপ্ত ও জীবগুপ্ত আদিত্যসেন প্রভৃতি বিখ্যাত রাজাদের বংশধরত্ব দাবি করেন নি দেখে মনে হয়, তাঁরা উত্তরবিহারের একটি নবোদিত রাজবংশ। বোধ হয়, এঁরা যশোবর্মার আক্রমণের পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন এবং কিছুকাল পর পালরাজগণের সামন্তত্ব অঙ্গীকার করেছিলেন।

মগধের অন্তর্গত নালন্দায় আবিষ্কৃত একখানি শিলালেখ থেকে জানা যায় যে সেখানে বালাদিত্য-নির্মিত বুদ্ধমন্দিরে যশোবর্মার তুর্কীজাতীয় মন্ত্রীর পুত্র মালাদ বুদ্ধ এবং ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যে অনেক বস্তু দান করেছিলেন। ঐ অঞ্চলের ঘোষরাবাঁগ্রামের যশোবর্মপুর-বিহারও কান্যকুব্জরাজের নাম বহন করছে বলে মনে করা যায়। এদিকে উত্তরবাংলার পাবনা জেলায় আবিষ্কৃত একখানি শিলালেখ থেকে জানতে পারি, দেবপালের জনৈক মন্ত্রী ঐ অঞ্চলে একটি বিষ্ণুর মন্দির বা মঠ নির্মাণ করে বৈষ্ণব প্রব্রাজিত-দিগকে দান করেছিলেন, এবং তাঁর একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন যশোবর্মার প্রিয়পাত্র। অভিলেখটিতে বলা হয়েছে, ভট্টলমণ্ডলের অধিপতি ছিলেন পঞ্চহূতি; তাঁর বংশজাত ভট্টল-দেশ-নায়ক কর্করাজ বা কর্পূর ছিলেন যশোবর্মার অনুগ্রহ-পুষ্ট। কর্কের পুত্র শিবরুদ্রের ঔরসজাত পাহিলের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করে দেবপাল বিষয়সুখ ভোগ করতেন। এতে বাংলার উপর কান্যকুব্জ-রাজের রাজনীতিক প্রভাবের কিছু ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়।

পাবনা উত্তরবাংলার পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত, কিন্তু বঙ্গসীমান্তের নিকটবর্তী ছিল। সম্ভবতঃ পুণ্ড্রবর্ধন তখন গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত বা অধীন ছিল, এবং সেই সূত্রেই ঐ অঞ্চলে যশোবর্মার প্রভাব বিস্তৃত হয়। কলহণের 'রাজতরঙ্গিণী'-বর্ণিত কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের (আ ৭৭৬-৮০৭ খ্রী) কাহিনীতে সম্ভবতঃ এই ধারণার সমর্থন আছে। সেইসময় পুণ্ড্রবর্ধন-নগর গৌড়েশ্বরের অধীন ছিল এবং জয়ন্ত নামক ব্যক্তি তার শাসক ছিলেন। জয়াপীড় 'পঞ্চগৌড়'-এর রাজগণকে পরাজিত করে জয়ন্তকে তাঁদের অধীশ্বর করেছিলেন। এখানে 'পঞ্চগৌড়'-নামটির অর্থ অবশ্যই উত্তরভারত নয়, কারণ জয়াপীড় কর্তৃক কান্যকুব্জরাজের পরাজয়ের কথা স্বতন্ত্রভাবে বিবৃত হয়েছে। যা হোক, জয়ন্তের কাহিনী অনৈতিহাসিক হতে পারে; কিন্তু

অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সম্ভবতঃ যশোবর্মার আক্রমণের ফলে গৌড়রাজ্যের পতন ঘটায় বাংলা ও বিহারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল।

এই প্রসংগে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপের রাজা হর্ষবর্মার (আ ৭২৫-৪৫ খ্রী) একটি দাবির উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর জামাতা নেপালের লিচ্ছবি-বংশীয় রাজা জয়দেব পরচক্রকামের কাঠমণ্ডুতে প্রাপ্ত অভিলেখে তাঁকে বলা হয়েছে 'গৌড়োড্রাদি-কলিঙ্গ-কোশল-পতি'। এই বর্ণনার উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক হলে তাঁর অধীন দেশগুলির তালিকায় অবশ্যই প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপের উল্লেখ থাকত। যাহোক, যদি ঐ দাবির কিছুমাত্র ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে, তবে প্রাচীনকালের কান্যকুব্জ-কামরূপের সখ্যের কথা স্মরণ করে বোধ হয়, হর্ষ যশোবর্মার সহিত সন্ধিবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর দিগ্বিজয়ের অংশীদার হয়েছিলেন। আবার রাঘোলী তাম্রশাসনের (আ ৮০০ খ্রী) শৈলবংশীয় বিন্ধ্যাধিপতি দ্বিতীয় জয়বর্ধনের প্রপিতামহ ও তদীয় ভ্রাতা বোধহয় যশোবর্মার সামন্তরূপে পুণ্ড্র ও কাশি-জনপদের রাজাদের নিধন করেছিলেন। এই পুণ্ড্রেশ্বর গৌড়াধিপতির সামন্ত ছিলেন বলে মনে হয়।

পূর্বভারতে যশোবর্মার অধিকার অল্পকালের জন্য স্থায়ী হয়। কারণ শীঘ্রই তিনি কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের (আ ৭২৪-৬০ খ্রী) হস্তে পরাজিত হন। 'রাজতরঙ্গিণী' অনুসারে কান্যকুব্জ-বিজয়ের পর কাশ্মীররাজ পূর্বদিকে প্রাচ্যসমুদ্র বা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন; অর্থাৎ বঙ্গদেশ সাময়িকভাবে তাঁর পদানত হয়েছিল। বলা হয়েছে যে, তদানীন্তন গৌড়েশ্বর ললিতাদিত্যের অতিথিরূপে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন এবং পরিহাসকেশব নামক বিষ্ণুদেবতার নামে অতিথির প্রাণরক্ষাবিষয়ে শপথগ্রহণ সত্ত্বেও ললিতাদিত্যের আদেশে সেখানে ঘাতকগণের হস্তে গৌড়রাজ নিহত হন। এই সংবাদ গৌড়ে পৌঁছলে গৌড়পতির একদল অনুচর পরিহাসকেশবের মূর্তি চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে উপস্থিত হয়। সেখানে তারা রামস্বামী নামক বিষ্ণুমূর্তিকে পরিহাসকেশব মনে করে চূর্ণ করেছিল। অগণিত কাশ্মীরসেনার আক্রমণে কৃষ্ণবর্ণ গৌড়বীরেরা একে একে নিহত হয়; কিন্তু তারা প্রাণভয়ে সংকল্পচ্যুত হয় নি। কলহণপণ্ডিত তাদের বীরত্ব ও প্রভুভক্তির যেমন উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করেছেন, সমগ্র 'রাজতরঙ্গিণী'তে তেমনটি আর দেখা যায় না। তিনি ঘটনার ৪০০ বৎসর পরে বলেছেন, "আজ পর্যন্ত রামস্বামীর মন্দির শূন্য পড়ে আছে এবং সমস্ত পৃথিবী গৌড়বীরগণের যশে পূর্ণ রয়েছে।" স্বদেশের

অগৌরবসূচক ও বিদেশীয়দের পরাক্রমবিষয়ক এই উচ্ছ্বাসে মিথ্যার অবকাশ কম বলে মনে হয়। যাই হোক, লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যশোবর্মা দ্বারা নিহত গৌড়েশ্বরের উত্তরাধিকারী সম্ভবতঃ ললিতাদিত্যের বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সুদূর বিদেশে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এই সকল ব্যাপারের ফলে এদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে অবশ্যই অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তিব্বতীয় গ্রন্থকার লামা তারনাথ (জন্ম ১৫৭৩ খ্রী) প্রণীত ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস (১৬০৮ খ্রী) গ্রন্থে এই অরাজক অবস্থার কিছু ইঙ্গিত আছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, তারনাথের বর্ণনায় পল্লবিত উপকথার অন্তরালে প্রকৃত ইতিহাস অতি সামান্যই দেখা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোপাল কর্তৃক পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠা

তারনাথের বর্ণনা অনুসারে শ্রীহর্ষ অর্থাৎ হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৪৭ খ্রী) সময়ের পূর্ব থেকে পালবংশের অভ্যুদয় (আ ৭৫০ খ্রী) পর্যন্ত ভঙ্গল(বঙ্গাল)-দেশে চন্দ্রবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করতেন ; এ বংশের শেষ দুজন রাজার নাম গোবিচন্দ্র এবং ললিতচন্দ্র। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তির যখন মৃত্যু হয় (সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধের মাঝামাঝি), তখন গোবিচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং গোবিচন্দ্র সপ্তম শতাব্দীর শেষপাদে এবং ললিতচন্দ্র অষ্টম শতাব্দীর প্রথমপাদে রাজত্ব করেন বলে ধরা চলে। তারনাথ বলেন যে, চন্দ্রবংশের শেষ রাজা ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর ভারতের পাঁচটি প্রাচ্যজনপদে অর্থাৎ ভঙ্গল (বঙ্গাল), ওডিবিস (উড়িষ্যা) এবং অন্যান্য অঞ্চলে, প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, অভিজাত-ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ এবং বণিক স্ব-স্ব গৃহে রাজা হয়ে উঠলেন ; দেশ কোনও একজন রাজার অধীন রইল না। উল্লিখিত অরাজক অবস্থা মোটামুটি অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের ব্যাপার। তারনাথের বঙ্গাল বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গ।

এই অরাজকতা বঙ্গালদেশে আরোপ করে, তারনাথ একটা গল্প বলেছেন যার ঐতিহাসিক মূল্য কম থাকলেও ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন, সেই সময়ে বহু বৎসর ভঙ্গলদেশে কোনও রাজা ছিলেন না ; তাতে প্রজাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। জননায়কেরা মিলিত হয়ে রাজ্যের সুশাসনের জন্য একজন রাজা নির্বাচন করলেন। কিন্তু পূর্বতন রাজার (গোবিচন্দ্র কিংবা ললিতচন্দ্রের) কোনও মহিষীর আকারে এক নাগী রাত্রে সেই নির্বাচিত রাজাকে হত্যা করে। সেই থেকে রোজ সকালে একব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করা হত এবং রাত্রে তিনি নিহত হতেন। এইভাবে কয়েক বৎসর কেটে গেল। ইতিমধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনের নিকটে জনৈক ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভে বৃক্ষদেবতার ঔরসে এক বীরপুরুষের জন্ম হয়েছিল ; তাঁর উপাস্যা চুন্দাদেবী তাঁকে আর্য-খসর্পণের বিহারে গিয়ে রাজ্য প্রার্থনা করতে স্বপ্নাদেশ দেন। তিনি পূর্বদিকে যেতে আদিষ্ট হয়ে ভঙ্গলদেশে এলেন। সেখানে এক যুবকের একদিন রাজা নির্বাচিত হয়ে নিহত হবার সম্ভাবনায় সেই

পরিবারে শোকের ছায়া পড়েছিল। চুন্দাদেবীর ভক্তটি তখন যুবকের পরিবর্তে আপনাকে রাজা নির্বাচিত করান এবং রাত্রিকালে ঐ দেবীর প্রদত্ত কাষ্ঠনির্মিত গদার আঘাতে রাক্ষসীরূপিণী নাগীকে হত্যা করেন। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য পর পর সাতদিন তাঁকেই রাজা নির্বাচন করা হল এবং দেখা গেল, কোনও নাগী বা রাক্ষসী তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারছে না। তখন তাঁকে গোপাল নাম দিয়ে দেশের স্থায়ী রাজা রূপে নির্বাচন করা হল।

তারনাথ-বর্ণিত কাহিনীটি স্পষ্টতঃই একটি উপকথা; কিন্তু এর কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতার গোপাল নাম এবং দেশের অরাজকতা দূরীকরণের জন্য রাজা রূপে তাঁর নির্বাচন ঐতিহাসিক সত্য। গোপালের কোনও দলিল আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু তাঁর পুত্র ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে এই তথ্য পাওয়া যায়। গোপালের পিতা ছিলেন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী বপ্যট এবং পিতামহ সর্ববিদ্যাবিশারদ দয়িতবিষ্ণু। যেমন চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তের পৌত্র এবং ঘটোৎকচের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারী হবার পর তাঁর বংশধরেরা সকলেই 'গুপ্ত' নামান্ত গ্রহণ করেন এবং তার ফলে গুপ্তবংশ নামের উদ্ভব হয়, তেমনই দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র ও বপ্যটের পুত্র গোপাল কর্তৃক রাজ্যলাভের পর তাঁর বংশধরগণ 'পাল' নামান্ত অবলম্বন করতে থাকেন এবং তার ফলে পালবংশ নামের সৃষ্টি হয়।

তারনাথের কাহিনী অনুসারে গোপাল পুণ্ড্রবর্ধন নগরের নিকটে জন্মলাভ করেন এবং ভঙ্গল বা বঙ্গাল-দেশের রাজা নির্বাচিত হন। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে (১।৪৮, ২।২৮,৫।৩) বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবাংলাকে পালরাজের 'জনকভূ' বলা হয়েছে। অনেকের ধারণা, তার অর্থ পিতৃ-ভূমি বা জন্ম-ভূমি। আবার শত্রুবিজয়ী প্রথম মহীপাল যে পর-হস্তগত 'পিত্র্য রাজ্য' অধিকার করেছিলেন বলে দাবি করেছেন, তাঁদের মতে তার অর্থও পিতৃভূমি বরেন্দ্রী। কিন্তু বরেন্দ্রী পালবংশের আদি রাজ্য নয়; সুতরাং 'পিত্র্য রাজ্য' বলতে পৈতৃক রাজ্য বা রাজ্যাংশ বুঝতে হবে। 'জনকভূ' শব্দেরও ঐ একই অর্থ। প্রথম মহীপাল বরেন্দ্রী অধিকার করেন নি বলে মনে হয়।

বঙ্গালদেশ প্রথমে বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। গোপাল এখানকার রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন, একথা সত্য হতে পারে। কারণ সমসাময়িক প্রতিবেশীদের দলিলে গোপাল-পুত্র ধর্মপালকে বঙ্গাল, বঙ্গ অথবা গৌড়-দেশের অধিপতি বলা

হয়েছে। কিন্তু পালরাজগণ সাধারণতঃ গৌড়েশ্বর বলেই প্রসিদ্ধ। বঙ্গ এবং গৌড়-বঙ্গ অর্থে বঙ্গাল নামের প্রসার অনেক পরবর্তী কালের ব্যাপার।

গোপালের পুত্র ধর্মপালের রাজত্বকালে হরিভদ্রের 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞা-পারমিতা' লিখিত হয়। এতে ধর্মপালকে 'রাজভটাদি-বংশ-পতিত' বলা হয়েছে। এর অর্থ বোধহয় এই যে, তিনি রাজভটপ্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তির বংশে জন্মে-ছিলেন। কিন্তু এই রাজভট কে, তা নিশ্চিত জানা যায় নি। যা হোক, বৈদ্যদেবের কমৌলি শাসন থেকে জানতে পারি যে, ভারতের অনেক রাজকুলের ন্যায় পালেরা-ও আপনাদের সূর্যবংশীয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বলে দাবি করতেন। 'রামচরিত'-এ (১৷১৭) রামপালকে ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। আবার এই গ্রন্থেই ধর্মপালকে 'সমুদ্র-কুলের প্রদীপ' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মূল্য বোঝা কঠিন। কিন্তু দুটি উপকথায় এই দাবির ইঙ্গিত আছে। তারনাথ বলেন যে, গোপালের পর তাঁর যে পুত্র রাজা হন, তিনি গোপালের ছোটরাণীর গর্ভে সমুদ্রের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবার ঘনরামের বাংলা 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যে বলা হয়েছে, নিঃ-সন্তান ধর্মপালের মহিষী বল্লভাদেবী নির্বাসিত হলে বনবাসে সমুদ্রের ঔরসে তাঁর একটি পুত্র হয়। 'আইন-ই-আকবরী'র কিংবদন্তী অনুসারে পালরাজ-গণ কায়স্থ ছিলেন। এই সকল কিংবদন্তীর কোনটারই বিশেষ কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই।

খালিমপুর শাসনে ধর্মপালের মাতা অর্থাৎ গোপালের মহিষীকে বলা হয়েছে 'ভদ্রাত্মজা' অর্থাৎ ভদ্র নামক কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা। 'ভদ্র' বলতে ভদ্র নামক বংশজাত ব্যক্তিবিশেষকে বোঝাচ্ছে কিনা, তা বলা কঠিন। পালবংশীয় রাজগণ সাধারণতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে গোপাল নালন্দাতে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন। তারনাথ বলেছেন যে, মগধে গোপালের অধিকার প্রসারিত হয়েছিল। একথা সত্য হলে বুঝতে হবে, গোপাল বাংলার দক্ষিণে ক্ষুদ্র বঙ্গাল জনপদের রাজা হয়ে ক্রমে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন ; এমনকি, বিহার কিংবা অন্ততঃ দক্ষিণবিহার তাঁর প্রভাবাধীন হয়। এটা নিতান্ত অসম্ভব বলে বোধ হয় না ; কারণ পিতার নিকট থেকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সাম্রাজ্যলাভ করেছিলেন বলেই সম্ভবতঃ ধর্মপালের পক্ষে উত্তরভারতে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক, এতে মনে হয়, গোপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। তারনাথের বিবরণ অনুসারে তিনি ৪৫ বৎসর রাজ্য ভোগ করেন ; কিন্তু 'আর্য-মঞ্জুশ্রী-

মূলকল্প'-এ তাঁর রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য ২৭ বৎসর বলা হয়েছে বলে মনে হয় এবং তিনি নাকি ৮০ বর্ষ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সব কিংবদন্তীর ঐতিহাসিকতা প্রমাণসাপেক্ষ। তবে তাঁর পুত্র এবং পৌত্রের দীর্ঘ রাজত্ব থেকে মনে হয়, অত বৃদ্ধবয়সে তাঁর মৃত্যু হয় নি। আমরা গোপালের রাজত্বকাল আনুমানিক ৭৫০-৭৫ খ্রী মধ্যে স্থাপন করেছি।

কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন যে, ধর্মপালের শাসনে তাঁর উপাধি পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ, কিন্তু তাঁর পিতা গোপালকে বলা হয়েছে কেবল মহারাজাধিরাজ। কিন্তু পালবংশের তাম্রশাসনে শাসনদাতা এবং তাঁর পিতার উল্লেখে এটাই সাধারণ নিয়ম; এর ব্যতিক্রম কদাচিৎ দেখা যায়। সুতরাং এ থেকে গোপালের সম্রাট্‌সুলভ উপাধি ছিল না, মনে করার কারণ নেই।

আদি পালযুগে সমতটে পালরাজগণের অধিকার বিস্তারের প্রমাণ আগে কিছু পাওয়া যায়নি। নবাবিষ্কৃত সিয়ান শিলালেখের ২য় শ্লোক থেকে অনুমান করা যায়, গোপালকর্তৃক ঐ দেশ অধিকৃত হয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রজাকর্তৃক গোপালের নির্বাচনের স্বরূপ

ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে তদীয় পিতৃদেব এবং বংশের আদি-নরপতি গোপাল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দেশের মাৎস্যন্যায় (অরাজক অবস্থা) দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রকৃতিগণ অর্থাৎ প্রজারা শ্রীযুক্ত গোপালের সঙ্গে লক্ষ্মীর (রাজলক্ষ্মীর) বিবাহ দিয়েছিল। কারও সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বিবাহ ঘটানোর অর্থ অবশ্যই তাঁকে রাজসিংহাসনে বসানো। সুতরাং গোপাল প্রজাগণ কর্তৃক রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এইরূপ নির্বাচনের উল্লেখ ভারতের প্রাচীনসাহিত্যে এবং আদি-মধ্য যুগের গ্রন্থাদি ও লেখাবলীতে আরও দেখতে পাওয়া যায়।

রামায়ণে (১।১২।১) আছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সগরের মৃত্যুর পর প্রকৃতিজনেরা তাঁর পৌত্র অংশুমানকে রাজা নির্বাচিত করেছিল। পালবংশীয় গোপালের যুগে কাঞ্চীর পল্লবরাজবংশে দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লবমল্ল (৭৩১-৯৬ খ্রী) রাজত্ব করেছিলেন। কশাকুডি তাম্রশাসনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রজাগণ তাঁকে রাজপদে বরণ করেছিল। অনুরূপভাবে দশম, শতাব্দীর সূচনায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা আসামের পালবংশের আদিপুরুষ ব্রহ্মপাল সম্বন্ধে তাঁর পুত্র রত্নপালের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে, ম্লেচ্ছ শালস্তম্ভের বংশের ২১শ নরপতি ত্যাগসিংহ অপুত্রক অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করলে প্রকৃতিবর্গ প্রাচীন ভৌমবংশের কোনও শাখায় উৎপন্ন ব্রহ্মপালকে দেশ-শাসনে সমর্থ জেনে রাজা নির্বাচিত করেছিল।

প্রকৃতি বা প্রজাগণ কিভাবে গোপালকে রাজা নির্বাচন করেছিল, সে বিষয়ে পণ্ডিতসমাজে মতদ্বৈধ আছে। তার কারণ এই যে, যেসব বিবরণে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত হয়, সে বিষয়ে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি।

রমাপ্রসাদ চন্দ্র বলেছিলেন যে, বাংলার জনসাধারণ কর্তৃক গোপালের নির্বাচনসূত্রে মাৎস্যন্যায় বিদূরিত এবং গৌড়রাষ্ট্র পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

গোপালের নির্বাচন হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা যায় না ; কারণ সেযুগে এবং সেই মাৎস্যন্যায়ের সময়ে ঐরূপ নির্বাচন সম্ভব ছিল না। তাঁর বিবেচনায় নির্বাচনটা প্রথমতঃ করেছিলেন প্রধান প্রধান সামন্তরাজগণ এবং পরে তা জনগণের সমর্থন লাভ করেছিল। আমাদের মনে হয়, তারনাথের বিবরণ পাঠের পর জনগণের দ্বারা নির্বাচন বলতে রমাপ্রসাদপ্রমুখ ঐতিহাসিকগণও গণভোটের দ্বারা নির্বাচন বোঝেন নি।

আব্দুল মোমিন চৌধুরীর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতিগণের দ্বারা নির্বাচন বলতে election কিংবা selection বোঝা ঠিক নয় ; বুঝতে হবে, কতিপয় প্রকৃতি গোপালকে ক্ষমতালাভে সাহায্য করেছিল অর্থাৎ কতকগুলি সামন্ত ও কর্মচারীর সাহায্যে গোপাল ক্ষমতালাভে ও মাৎস্যন্যায় দূর করতে সমর্থ হন। এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক রাজ্যই ঐ ভাবে সংস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু অগণিত রাজ্য-প্রতিষ্ঠাপকদের মধ্যে মাত্র দু-চার জনকেই প্রজাগণ দ্বারা নির্বাচিত বলা হয়েছে। অবশ্যই এর কোনও কারণ ছিল এবং বিনা প্রমাণে এই ধরনের অসাধারণ দাবিকে উড়িয়ে দেওয়া নিতান্তই আযৌক্তিক। মোমিন সাহেবের ব্যাখ্যা সত্য হলে নির্বাচনের দাবির কোনই মূল্য থাকে না।

এ সম্পর্কে যে কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়, সেটি এই যে, ভারতের জন-জীবনে রাজার নির্বাচন কখনও একটা অসাধারণ ব্যাপার বলে মনে হয় নি। কারণ আমাদের রূপকথাতে পর্যন্ত দেখতে পাই, অপুত্রক রাজার মৃত্যুর পর রাজহস্তী ছেড়ে দেওয়া হত কোথাও থেকে সিংহাসনের জন্য উপযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে আসার জন্যে। হস্তী যাকে পিঠে করে এনে উপস্থিত করত, তাকেই রাজা করা হত। 'মহাজনক' প্রভৃতি কতকগুলি জাতকে এইরূপ ভবিষ্যৎ সিংহাসনাধিকারীর অন্বেষণে রথপ্রেরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের কাহিনীতে খনীনেত্রকে সিংহাসনচ্যুত করে তৎপুত্র সুবর্চাকে রাজা নির্বাচিত করা এবং 'তেলপত্ত' প্রভৃতি জাতকে বোধিসত্ত্বকে সিংহাসনে স্থাপন প্রভৃতি ঘটনা রামায়ণ-বর্ণিত অংশুমানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রামায়ণে রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের ব্যাপারে রাজা দশরথ প্রজাবর্গের অনুমোদন প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু এ সকল পৌরাণিক কাহিনী ব্যতীত ঐতিহাসিক নজীর যা আছে, তাও কিছু কম নয়।

উপরে আমরা পল্লববংশের কাঞ্চীপতি দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লবমল্লের প্রজা

দ্বারা রাজপদে নির্বাচনের উল্লেখ করেছি। ঘটনাটির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ
কাঞ্চীপুরের বৈকুণ্ঠপেরুমাল মন্দিরের তামিল লেখাবলীতে বর্ণিত আছে।
পল্লববংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মা নিঃসন্তান অবস্থায় অকস্মাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে
প্রাণত্যাগ করায় রাজ্যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। দেশের সেই মাৎস্য-
ন্যায়-জনিত দুর্দিনে মাত্র (মন্ত্রী), মূলপ্রকৃতিগণ এবং 'ঘটকয়র' (বোধহয়
পণ্ডিতেরা) ঐ বংশের হিরণ্যবর্মা নামক মহারাজের নিকট উপস্থিত হলেন এবং
দেশের দুরবস্থার কথা নিবেদন করে একজন রাজা চাইলেন। হিরণ্যবর্মা তখন
'কুলমল্ল'গণকে আহ্বান করে জানতে চাইলেন যে, তাঁদের মধ্যে কেউ পল্লব-
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে চান কিনা। কিন্তু সেই দুর্দিনে তাঁরা সকলেই ঐ
গুরুভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তখন হিরণ্যবর্মা তাঁর শ্রীমল্ল, রণমল্ল,
সংগ্রামমল্ল এবং পল্লবমল্ল নামক চার পুত্রকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের
মধ্যে প্রথম তিনজন সিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করলে সর্বকনিষ্ঠ পল্লবমল্ল
বিনম্রভাবে তাঁর সম্মতি জানালেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র ১২ বৎসর। হিরণ্যবর্মা
প্রথমে তাঁর নাবালক পুত্রকে ঐ সুকঠিন কার্যের জন্য ছাড়তে রাজি হন নি।
পরে ধরণিকোণ্ডা-পোশার নামক জনৈক নায়কের বিশেষ অনুরোধে তিনি পুত্রকে
পল্লবসিংহাসন গ্রহণে অনুমতি দিলেন। পল্লবমল্ল তখন রাজধানী কাঞ্চীপুর
অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি রাজধানীর কাছে পৌঁছলে পল্লবদিঅরৈয়র নামক
জনৈক নায়ক বৃহৎ একদল সেনা নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হন এবং পল্লবমল্লকে
হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে কাঞ্চীপুরে নিয়ে যান। সেখানে তিনি সামন্তবর্গ,
বণিকসংঘ, মূলপ্রকৃতিসমূহ এবং কডক্কমুত্তরৈয়র নামক নায়কের অভ্যর্থনা লাভ
করলেন। অতঃপর মন্ত্রিদল, সামন্তবর্গ, 'ঘটকয়র' এবং উভয়গণ (স্বদেশী
ও পরদেশী বণিকসংঘদ্বয়) কর্তৃক তিনি নন্দিবর্মা নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন
এবং 'বিড়েলবিড়ুগু', সমুদ্রঘোষ খট্টাঙ্গধ্বজ ও বৃষভলাঞ্ছন-সংজ্ঞক রাজচিহ্ন লাভ
করেন।

উপরের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, পল্লববংশীয় কাঞ্চীপতি দ্বিতীয় নন্দিবর্মা
পল্লবমল্লের রাজপদে নির্বাচনে পল্লবরাজ্যের সমুদয় প্রজা অংশগ্রহণ করে নি;
কিন্তু তাঁর নির্বাচনের দাবিটিকে কোনওমতেই ফাঁকা বলা চলে না। অধিকন্তু
ঐ ভাবে নির্বাচনের দাবি করা সাধারণ কোনও নরপতির পক্ষে মোটেই সম্ভব
ছিল না।

এই প্রসঙ্গে আমরা কলহণ-কৃত 'রাজতরঙ্গিণী'তে ([illegible])

মাতৃগুপ্তের নির্বাচনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। যেমন পল্লবরাজ্যের অমাত্য প্রভৃতি মহারাজ হিরণ্যবর্মাকে রাজা নির্বাচনের ভার দিয়েছিলেন, তেমনই কাশ্মীরের অমাত্যেরা সম্রাট্ হর্ষ বিক্রমাদিত্যের প্রতি রাজা নির্বাচনের ভার দিলে তিনি কবি মাতৃগুপ্তকে নির্বাচিত করে পত্রগহ কাশ্মীরে পাঠান। আবার আমরা 'রাজ-তরঙ্গিণী'তে (৫।৪৪৫ থেকে) রাজা যশস্করের নির্বাচন-কাহিনীর উল্লেখ করতে পারি। এর বর্ণনা মাতৃগুপ্তের কাহিনী এবং বৈকুণ্ঠপেরুমাল লেখাবলীর বর্ণনা থেকে অনেকটা অন্যরূপ এবং তাতে বোঝা যায় যে, রাজা নির্বাচনের প্রথা সর্বত্র সবক্ষেত্রে একরূপ ছিল না।

৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে অত্যাচারী কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মা বা উন্মত্তাবন্তি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। তখন দাসীরা কোথা থেকে শূরবর্মা নামক একটি শিশুকে এনে তাকে রাজার ঔরসজাত পুত্র বলে রটিয়ে দিল এবং মৃত্যুপথযাত্রী রাজা তাকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। সামন্ত, মন্ত্রী একাঙ্গ এবং তন্ত্রী প্রভৃতির হস্তে শিশুরাজার রক্ষণাবেক্ষণের ভরি ন্যস্ত করে অবন্তিবর্মা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহী সেনাপতি কমলবর্ধন রাজধানী শ্রীনগর আক্রমণ করলেন। একাঙ্গ, তন্ত্রী, সামন্তগণ ও অশ্বারোহী সেনাদল তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে পরাজিত হল। নিজের অল্পসংখ্যক অশ্বসেনার সাহায্যে রাজপক্ষের সহস্র-সহস্র অশ্বারোহী সেনা বিতাড়িত করে কমলবর্ধন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তখন শিশুরাজার পক্ষ ত্যাগকরে রাজপক্ষীয় সেনাদল পালিয়ে গেল। রাজমাতা নিঃসহায় পুত্রকে নিয়ে কোনও গুপ্তস্থানে আত্মগোপন করলেন।

রাজ্যাভিলাষী হয়েও রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ এবং ভীরুপ্রকৃতি কমলবর্ধন তৎক্ষণাৎ সিংহাসন অধিকার করেন নি। পরদিন তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মণদের সমবেত করে সরলভাবে বললেন, "আপনারা স্বদেশীয় যে যুবককে কার্যক্ষম বলে বুঝতে পারছেন, সেই উপযুক্ত ব্যক্তিকেই রাজা নির্বাচিত করুন।" কমলবর্ধনের ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মণেরা তাঁকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করে রাজপদের জন্য নির্বাচন করবেন। কিন্তু সমবেত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পাঁচ-ছ দিন ধরে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করে বাগ্‌বিতণ্ডা চালাতে লাগলেন। কমলবর্ধন তাঁদের সভায় উপস্থিত হলে তাঁরা ইঁট ছুঁড়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে অবন্তিবর্মার মহিষীদের অনুচরগণ যশস্কর নামক জনৈক সুপণ্ডিত ও সুবক্তা ব্রাহ্মণ যুবককে ঐ ব্রাহ্মণদের সভায় প্রবেশের সুযোগ করে দিল। অদৃষ্টের প্রভাবে

ব্রাহ্মণেরা যশস্করকে দেখামাত্র একমত হলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে একযোগে ঘোষণা করলেন, "এই ব্যক্তিই আমাদের রাজা হোক।"

উল্লিখিত বিবরণটি পড়ে প্রথমেই আমাদের মনে হয়, কমলবর্ধনের পক্ষে সম্ভবতঃ সৈন্যসাহায্যে ব্রাহ্মণদের বিতাড়িত করে বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁর ধমনীতে রাজবংশীয় রক্ত ছিল না এবং তিনি ভীরুস্বভাব ছিলেন বলেই তাতে সাহসী হননি। এদিকে যশস্কর কমলবর্ধনের চেয়ে বুদ্ধিমান ও নীতিজ্ঞ ছিলেন দেখা যায়। তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেই দৌবারিকগণকে আদেশ দিলেন, "ঐ ব্রাহ্মণদের ওখান থেকে দূরে সরিয়ে দাও।" দৌবারিকেরা যখন ভীতিপ্রদর্শন পূর্বক ব্রাহ্মণগণকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন নবীন রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁদের বলছিলেন, "আপনারা আমাকে রাজ্যদান করেছেন, সেজন্য আপনাদের দেবতার মত পূজা করব। কিন্তু রাজ্যদানের জন্য আপনারা অভিমানে উদ্ধত হয়ে থাকবেন, সেটি হবে না। কার্যকালব্যতীত অন্য সময়ে আপনারা কেউ আমার কাছে আসবেন না।" ঘটনাটি থেকে যশস্করের সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনীতিজ্ঞানের জন্যই দীনহীন যশস্কর কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি হতে সমর্থ হন। আর তার অভাবেই হাতে এসেও কাশ্মীর-সিংহাসন কমলবর্ধনের হস্তচ্যুত হয়ে গেল।

যাহোক, যশস্করের কাহিনী থেকে দেখা যায়, সমাজের কর্তা অথবা পঞ্চায়তের সভ্য হিসাবে দেশের ব্রাহ্মণেরা কখনও কখনও রাজা নির্বাচন করতেন। খুঁজলে এই ধরনের এবং অন্যান্য প্রকারের আরও কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং যে সকল প্রাচীন নরপতি প্রজা কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের দাবি উপেক্ষণীয় নয়। তবে সকলের নির্বাচনপদ্ধতি এক ধরনের না হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বিংশ শতাব্দীর শেষাংশেই বা 'জনসাধারণের নির্বাচন' কথাটির অর্থ কি? আজও গণ্যকরার মত আয়তনবিশিষ্ট এমন কোনও রাষ্ট্র নেই যেখানে বালক, স্ত্রীলোক, নিরক্ষর, উন্মাদ প্রভৃতি সমুদয় অধিবাসীর নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার আছে। সুতরাং এ যুগেও রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ঠিক জনসাধারণের দ্বারা হয় না, রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকের মনোনীত প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা হয়ে থাকে। আবার নির্বাচিত ব্যক্তি সাধারণতঃ প্রতিনিধিবর্গের অধিকাংশের মনোনীত,

তাঁদের সকলের নয় : তাই বর্তমান জগতের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে যদি জনসাধারণের নির্বাচন বলতে বাধা না থাকে, তবে প্রাচীন ভারতের নরপতি-নির্বাচনকে জনসাধারণের নির্বাচন বলে উল্লেখ করায় দোষ আছে বলে মনে হয় না।

ভোটের টিকেট দ্বারা নির্বাচনের প্রথাও প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। কথিত আছে, শাক্যগণরাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতিতে নাকি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্পর্কে বিধিবিধান পালন করা হত।—১. সভায় প্রস্তাব উত্থাপন, ২. কার্য-নির্বাহের পক্ষে উপযুক্ত সভ্যসংখ্যার উপস্থিতি, ৩. মতভেদস্থলে অধিকাংশ সভ্যের মত জানার জন্য ভোটগ্রহণ, ৪. ভোটপত্রিকা বা টিকেটদ্বারা মতদান ও ভোটগণনা ইত্যাদি।

ধর্মপাল (আ৹ ৭৭৫-৮১০ খ্রী)

গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহাপরাক্রান্ত ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাংলা ও বিহারের অধীশ্বর রূপে শীঘ্রই তিনি গৌড়ের চিরশত্রু কান্যকুব্জের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যশোবর্মার মৃত্যুর কিছুকাল পরে কান্যকুব্জে আয়ুধবংশীয় পঞ্চাল-রাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইবংশে বজ্রায়ুধের পর ইন্দ্রায়ুধ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ধর্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ কান্যকুব্জপতি ইন্দ্রায়ুধকে ক্ষুদ্র রাজা মনে করেছেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ আয়ুধেরা কেবল যে পঞ্চালদেশের অধিপতিরূপে উল্লিখিত হয়েছেন, তাই নয়; ৭০৫ শকাব্দে (৭৮৩ খ্রী) গুজরাতের বর্ধমাননগরে সমাপ্ত জৈন 'হরিবংশ' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সেইসময় সে দেশের পূর্বে ছিল অবন্তিদেশ (পশ্চিমমালব) এবং উত্তর-দিকে ইন্দ্রায়ুধের রাজ্য। যেহেতু পঞ্চালদেশ অবন্তির পূর্বোত্তরে অবস্থিত, সেজন্য ইন্দ্রায়ুধের অধিকার রাজস্থান ও পঞ্জাব অঞ্চলের কিয়দংশে প্রসারিত না হলে গুজরাতের উত্তরদিগ্‌বর্তী দেশে তাঁর শাসনের উল্লেখ কোনক্রমেই সম্ভব হত না। সুতরাং ইন্দ্রায়ুধ মহাপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। আবার জৈন 'হরিবংশ'-এ ইন্দ্রায়ুধের নাম গুর্জর-প্রতিহার বৎসরাজ এবং রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ-পুত্র শ্রীবল্লভ (ধ্রুব), এই দুজন পরাক্রান্ত সম্রাটের সঙ্গে উল্লিখিত দেখা যায়। সুদূর কান্য-কুব্জের তুচ্ছ জনৈক রাজাকে গুজরাতবাসী গ্রন্থকার ঐ সম্রাট্‌দের সঙ্গে সমমর্যাদা দিয়ে উল্লেখ করতেন বলে মনে হয় না। যা হোক, কান্যকুব্জের সঙ্গে যুদ্ধের সূত্রেই ধর্মপাল গুর্জর-প্রতিহার বৎসরাজ এবং রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ও তৎপুত্র তৃতীয় গোবিন্দের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।

ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ উল্লিখিত সংঘর্ষকে কনৌজ বা উত্তরভারত-বিজয়ের উদ্দেশ্যে পাল, গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট, এই ত্রিশক্তির যুদ্ধ বলেছেন। কিন্তু এতে দুটি ভুল আছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য-দুটির সীমা মালব-গুজরাত অঞ্চলে সংমিলিত ছিল বলে সাম্রাজ্যদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা থেকেই অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই উভয়পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ

হয়। ৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গ সমসাময়িক গুর্জর-প্রতিহাররাজকে (অর্থাৎ প্রথম নাগাবলোক বা নাগভটকে) উজ্জয়িনীতে পরাজিত করেছিলেন, এই দাবি দন্তিদুর্গের এলোরা দশাবতার মন্দিরলেখ এবং প্রথম অমোঘবর্ষের সঞ্জান তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। সুতরাং এঁদের সংঘর্ষের সঙ্গে কান্যকুব্জ-অধিকারের কোনই সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধবিগ্রহ ত্রিশক্তির সংঘর্ষ নয়, চতুঃ-শক্তির যুদ্ধ। কারণ এতে পরাক্রান্ত আয়ুধ রাজগণের ভূমিকা বাদ দেওয়া চলে না। আসলে এটি পাল-আয়ুধ সংঘর্ষ অর্থাৎ গৌড়-কান্যকুব্জের পুরাতন কলহের একটি নূতন পর্যায়, এবং আয়ুধপক্ষে প্রথমে গুর্জর-প্রতিহাররাজ এবং পরে গুর্জর-প্রতিহারবিজয়ী রাষ্ট্রকূটরাজ যোগ দিয়েছিলেন।

পাল-আয়ুধ সংঘর্ষের উল্লেখ আছে ধর্মপালের খালিমপুর এবং নারায়ণ-পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে। ভাগলপুর শাসনে আছে, ধর্মপাল ইন্দ্ররাজপ্রমুখ শত্রুকে পরাজিত করে মহোদয়ের (অর্থাৎ কান্যকুব্জের) রাজলক্ষ্মীকে অধিকার করেছিলেন ; কিন্তু প্রাচীন কালে বলিরাজ যেমন ইন্দ্রাদি দেবতাকে পরাজিত করে যে মহতী শ্রীলাভ করেছিলেন, তা বামনরূপী প্রার্থী চক্রায়ুধ(বিষ্ণু)কে দান করেন, ঠিক তেমনই ধর্মপাল তাঁর কাছে প্রণত প্রার্থী (অর্থাৎ বশীভূত মিত্র) চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের রাজলক্ষ্মী দান করলেন। এ থেকে মনে হয়, ইন্দ্রায়ুধকে উৎখাত করে ধর্মপাল চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ধর্মপালের খালিমপুর শাসনে বলা হয়েছে যে, পঞ্চালদেশের বৃদ্ধগণ যাঁর অভিষেকের জন্য সানন্দে জলপূর্ণ স্বর্ণকলসী উত্তোলন করে-ছিলেন এবং ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কীর দেশের প্রণতিপরায়ণ রাজগণ যাঁকে 'সাধু' বলে সমর্থন বা আনন্দ জানাচ্ছিলেন, তিনি তাঁকে (অর্থাৎ চক্রায়ুধকে) ভ্রূভঙ্গী দ্বারা কান্যকুব্জ দান করেছিলেন। এর মধ্যে ভোজেরা বেরার, মৎস্যেরা জয়পুর, মদ্রগণ সিয়ালকোট, কুরুগণ দিল্লী ও মেরাঠ, যদুরা গুজরাত, যবনেরা সিন্ধু, অবন্তিরা পশ্চিমমালব, গন্ধারেরা পেশোয়ার এবং কীরেরা কাঙরা অঞ্চলে বাস করত বলে মনে করা যায়। এই বর্ণনায় অত্যুক্তি থাকতে পারে ; কিন্তু একে সম্পূর্ণ সত্যবর্জিত দাবি মনে করাও কঠিন। ঐ সব দেশের রাজগণ নাকি চক্রায়ুধের রাজ্যাভিষেকে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন এবং তাঁর প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করছিলেন। হয়তো পূর্বে এঁরা কেউ কেউ ইন্দ্রায়ুধের বশীভূত মিত্র ছিলেন। ধর্মপালের অনুগ্রহে যিনি

কান্যকুব্জের অধিকার পেলেন, তিনি যে সামান্য কেউ নয়, এই কথাই শ্লোকটির প্রতিপাদ্য। শ্লোকটির ভাষা থেকে বোধ হয়, চক্রায়ুধ যখন পঞ্চালের রাজা রূপে অভিষিক্ত হচ্ছিলেন, তখন পঞ্চাল-রাজধানী কান্যকুব্জ ধর্মপালের হস্তগত ছিল এবং ঐ অভিষেক-সভায় তিনি নবীন পঞ্চালরাজকে নগরটি দান করেন।

এমন হতে পারে যে, ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধের মধ্যে কনৌজের সিংহাসন নিয়ে বিবাদ হয় এবং চক্রায়ুধ ধর্মপালের সাহায্যে সিংহাসন লাভ বা উদ্ধারের চেষ্টা করেন। আবার এও সম্ভব যে, ধর্মপাল গৌড়ের শত্রু কনৌজরাজকে আক্রমণ করলে আয়ুধবংশীয় চক্রায়ুধ সিংহাসনের লোভে তাঁকে সাহায্য করেন। উত্তর-ভারতে ধর্মপালের এইরূপে প্রভুত্ব লাভের ফলেই একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত গুজরাতের কবি সোড্‌ঢলের 'উদয়সুন্দরীকথা' সংজ্ঞক চম্পূকাব্যে এই পাল-সম্রাট্‌কে 'উত্তরাপথ-স্বামী' বলা হয়েছে। এখানে 'উত্তরাপথ' বলতে আর্যাবর্ত বা উত্তরভারত বুঝতে হবে। ঠিক এই অর্থেই হর্ষবর্ধনের শত্রুগণ তাঁকে 'সকলোত্তরপথ-নাথ' বলেছিলেন। ধর্মপালের এসব কৃতিত্বের জন্যই এইসময় 'পঞ্চগৌড়' নামের উদ্ভব হয়। নামটি প্রথম দেখা যায় ৯২৬ খ্রীস্টাব্দের এক-খানি রাষ্ট্রকূটশাসনে। উত্তরকালে নামটি সমগ্র উত্তরভারত অর্থে ব্যবহৃত হত এবং কখনও কখনও সরস্বতী নদীর তীরবর্তী দেশ (অর্থাৎ পূর্বপঞ্জাব), কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল গৌড়ের পাঁচটি অঙ্গ বলে মনে করা হত।

কিন্তু উত্তরভারতে ধর্মপালের এই প্রভুত্ব দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় নি। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসনে জানা যায়, গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় বৎসরাজ গৌড়রাজ্যের অধীশ্বরকে পরাজিত করে গৌড়ের দুটি ধবল রাজচ্ছত্র আত্মসাৎ করেছিলেন। বৎসরাজের রাজধানী ছিল জোধপুর অঞ্চলের ভিল্লমাল বা ভিনমাল। তাঁর সঙ্গে বহুদূরবর্তী গৌড়েশ্বরের সংঘর্ষের কারণ কি হতে পারে? আমাদের মনে হয়, ধর্মপাল কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ইন্দ্রায়ুধ বৎস-রাজ্যের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং সেই সূত্রেই বৎসরাজ ধর্মপালের কনৌজ অধিকার কিছুকালের জন্য ঠেকাতে সমর্থ হন। কিন্তু শীঘ্রই গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট-বংশদ্বয়ের কলহের অনুসরণে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব কর্তৃক পরাজিত হয়ে বৎসরাজ জোধপুর অঞ্চলে পলায়ন করেন এবং সেই সুযোগে ধর্মপাল পুনরায় কনৌজ আক্রমণ করেন। এবার ইন্দ্রায়ুধ ধ্রুবের সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং সঞ্জান তাম্রশাসনে দেখা যায়, ধ্রুব উত্তরভারতে এসে গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী দেশে অর্থাৎ কনৌজ অঞ্চলে গৌড়েশ্বরকে পরাজিত

পালের কনৌজ অধিকারের চেষ্টা দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হল। কিন্তু ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করার পর ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে উৎখাত করে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জে অধিষ্ঠিত করতে সমর্থ হলেন। ইতিমধ্যে ধ্রুবের মৃত্যু হওয়ায় (৭৯৪ খ্রী) পরাজিত মিত্র ইন্দ্রায়ুধের সাহায্যার্থ ধ্রুব-পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ নবম শতাব্দীর সূচনায় উত্তরভারতের গঙ্গা-যমুনা বিধৌত জনপদে উপস্থিত হন। এর মধ্যে রাষ্ট্রকূটদের চিরশত্রু প্রতিহারসম্রাট বৎসরাজেরও মৃত্যু হয় (আ ৮০০ খ্রী) এবং তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করে গোবিন্দ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু সঞ্জান তাম্রশাসনে দেখা যায়, গোবিন্দ বর্তমান উত্তরপ্রদেশে পৌঁছলে ধর্ম (ধর্মপাল) ও চক্রায়ুধ তাঁর কাছে স্বয়ং এসে নতি স্বীকার করেছিলেন। ৮০৫ খ্রীস্টাব্দের নেসারিকা তাম্রশাসনে গোবিন্দ দাবি করেছেন যে, তিনি পরাজিত বঙ্গালের রাজা ধর্মের নিকট থেকে ভগবতী তারাদেবীর মূর্তিযুক্ত ধ্বজা আত্মসাৎ করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, যে কারণেই হোক, গোবিন্দ কনৌজের সিংহাসনে ইন্দ্রায়ুধকে বা তাঁর কোন উত্তরাধিকারীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। তিনি যেন চক্রায়ুধকে কনৌজের রাজা স্বীকার করে স্বরাজ্যে ফিরে যান। ইতিমধ্যে ইন্দ্রায়ুধের মৃত্যু হতে পারে।

অতঃপর গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়লে গুর্জর-প্রতিহাররাজ নাগভট উত্তরভারতে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। তাঁর পৌত্র ভোজের গোয়ালিয়র প্রশস্তি থেকে জানা যায়, তিনি 'পরাশ্রয়-কৃত-স্ফুট-নীচ-ভাব' (অর্থাৎ পরের আশ্রিত বলে যাঁর তুচ্ছতা পরিস্ফুট হয়েছিল) চক্রায়ুধকে এবং বঙ্গপতিতে পরাজিত করেছিলেন। এই বঙ্গপতি ধর্মপাল বলেই মনে হয়। কারণ ৯৫৬ বিক্রম সংবৎসরে (৮৯৯ খ্রী) প্রদত্ত উনা তাম্রশাসনে গুর্জর-প্রতিহার বংশের সামন্ত দ্বিতীয় অবনীবর্মা বলেছেন যে, তাঁর প্রপিতামহ বাহুকধবল যুদ্ধে ধর্মকে পরাজিত করেছিলেন। বাহুকধবল অবশ্যই নবমশতাব্দীর সূচনায় দ্বিতীয় নাগভটের সামন্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁর দ্বারা পরাজিত ধর্ম অবশ্যই ধর্মপাল। ৮১২ খ্রীস্টাব্দের বড়োদা তাম্রশাসনে রাষ্ট্রকূট কর্ক বলছেন যে, তৃতীয় গোবিন্দ তাঁকে লাটদেশে (দক্ষিণ গুজরাতে) প্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে 'গৌড়েন্দ্র-বঙ্গপতি-নির্জয়-দুর্বিদগ্ধ' গুর্জররাজ মালবে প্রবেশ করতে না পারেন। এই গুর্জররাজ অবশ্যই নাগভট এবং তৎকর্তৃক পরাজিত গৌড় ও বঙ্গদেশদ্বয়ের অধীশ্বর ধর্মপাল ব্যতীত আর কেউ হতে পারেন না।

নাগভটের আর একজন সামন্ত ছিলেন চাটসু শিলালেখে উল্লিখিত

গুহিলবংশীয় শঙ্করগণ। নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি গৌড়রাজ 'ভট'কে পরাজিত করেন এবং পরাজিত শত্রুর রাজ্য স্বীয় প্রভুকে উপহার প্রদান করেন। এই ভট গৌড়ের অন্তর্গত পাটনা-মুঙ্গের অঞ্চলের কোন সামন্তরাজ ছিলেন কিংবা ওটা ধর্মপালেরই কোনও নাম বা উপাধি, তা ঠিক বলা যায় না। 'ভট' অর্থ যোদ্ধা। জোধপুর শিলালেখে (৮৩৭ খ্রী) বাউক তাঁর পিতা কক্ক সম্পর্কে বলেছেন, তিনি মুদ্গগিরি অর্থাৎ মুঙ্গেরে গৌড়দের সঙ্গে যুদ্ধে যশোলাভ করেছিলেন। বাউক অবশ্যই নাগভটের সামন্ত ছিলেন এবং দেখা যায়, একসময় গুর্জর-প্রতিহার সৈন্য পাটনা অঞ্চল অধিকার করে পালসাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে মুঙ্গের পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনা ধর্মপালের রাজত্বকালীন কিনা, তা ঠিক বলা যায় না। কারণ ধর্মপাল আনুমানিক ৮১২ খ্রীস্টাব্দে এবং 'প্রভাবকচরিত' অনুসারে নাগভট তাঁর অনেক পরে বিক্রমসংবৎ ৮৯০ বা ৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু আমাদের ধারণা পরাজিত গৌড়রাজ ধর্মপাল; বোধ হয়, পালসম্রাটের অপর একজন শত্রুর সঙ্গে মিলিত হয়ে নাগভট তাঁকে পরাজিত করতে সমর্থ হন।

পালবংশের এই অপর শত্রু তদানীন্তন তিব্বতরাজ। Chronicles of Ladakh অনুসারে তিব্বতরাজ Khri-srong-lde-btsan (৭৫৫-৯৭ খ্রী) দক্ষিণে ভারতবর্ষ পদানত করেছিলেন। আনুমানিক নবম শতাব্দীতে রচিত একখানি তিব্বতীয় গ্রন্থানুসারে তাঁর পুত্র Mu-tig Btsan-po (৮০৪-১৫ খ্রী) দাবি করেছেন যে, দক্ষিণদেশের ভারতীয় রাজগণের মধ্যে উপর দিকে ধর্মপাল এবং নীচের দিকে Drahu-dpun তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়মিতভাবে ধনরত্নাদি দিয়েছিলেন। গুর্জর-প্রতিহার এবং তিব্বত-রাজ একযোগে এর পরেও পাল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় নাগভট কর্তৃক চক্রায়ুধের পরাজয় সম্পর্কে আরও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। নাগভটের মৃত্যুর তিন বৎসর মধ্যে তাঁর পৌত্র প্রথম ভোজ কর্তৃক তাঁর বরাহ তাম্রশাসন (৮৩৬ খ্রী) মহোদয় (কান্যকুব্জ) থেকে প্রদত্ত হয়। অর্থাৎ ইতিপূর্বেই গুর্জর-প্রতিহার রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আবার এই শাসনে দেখা যায়, প্রদত্ত ভূমি কান্যকুব্জ-ভুক্তির অন্তর্গত কালঞ্জর-মণ্ডলস্থিত উদুম্বর-বিষয়ে অবস্থিত ছিল এবং শাসনটি মূলতঃ মৌখরী শর্ববর্মার দ্বারা প্রদত্ত হয় এবং পরে দ্বিতীয় নাগভট এই দান অনুমোদন করেন। বলা হয়েছে যে, নাগভট-পুত্র রামভদ্রের রাজত্বকালে রাজকর্মচারীদের

ত্রটির জন্য উক্ত অনুমোদন অনুসারে কাজ হয় নি। সুতরাং নাগভটের সময় থেকেই কনৌজরাজ্য গুর্জর-প্রতিহারদের অধিকারে ছিল এবং তিনিই কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। কারণ সুদূর জোধপুর থেকে উত্তরপ্রদেশ শাসন করা এবং বাংলা-বিহার রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা সেকালের পক্ষে নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। এই ঘটনা ধর্মপালের রাজত্বকালীন বিষয় বলে মনে হয়। কারণ নাগভট এবং তিব্বতরাজের বিবরণে বিশেষভাবে ধর্মপালকেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবার আমরা দেখেছি যে, গুর্জর-প্রতিহার সৈন্য পূর্বদিকে মুঙ্গের পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল; কিন্তু পরে দেখা যাবে, দেবপাল এবং তাঁর পুত্রের সময়ে পশ্চিমদিকে বারাণসী পর্যন্ত পুনরায় পালসাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল।

দেবপালের তাম্রশাসনে ধর্মপাল সম্পর্কে আছে, তিনি দিগ্বিজয় উপলক্ষ্যে চতুর্দিকে গিয়ে উত্তরে কেদার তীর্থ, পূর্বে গঙ্গাসাগর এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে গোকর্ণপ্রমুখ তীর্থে ধর্মকার্য করেছিলেন। এই ধরনের চক্রবর্তিক্ষেত্রের উপর প্রভাববিস্তার-বিষয়ক দাবিকে যে সকল পণ্ডিত ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করেন, তাঁরা ভ্রান্ত। এসব দাবি বাচনিক মাত্র; এর কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নেই। আমরা পরে দেখব যে, পালবংশের লেখাবলীতে এই ধরনের চক্রবর্তিক্ষেত্র-বিজয়-মূলক একটি শ্লোক চার জন পালরাজার দিগ্বিজয় বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে। দেবপালের দুটি দাবির মধ্যে বিরোধও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

ধর্মপাল 'পরমসৌগত' অর্থাৎ বুদ্ধভক্ত ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল বিক্রমশীল এবং তিনি ভাগলপুরের অন্তর্গত কাহলগাঁওএর নিকটবর্তী আণ্টিচকে গঙ্গাতীরে বিক্রমশীল-বিহার নির্মাণ করেন। বর্তমান বিহারশরীফে ওদন্তপুরী বিহার নির্মাণ গোপাল, ধর্মপাল কি দেবপালের কৃতিত্ব, তিব্বতীয় কিংবদন্তী থেকে তা নিশ্চিত বোঝা যায় না। তারনাথ বলেছেন, দেবপাল সোমপুরী-বিহার নির্মাণ করেন; কিন্তু রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে উৎখননের ফলে জানা গিয়েছে, সেখানে সোমপুর-বিহার ধর্মপাল নির্মাণ করেছিলেন।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় পরবলের কন্যা রন্নাদেবী ধর্মপালের মহিষী ছিলেন। খালিমপুর শাসনের দূতক ছিলেন যুবরাজ ত্রিভুবনপাল। তিনি ধর্মপালের জীবৎকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারেন। এমনও হতে পারে যে, তিনি পরে ভ্রাতা দেবপাল কর্তৃক উৎখাত হয়েছিলেন। গর্গ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ধর্মপালের মন্ত্রী ছিলেন। খালিমপুর তাম্রশাসনটি ধর্মপালের রাজত্বের ৩২শ বৎসরে

প্রদত্ত হয়েছিল। এ থেকে তাঁর রাজত্বের দৈর্ঘ্য অনুমান করতে হবে। এতদ্বিষয়ক কিংবদন্তীগুলির অবশ্য কোনও মূল্য নেই। খালিমপুর শাসন দ্বারা পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত ব্যাঘ্রতটী-মণ্ডলের মহন্তাপ্রকাশ-বিষয়ে অবস্থিত তিনটি এবং স্থালীক্কট-বিষয়ের আম্রষণ্ডিকা-মণ্ডলস্থিত একটি গ্রাম দান করা হয়েছিল। সাধারণতঃ উত্তরবাংলা পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত ছিল ; কিন্তু ব্যাঘ্রতটী সম্ভবতঃ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বোত্তর ভাগে পদ্মার দক্ষিণে ও ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত লালগোলাঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত বাঘড়ী অঞ্চল। অবশ্য ধর্মপালের যুগে গঙ্গার জলরাশি ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত হত, পদ্মা দিয়ে নয়, এবং তখন গৌড়সমেত মালদহের দক্ষিণাঞ্চল গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। যাহোক, ধর্মপালের নালন্দা তাম্রশাসন দ্বারা নগর-ভুক্তির গয়া-বিষয়ে ভূমিদান করা হয়েছিল। নগর-ভুক্তির কেন্দ্র ছিল পাটলিপুত্রনগর অর্থাৎ বর্তমান পাটনা। তাঁর খালিমপুর শাসন পাটলিপুত্রস্থিত জয়স্কন্ধাবার থেকে প্রদত্ত হয়। বোধগয়ার শিলালেখ ধর্মপালের ২৬শ রাজ্যবর্ষে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এতে দেখা যায়, চম্পেশ নামক শিবের মন্দিরে জনৈক ভক্ত কর্তৃক চতুর্মুখ মহাদেব (শিবলিঙ্গ) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহাবোধিবাসী মল্ল-পুত্রগণের সাহায্যে দেবতার স্নানব্যবস্থার জন্য তিন সহস্র দ্রম্ম(রৌপ্যমুদ্রা)-ব্যয়ে পুষ্করিণী খনন করা হয়।

খালিমপুর শাসন অনুসারে ধর্মপাল চারটি গ্রাম নন্ন(নন্দ)-নারায়ণ সংজ্ঞক বিষ্ণুমূর্তির উদ্দেশ্যে দান করেন। কেউ কেউ এতে বৌদ্ধ ধর্মপালের ধর্মবিষয়ক উদারতা দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু প্রাচীনভারতীয় রাজগণের প্রদত্ত তাম্রশাসনের বেশীর ভাগই পুণ্যলোভী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভূমির মূল্য নিয়ে দেওয়া হত। তাতে ভূমিদান জনিত পুণ্যলাভ হত রাজার এক-ষষ্ঠাংশ এবং ভূমিক্রেতার পাঁচ-ষষ্ঠাংশ। অবশ্য রাজকীয় দলিলে এই বিষয়টি কদাচিৎ স্বীকার করা হত। কিন্তু খালিমপুর শাসনে উল্লেখ আছে যে, মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা শুভস্থলীতে মন্দির নির্মাণ করে নন্ন-নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তিনি ভূমিদানের জন্য যুবরাজ ত্রিভুবনপালের মারফত সম্রাটের নিকট আবেদন জানান। তিনি যে ভূমির মূল্য রাজকোষে জমা দিয়েছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ তা না হলে দানের সমস্তটা পুণ্যই দেশের রাজার ভাগে পড়বার কথা।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের প্রতি পন্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। খালিমপুর শাসনানুসারে প্রদত্ত পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির চারটি গ্রামের

একটির নাম ময়ূরশাল্মলী। আসামের ঐতিহাসিকেরা অনেকে গ্রামটির সঙ্গে নিধনপুর তাম্রশাসনানুসারে কামরূপরাজ মহাভূতবর্মা (আ ৫১৮-৪২ খ্রী) ও ভাস্করবর্মার (আ ৬০০-৫০ খ্রী) প্রদত্ত চন্দ্রপুরী-বিষয়ের অন্তর্গত ও কৌশিকা নদীর তীরস্থিত ময়ূরশাল্মলীগ্রামের অভিন্নতা কল্পনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সেকালে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি অর্থাৎ উত্তরবাংলা ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ-দেশের অন্তর্গত। এমন কি কৌশিকা নদীকে পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিমপ্রান্ত-বাহিনী কৌশিকী বা কোসী নদীর সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে তাঁরা বিহারের পূর্বাঞ্চল কামরূপের অন্তর্গত ছিল বলে মনে করেছেন। কিন্তু অভিলেখাদি থেকে মৌর্য হতে গুপ্ত-আমল পর্যন্ত উত্তরবাংলার পরিজ্ঞাত ইতিহাস এই ধারণার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। মহাভূতবর্মার সময় পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি যে গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, ৫৪৩ খ্রীস্টাব্দের ও তার পূর্ববর্তী দামোদরপুর তাম্রশাসনসমূহ তার প্রমাণ। সমস্ত আকর-গ্রন্থেই দেখা যায়, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-কামরূপের পশ্চিমসীমা ছিল করতোয়া নদী। ভাস্করবর্মার সময়ে হিউএন-চাঙ্‌ যে বৃহৎ নদী উত্তরণ করে পুণ্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপে পৌঁছেছিলেন, তার নাম করতোয়া বলে জানা যায়। এদিকে নিধনপুর শাসন শ্রীহট্ট জেলায় আবিষ্কৃত হয় এবং ঐ জেলায় প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে কোসিয়ার নদীর তীরবর্তী চন্দ্রপুর-বিষয়ের উল্লেখ আছে। কোসিয়ার নিধনপুর-শাসনের কৌশিকা ও বর্তমানের কোসিয়ারা এবং চন্দ্রপুর ও চন্দ্রপুরী অবশ্যই অভিন্ন। একথা বলা উচিত যে, আসামের ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত পুণ্ড্র-জাতির বাসস্থান সম্পর্কে Pargiter সাহেবের ভ্রান্তমতের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাহেব মৌর্যযুগের মহাস্থান অভিলেখ আবিষ্কারের বহু পূর্বে লিখেছিলেন। তবে 'দিব্যাবদান'-এ পুণ্ড্রবর্ধনকে রাজমহলের নিকটবর্তী কজঙ্গলের অনেকটা পূর্বদিকে অর্থাৎ উত্তরবাংলায় নির্দেশ করা হয়েছে, সাহেবের একথা জানা উচিত ছিল। পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন যে বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থান, এই প্রমাণিত সত্যটি না জেনেই এ বিষয়ে গবেষণা করা ঠিক হয় নি।

তাছাড়া, একথা অনেকের জানা আছে এবং আসামের ইতিহাসলেখক Gait সাহেবও বলেছেন যে, মধ্যযুগে কোসীনদী করতোয়ার উপনদী ছিল। সতত-পরিবর্তনশীল নদীর প্রবাহপথের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে কোসীনদী পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিমপ্রান্ত-বাহিনী ছিল মনে করা অবশ্যই অযৌক্তিক।

নালন্দা শাসনে যাদের উদ্দেশে দানের ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল, সেই তালিকায় গৌড়, মালব, খশ, কুলিক ও হূণ জাতীয় ভট-চাট-সেবকাদির উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে অনেকে রাজার সেনাদলে কাজ করত বলে বোধহয়। দেবপালের আমলে এই তালিকাতে কর্ণাট ও লাট-জাতির এবং মদনপালের সময়ে, চোড় বা চোল জাতির নাম সংযুক্ত হয়। পাল-সেনাদলে এইরূপ বিভিন্ন-দেশীয় বিদেশীসেনার নিয়োগ একটা উল্লেখনীয় বিষয়। ভারতের অন্যান্য রাজবংশের তাম্রশাসনে এইরূপ উল্লেখ কদাচিৎ দেখা যায়।

ধর্মপালের নালন্দা শাসনের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে,এই তাম্রশাসনে খালিমপুর ও অন্যান্য পালবংশীয় শাসনের রচনাপদ্ধতি অনুসৃত হয় নি। এটা অনেকটা প্রাক্-পালযুগের তাম্রশাসনসমূহের অনুরূপ। এটাতে কোনও প্রশস্তি-অংশ নেই। সম্ভবতঃ এটি ধর্মপালের রাজত্বের প্রথমভাগে প্রদত্ত হয়েছিল। শাসনটির কোনও কোনও অংশের অক্ষর অস্পষ্ট বা বিনষ্ট। পালরাজগণের অন্য শাসনাবলী গঙ্গাতীরবর্তী কোনও স্থানে অবস্থিত জয়স্কন্ধাবার হতে প্রদত্ত। কিন্তু নালন্দাশাসন প্রচারের স্থানটির নাম আনুমানিকভাবে পড়া হয়েছে কপিলাবাসক; স্থানটি গংগাতীরে অবস্থিত ছিল কিনা, তা বলা যায় না। শাসন প্রচারের স্থানগুলি যেন অনেকটা সাময়িক রাজধানীর মত ছিল। গয়া-বিষয় বা জেলার জম্বুনদী নামক বীথী বা বিভাগ-প্রতিবদ্ধ নিগুহগ্রাম-সন্নিহিত উত্তর-রামগ্রাম আর্য-তারাভট্টারিকার উদ্দেশ্যে দেবীমন্দিরের পুরোহিতকে প্রদত্ত হয়েছিল, এটাই নালন্দা শাসনের বিষয়বস্তু বলে বোধ হয়।

ধর্মপালের উত্তরাধিকারিগণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুবরাজ হারবর্ষ (আ ৮১০-১২ খ্রী) এবং মহারাজাধিরাজ দেবপাল (আ ৮১০-৪৭ খ্রী)

ধর্মপালের পর তাঁর পুত্র দেবপালকে আমরা পাল-সিংহাসনে দেখতে পাই। যুবরাজ ত্রিভুবনপালের কি হল, তা জানা যায় না। কিন্তু সোড্ঢলের 'উদয়-সুন্দরীকথা'য় কবি অভিনন্দকে পালরাজ যুবরাজের সভাকবি বলা হয়েছে এবং উল্লিখিত অভিনন্দের 'রামচরিত' কাব্যে এইরাজাকে পালবংশীয় যুবরাজ হারবর্ষ রূপে বর্ণিত দেখা যায়। 'রামচরিত'-এ বলা হয়েছে যে, তিনি ধর্মপালের কুলের গৌরব এবং বিক্রমশীলের পুত্র ছিলেন। এই বর্ণনা থেকে তাঁকে যুবরাজ ত্রিভুবন-পালের সঙ্গে অভিন্ন মনে হয়। বর্ষান্ত নাম রাষ্ট্রকূটবংশে সুপ্রচলিত ছিল এবং রাষ্ট্র-কূটবংশীয়া কন্যার গর্ভজাত বলেই হয়তো যুবরাজের হারবর্ষ নাম হয়। এথেকে মনে হয় যে, ধর্মপালের মৃত্যুর পর যুবরাজ ত্রিভুবনপাল দেবপালের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে কিছুকাল রাজত্বের চেষ্টা করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁকে উৎখাত করে দেবপাল সিংহাসন অধিকার করেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রেই হয়তো ত্রিভুবনপালকে তাঁর 'যুবরাজ' উপাধির উপর জোর দিতে বাধ্য হতে হয়েছিল এবং তার ফলে উপাধিটি তাঁর নামের মতই ব্যবহৃত হচ্ছিল। তাঁর রাষ্ট্রকূটধরনের 'হারবর্ষ' নামের উপর জোর দেবার কারণও হয়তো একই। অবশ্য অনেকসময় যুবরাজেরা রাজ্যাংশ শাসন করতেন।

পাল-লেখাবলীর প্রশস্তিমূলক বর্ণনার ভিত্তিতে দেবপালের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে ঐতিহাসিকগণের ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু এই রাজার আসল কৃতিত্ব তাতে ফুটে ওঠে নি। দেবপালের সাম্রাজ্যের বিশালতা সম্পর্কে তাঁর নিজের তাম্রশাসন এবং বাদাল প্রশস্তির দুটি শ্লোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রথমটিতে বলা হয়েছে যে, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সেতু-বন্ধ (রামেশ্বর) পর্যন্ত বিস্তৃত আর পূর্ব ও পশ্চিম-সমুদ্রের অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের মধ্যবর্তী সমগ্র পৃথিবীর উপর দেবপালের একচ্ছত্র অধিকার

প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে দেখা যায়, ব্রাহ্মণমন্ত্রী দর্ভপাণির মন্ত্রণাবলে দেবপাল যে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছিলেন, তার উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম-সীমা পূর্ববর্ণিত শ্লোকের অনুরূপ, কিন্তু দক্ষিণসীমা বিন্ধ্যপর্বত। এই দুটি বর্ণনার মূলে আছে সমগ্রভারত-বোধক আদি চক্রবর্তিক্ষেত্র এবং পরবর্তী কালে কল্পিত উত্তরভারত-বোধক ক্ষুদ্র চক্রবর্তিক্ষেত্র। যে কোনও সম্রাটই এ-ধরনের দাবি করতেন ; এর কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য নেই। বাদাল প্রশস্তিতে আরও দেখা যায়, দর্ভপাণির পৌত্র কেদারমিশ্রের মন্ত্রিত্বকালে দেবপাল উৎকল ও হূণদের পরাজিত করেন এবং দ্রবিড় ও গুর্জর-রাজগণের দর্প চূর্ণ করেন। এই ধরনের দাবিতে কিছু সত্যও থাকে, কিছু অতিরঞ্জনও দেখা যায়। কান্যকুব্জে অধিষ্ঠিত গুর্জর-প্রতিহারদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্যই ঘটেছিল। ধর্মপালের সময়ে গুর্জরেরা মুঙ্গের পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল ; কিন্তু দেবপাল গয়া-পাটনা অঞ্চলে ভূমিদান করেছিলেন এবং শূরপালের শাসন অনুসারে রাজমাতা অর্থাৎ দেবপালের মহিষী বল্লভরাজ-দুহিতা মাহটা বারাণসীতে মন্দির নির্মাণ ও সেখানে মাহটেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সারনাথে শূরপালের শাসনের প্রমাণ আছে। পালসাম্রাজ্যের পশ্চিমসীমা বারাণসী পর্যন্ত প্রসারিত করা দেবপালের কৃতিত্ব বলেই মনে হয়। আবার প্রতিহারবংশীয় ভোজের গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে তৎকর্তৃক ধর্ম বা ধর্মপালের পুত্রের রাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করার দাবি আছে। ভোজের সামন্ত গোরখপুরের কলচুরিরাজ গুণাম্ভোধি কর্তৃক গৌড়রাজ্য অপহরণের দাবিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। চাটসু লেখের গুহিল সামন্ত-গণও ভোজের পক্ষে গৌড়জয়ের দাবি করেছেন। পঞ্জাব অঞ্চলের হূণেরা গুর্জর-প্রতিহারদের সামন্ত বা মিত্র হিসাবে পূর্বভারতে পালসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করে থাকতে পারে। প্রতিবেশী উড়িষ্যার বালেশ্বর অঞ্চলের অধিবাসী উৎকলদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহও খুবই সম্ভব। কিন্তু সুদূরবর্তী দ্রবিড় অর্থাৎ তামিল-ভাষীদের দেশের সঙ্গে দেবপালের যুদ্ধের দাবি অন্য প্রমাণাভাবে গ্রহণ করা কঠিন। কেউ কেউ দ্রবিড় বলতে রাষ্ট্রকূটরাজ বুঝেছেন ; কিন্তু রাষ্ট্রকূটেরা ছিলেন কর্ণাট অর্থাৎ কন্নড-ভাষাভাষী। দ্রবিড় বা দ্রাবিড় দেশে এই সময় পল্লব এবং পাণ্ড্যরাজগণ পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। উত্তরভারতের রাজ-নীতির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কেবল অনুমানই করা যেতে পারে। কেউ কেউ

বিজেতা রূপে তাঁর বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১ তাঁরা মনে করেন যে, এখানে মগধ অর্থাৎ পাটনা-গয়া অঞ্চলের কোনও পাল-সামন্তের উল্লেখ থাকতে পারে। কিন্তু দক্ষিণভারতের ইতিহাস-চর্চাকারীরা এই মগধকে তামিল-নাড়ুর সেলাম জেলায় অবস্থিত সেকালের 'মগদৈ-নাড়ু' মনে করেছেন। তা ছাড়াও অসুবিধা এই যে, অতিরঞ্জনপ্রিয় প্রশস্তিকারগণ অনেকসময় তিলকে তাল করতেন! কোনও বিদেশীয় বণিকের উপঢৌকনকে তাঁর দেশবাসীর কর হিসাবে বর্ণনা করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হত না। তাই এসব ব্যাপারে সত্যনির্ণয় দুরূহ। বেলুবিকুড়ি তাম্রশাসনে (আ ৭৬৯ খ্রী) যে বেণ্ডৈ-এর যুদ্ধে 'পূর্বরাজা'দের হস্তে রাষ্ট্রকূটসম্রাটের পরাজয়ের কথা আছে, তার সঙ্গে পূর্বভারতের কোনও শক্তির সম্পর্ক ছিল বলে মনে করা যায় না।

নারায়ণপালের ভাগলপুর শাসনে দেখি, দেবপালের খুল্লতাতপুত্র ও সেনা-পতি জয়পালের ভয়ে উৎকলরাজ পলায়ন করেন এবং কামরূপরাজ বশ্যতা স্বীকার করেন। উৎকল-সম্বন্ধীয় দাবিটি দ্বিতীয়বার উপস্থাপিত হল ; সুতরাং এতে সত্যের পরিমাণ বেশী থাকার সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দেশ কামরূপ-বিষয়ক দাবির মধ্যেও কিছু সত্য থাকা অসম্ভব নয়। দেবপালের সময়েই ৮৩১ খ্রীস্টাব্দে উৎকলদেশের যাজপুরে ভৌম-কর বংশের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পূর্বে ৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে শুভকর নামক উড্ররাজ তাঁর স্বাক্ষর-সংবলিত একখানি পাণ্ডুলিপি চীনসম্রাটের নিকটে প্রেরণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এসময় উৎকল ও উড্র সমার্থক ছিল বলে মনে করা যায়।

দেবপালের তাম্রশাসনে দ্বিগ্বিজয়বর্ণন-প্রসঙ্গে তাঁর অশ্বারোহী সেনাদলের অশ্ববহুল কম্বোজদেশে উপস্থিত হবার কথা আছে। ভারতীয় সাহিত্যে উল্লিখিত কম্বোজ নামক ইরানীয় জাতি বর্তমান পাকিস্থান এবং আফগানিস্থান অঞ্চলে বাস করত। এই কম্বোজদেশ অশ্বের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাই কম্বোজদেশের অশ্বের উল্লেখ থেকে সহজেই ঐ দেশের কথা মনে হয়। অবশ্য দেবপালের সেনাদলের পক্ষে কম্বোজদেশে উপস্থিত হওয়া অপেক্ষা পূর্বপঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত প্রতিহার-সাম্রাজ্যের সেনাদলের সঙ্গে কম্বোজসেনার পূর্বভারতে উপস্থিতি অধিকতর সম্ভব। কিন্তু কেহ কেহ দেবপালের প্রসঙ্গে উল্লিখিত কম্বোজদিগকে তিব্বতীয় মনে করেছেন। তাহলে 'কম্বোজ' নামটি 'খাম্পা'র ন্যায় কোনও তিব্বতীয় জাতি-নামের সংস্কৃত রূপ। অবশ্য তিব্বতদেশের অশ্বেরও খ্যাতি আছে। কোনও কোনও ভাষাতত্ত্ববিদ মনে করেন

যে, কুম্বোজেরা উত্তর-বাংলার কোচ বা কোঁচদের পূর্বপুরুষ। আদি-মধ্য যুগে এরা বহুলসংখ্যায় উত্তরবাংলায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। যাহোক, ধর্মপালের প্রসঙ্গে তিব্বতীয়গণের পূর্বভারত আক্রমণ বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তাতে এই মত অসম্ভব মনে হয় না। দেবপালের রাজত্বকালে এবং তার পরেও যে তিব্বতীয় সংঘর্ষের জের মেটেনি, তার প্রমাণ আছে। যা হোক, নেপালী কিংবদন্তীতে তিব্বতকে কখনও কখনও কম্বোজ বলা হয়, একথা উল্লেখনীয়।

তিব্বতরাজ Ral-pa-chan (আ ৮১৭-৩৬ খ্রী) দেবপালের সমসাময়িক ছিলেন। Chronicles of Ladakh অনুসারে তিনি গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন। এদিকে শূরপালের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, দেবপাল নেপালরাজকে পরাজিত করেন, এবং এই সময় নেপাল তিব্বতের অধীন ছিল। তিব্বতীয় আক্রমণ দেবপালের রাজত্বের প্রথমদিকের ঘটনা হতে পারে। পশ্চিমে ব্যরাণসী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার তাঁর রাজত্বের শেষ-দিকের ঘটনা বলে মনে হয়। কিন্তু পরবর্তী কালের ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে, ধর্মপাল ও দেবপালের আমলে কোচজাতির যে সকল তিব্বতীয় পূর্ব-পুরুষ উত্তরবাংলায় প্রবেশ করেছিল, তারা ঐ অঞ্চলেই থেকে যায়। সাময়িকভাবে তারা পালসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে পারে। কিন্তু প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল (আ ৮৮৫-৯০৮) কর্তৃক বিহার-বাংলার অনেকাঞ্চল অধিকার এবং দশম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে কম্বোজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পাল-কম্বোজ সংঘর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

দেবপাল অন্ততঃ ৩৫ বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন। নালন্দা তাম্রশাসন তাঁর রাজত্বের ৩৫শ রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হয়। কেহ কেহ তারিখটিকে ৩৯শ বর্ষ পড়েছেন। দেবপালের লেখাবলী সবই বিহারে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু নালন্দা শাসনের দূতক (executor) ছিলেন ব্যাঘ্রতটী-মণ্ডলের শাসক বলবর্মা। এই মণ্ডলটি বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বোত্তর অঞ্চলের বাঘড়ী বলে মনে হয়। দেবপালের মুঙ্গের শাসনের দূতক ছিলেন তাঁর অন্যতম পুত্র রাজ্যপাল। একখানি অপ্রকাশিত শিলালেখে দেবপালের জনৈক অমাত্যের সংগে উত্তরবাংলার পাবনা জেলার কিছু সম্পর্ক ছিল দেখা যায়।

দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে পাল-সাম্রাজ্যের সঙ্গে যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয়েশিয়ার শৈলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজগণের মৈত্রীর বিষয় জানা যায়। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্র নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করেন

এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করার উদ্দেশ্যে দেবপালের কাছে আবেদন করেন। দেবপাল তাঁর প্রার্থনানুসারে গ্রামপঞ্চক নিষ্কর দান করেছিলেন। অবশ্যই এই নিষ্কর সম্পত্তি সৃষ্টির জন্য বালপুত্রকে পালরাজ-কোষে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল। কারণ তা না করলে দানের পুণ্য সমস্তটাই দেবপালের হত। টাকা দিলে দাতা দানজনিত পুণ্যের ৬ ভাগের মধ্যে ৫ ভাগের অধিকারী হতেন।

মুঙ্গের তাম্রশাসন মুদ্গগিরি-সমাবাসিত জয়কন্ধাবার থেকে প্রদত্ত হয়েছিল। শ্রীনগর-ভুক্তির অন্তর্গত ক্রিমিলা-বিষয়স্থিত মেষিকা নামক গ্রামটি পদ-বাক্য-প্রমাণ-পারঙ্গত পণ্ডিত ঔপমন্যব-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বীহেকরাতমিশ্রকে স্থায়িভাবে নিষ্কর দান করা হয়। ক্রিমিলা বা কৃমিলা নামক বিষয়টির প্রধান নগর ক্রিমিলা (কৃমিলা) বর্তমান লক্ষ্মীসরাই রেলস্টেশনের পশ্চিমদিকে মনকথার নিকটবর্তী বালগুদর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

নালন্দা শাসনানুসারে প্রদত্ত গ্রামপঞ্চকের মধ্যে চারটি ছিল রাজগৃহ-বিষয়ে এবং একটি গয়া-বিষয়ে। গ্রামগুলিকে বিষয়দুটির অন্তর্গত 'নয়' বা 'বীথী' সংজ্ঞক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। যেমন—রাজগৃহ-বিষয়ের অন্তর্গত অজপুর-নয়-প্রতিবদ্ধ নন্দিবনাক ও মণিবাটক, পিলিপিণ্কা-নয়-প্রতিবদ্ধ নটিকা ও অচলা-নয়-প্রতিবদ্ধ হস্তিগ্রাম এবং গয়া-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কুমুদসূত্র-বীথী-প্রতিবদ্ধ পালামকগ্রাম। 'পালামক' নামটি আধুনিক 'পালামৌ'-এর মত শোনায়।

আমরা দেখেছি যে, প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট (আ ৮০০-৩৩ খ্রী) কান্যকুব্জে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং কিছুকাল পরে তাঁর সেনাদল পূর্বদিকে মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) পর্যন্ত পৌঁছে গৌড়সেনা পরাজিত করে। কিন্তু তার পরে দেবপালকে পাটনা ও গয়া জেলাতে ভূমিদান করতে দেখা যায়। তাঁর রাজত্বেরই শেষভাগে তাঁর মহিষী দুর্লভরাজ-কন্যা মাহটাদেবী বারাণসীতে শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে বোধ হয়। সুতরাং তিনি যে কেবল মুঙ্গের ও পাটনা অঞ্চল থেকে প্রতিহারদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাই নয় ; এমন কি, বারাণসীতেও তাঁর অধিকার প্রসারিত হয়। এটা দেবপালের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়। তিব্বতরাজ Ral-pa-chan-এর বাংলায় বিজয়াভিযান-চালনা এর পূর্ববর্তী এবং প্রতিহারদের মুঙ্গের আক্রমণের সমসাময়িক ঘটনা বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম শূরপাল (আ ৮৪৭-৬০ খ্রী)
এবং প্রথম বিগ্রহপাল (৮৬০-৬১ খ্রী)

দেবপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শূরপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অন্ততঃ ১২ বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন। কারণ সম্প্রতি তাঁর দ্বাদশ রাজ্যবর্ষের একটি মূর্তিলেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্বে মুঙ্গের জেলার রাজৌনাগ্রামে তাঁর রাজত্বের ৫ম বর্ষে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর ৩য় রাজ্যসংবৎসরে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসনে দেখা যায়, রাজা তাঁর মাতা শিবভক্তা মাহটার অনুরোধে বারাণসীর কাছাকাছি চারটি গ্রাম বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের উদ্দেশ্যে দান করেন। দুটি গ্রাম মাহটেশ্বর নামক শিবের পূজাদি ও মন্দিরের সংস্কার প্রভৃতি কার্যের জন্য এবং অপর দুটি গ্রাম ঐ কার্যের ভারপ্রাপ্ত পাশুপত আচার্যপর্ষদের সকলপ্রকার ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রদত্ত হয়। গ্রামগুলি শ্রীনগর-ভুক্তির অন্তর্গত ক্রোঞ্চধানক-বিষয়স্থিত অঙ্গারগর্তিকা, দেবরাষ্ট্র-বিষয়ভুক্ত বাসন্তী (বাসন্তিকা) ও কুলপুত্র (কলপুত্রক), এবং কল্মষ-নাশপার-বিষয়ের অধীন নবল্লিকা। এর মধ্যে বারাণসীস্থিত মন্দিরে পূজিত মাহটেশ্বরকে দেওয়া হল অঙ্গারগর্তিকা ও বাসন্তিকা। শৈবাচার্য-পর্ষদের জন্য কুলপুত্র ও নবল্লিকা নির্দিষ্ট রইল। 'কল্মষনাশ' অর্থ 'পাপনাশ'। এই নাম থেকেই পরে 'কর্মনাশা' সংজ্ঞক নদীর নাম উদ্ভূত হয়েছে বলে বোধহয়। কর্মনাশা নদী বর্তমানে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সীমা—পাটনা ও বারাণসী জেলারও সীমা। কল্মষনাশপার-বিষয়টি অবশ্যই পাটনার দিক্ থেকে কর্মনাশা নদীর পরপারে অর্থাৎ পশ্চিমপারে আধুনিক বারাণসী জেলায় অবস্থিত ছিল। এই শাসনের দূতক ছিলেন বল্লবর্মা। দেবপালের নালন্দা শাসন থেকে জানা যায় যে, বলবর্মা বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বোত্তর অঞ্চলে অবস্থিত ব্যাঘ্রতটী-মণ্ডলের শাসনকর্তা ছিলেন। বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথেও শূরপালের সময়ের একটি মূর্তিলেখ পাওয়া গিয়েছে। বলবর্মা হয়তো এ সময় বারাণসী অঞ্চলের শাসক ছিলেন এবং রাজমাতা, বারাণসীতে বাস করছিলেন।

শূরপালের তাম্রশাসন আবিষ্কারের পূর্বে তাঁর সঙ্গে দেবপালের সম্পর্ক জানা ছিল না। তখন পরবর্তী নরপতি নারায়ণপালের পিতা প্রথম বিগ্রহপালের সাথে তাঁকে অভিন্ন মনে করা হত। তার কারণ মন্ত্রিবংশের বাদাল প্রশস্তিতে দেবপাল এবং নারায়ণপালের মধ্যে শূরপাল নামক রাজা রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। উল্লিখিত বিগ্রহপাল ছিলেন দেবপালের খুল্লতাত-পুত্র জয়পালের পুত্র। সুতরাং এখন জানা গেল যে, দেবপাল-পুত্র শূরপাল এবং জয়পাল-পুত্র বিগ্রহপাল স্বতন্ত্র। প্রথম বিগ্রহপাল শূরপালকে উৎখাত করে রাজা হয়েছিলেন বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। তাঁর সময়ের কোনও অভিলেখ আবিষ্কৃত হয় নি। সম্ভবতঃ বিগ্রহপাল অল্পকালমাত্র রাজত্ব করেছিলেন। তিনি হৈহয় বা কলচুরিবংশের কন্যা লজ্জাকে বিবাহ করেন। পালবংশের পরবর্তী রাজা এই লজ্জার গর্ভজাত নারায়ণপাল।

নারায়ণপালের পরবর্তী অভিলেখ বিহারশরীফে প্রাপ্ত তাঁর ৫৪তম রাজ্যবর্ষে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তিতে উৎকীর্ণ ; ১৭শ বর্ষ থেকে পরবর্তী ৩৭ বৎসরের মধ্যে তাঁর আর কোনও লেখ পাওয়া যায় নি ! এর কারণ এই সময়মধ্যে প্রতিহাররাজ পূর্বভারতে প্রভাববিস্তারে সমর্থ হন। দক্ষিণবিহার এবং উত্তরবাংলায় ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপালের কতকগুলি অভিলেখ পাওয়া গিয়েছে। সেগুলির তারিখ তাঁর ২য় থেকে ১৫শ বা ১৯শ রাজ্য-সংবৎসরের মধ্যে অর্থাৎ নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং দশম শতাব্দীর প্রথম দশকে। বাংলা ও বিহারের আরও কতটা প্রতিহার রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল, তা নিশ্চিত জানার উপায় নেই। তবে দীর্ঘকালের জন্য নারায়ণপালের অবস্থা যে খুবই শোচনীয় হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এই সময়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব বাংলায় চন্দ্রবংশীয় ত্রৈলোক্যচন্দ্র (আ ৯০৫-২৫ খ্রী) স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন। নারায়ণপাল হয়তো প্রতিহাররাজের বশ্যতা স্বীকার দ্বারা কোনও রকমে আত্মরক্ষা করেছিলেন অথবা কোথাও কোনও রূপে টিঁকে ছিলেন। সম্ভবতঃ মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পর, প্রতিহার-সিংহাসন নিয়ে তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে, সেই

গৃহবিপ্লবের সুযোগে দু-পক্ষের কোনও একটিতে যোগ দিয়ে নারায়ণ হৃতরাজ্য উদ্ধারের সুযোগ পান। কিন্তু বাংলার উত্তর-অঞ্চলে এই সময় কম্বোজদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই কম্বোজেরা সমতটদেশ আক্রমণ করে। কিন্তু পরবর্তী কালে কম্বোজবংশীয় তিনজন নরপতি প্রায় ৩০।৪০ বৎসরকাল দক্ষিণপশ্চিম বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন। দিনাজপুর স্তম্ভলেখের কম্বোজ-বংশীয় শৈব রাজা কুঞ্জরঘটাবর্ষ আপনাকে গৌড়পতি বলে ঘোষণা করেন। তবে শীঘ্রই কম্বোজগণ উত্তরবাংলা থেকে উৎখাত হয় যদিও বাংলার দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলের কম্বোজদের পরবর্তী কালে প্রদত্ত দুখানি তাম্রশাসন উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় পাওয়া গিয়েছে।

কেউ কেউ রাজা নারায়ণপালের দুর্গতির প্রসঙ্গে রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণের (৮৮০-৯১৫ খ্রী) দাবির উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণের দাবি এই যে, তিনি গৌড়দের বিনয় শিখিয়েছিলেন এবং অঙ্গ, কলিঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ তাঁর বশবর্তী হয়েছিল। আবার কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত বেলনাণ্ডুর ক্ষুদ্র রাজা প্রথম মল্ল বঙ্গ, মগধ ও গৌড়গণকে দমনের দাবি করেছেন। মল্ল হয়তো দ্বিতীয় কৃষ্ণের সামন্ত ছিলেন। এই সব দাবির মূল্য কতটা, তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে তা খুব বেশী না হতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজ্যপাল (আ ৯১৭-৫২ খ্রী)

অনেকদিন থেকে ঐতিহাসিকেরা বলে আসছেন যে, দেবপালের পর পাল-সাম্রাজ্যের অধিকাংশ শত্রুকবলিত হয় এবং শতাধিক বৎসর পরে প্রথম মহীপাল হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। দুঃখের বিষয়, নূতন প্রমাণ আবিষ্কারের ফলে বোঝা গিয়েছে যে, এই ধারণাতে অনেকটা ত্রুটি আছে।

শেষজীবনে নারায়ণপাল বাংলার কোনও অংশে রাজত্ব করতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাঁর পুত্র রাজ্যপাল কম্বোজদের হাত থেকে গৌড় অঞ্চল অর্থাৎ উত্তরবাংলা পুনরাধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে বোধ হয়। রাজ্যপালের লেখাবলী বিহারেই বেশী পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি রাজশাহী জেলার ভাতুড়িয়াতে তাঁর তন্ত্রাধিকারী সংজ্ঞক উচ্চকর্মচারী যশোদাসের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নামে মাত্র ১০০ পুরাণ বার্ষিক-কর ধার্য করে গ্রামদান-বিষয়ক একটি প্রশস্তি পাওয়া গিয়েছে। এই প্রশস্তিতে ম্লেচ্ছ, অঙ্গ, কলিঙ্গ, বঙ্গ, ওড্র, পাণ্ড্য, কর্ণাট, লাট, সুহ্ম, গুর্জর, ক্রীত এবং চীনদের রাজ্যপালের বশীভূত বলা হয়েছে। এতে কতটা ইতিহাস এবং কতটা অত্যুক্তি, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে ক্রীত ছিল বর্তমান পাকিস্থানের বিদেশী রাজবংশ-বিশেষের নাম। ম্লেচ্ছরা সিন্ধুদেশের আরব মুসলমান হতে পারে। লাট বা দক্ষিণ গুজরাত তখন রাষ্ট্রকূটদের প্রভাবাধীন ছিল। কোন্ সূত্রে পাণ্ড্য, কর্ণাট, লাট, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি পালরাজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে, নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত না হলে তা বোঝা সম্ভব নয়। অঙ্গ বা পূর্ববিহারের উল্লেখ বিপ্লবদমন-মূলক বলে মনে করা যায়। বঙ্গের বিক্রমপুর এসময় চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজধানী হয়েছিল। কিন্তু চীনের উল্লেখ এক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান্। কারণ ভারতীয় ভাষায় 'চীন' বলতে তিব্বত এবং 'মহাচীন' বলতে প্রকৃত চীন-দেশ বোঝাত। রাজ্যপালের শত্রু চীনেরা সম্ভবতঃ দেবপালের শত্রু কম্বোজ। রাজ্যপাল যে কম্বোজদের কবল থেকে উত্তরবাংলা অধিকার করেছিলেন, তার একটা প্রমাণ রাজশাহী জেলায় তাঁর রাজত্বের অভিলেখ আবিষ্কার। তাছাড়া,

কুঞ্জরঘটাবর্ষের পরবর্তী কম্বোজরাজগণ কেউ আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলেন নি। অথচ সমসাময়িক কামরূপরাজ রত্নপালের বর্ণনায় আসামের প্রাচীন অভিলেখে রাজ্যপালকে গৌড়ের অধীশ্বর বলা হয়েছে। কামরূপরাজ দাবি করেছেন যে, তিনি গঙ্গানদীর নিকটে গৌড়পতি রাজ্যপালকে পরাজিত করেছিলেন। রাজ্যপালের সময় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র (৯১৫-২৭ খ্রী) প্রতিহার-রাজধানী মহোদয় বা কনৌজ ধ্বংস করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। তার ফলে প্রতিহার-শক্তি কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তা বলা যায় না। কারণ কনৌজে রাষ্ট্রকূট-অধিকার স্থাপিত হয় নি। তবে ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিহারদের দুর্বলতার সুযোগে মধ্যভারতে চন্দেল্ল ও কলচুরিগণ প্রবল হতে থাকে। অবশ্য চন্দেল্ল যশোবর্মা কর্তৃক গৌড়দের পরাজয়ের দাবিতে ঐতিহাসিকতা আছে কিনা সন্দেহ।

বাংলা-বিহারের বিস্তৃত অঞ্চলে রাজ্যপালের অধিকার স্বীকৃত হত। সুতরাং তিনি অবশ্যই পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। পালবংশীয় রাজ্যপালের মহিষীর নাম ভাগ্যদেবী এবং কম্বোজবংশীয় রাজ্যপালের মহিষীর নামও ছিল ভাগ্যদেবী। আসামের প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত আছে। রাজা সমুদ্রবর্মার মহিষীর নাম দত্তবতী। তাঁদের নাম সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত ও তন্মহিষী দত্তদেবীর অনুকরণ। অনেকে মনে করেছেন যে, সমুদ্রবর্মার পিতা পুষ্যবর্মা সমুদ্রগুপ্তের বশীভূত-মিত্র ছিলেন এবং সম্রাটের ও তাঁর মহিষীর নামে পুত্র ও পুত্রবধূর নামকরণ করেছিলেন। পালবংশীয় সম্রাট্ ও মহিষীর নাম থেকে অনুকৃত কম্বোজরাজ ও তাঁর মহিষীর নাম কম্বোজদের বশীভূত-মিত্রত্বের দ্যোতক কিনা, তা বিবেচনার বিষয়। আমাদের তো তাই মনে হয়।

রাজ্যপালের মহিষী ভাগ্যদেবী রাষ্ট্রকূটরাজ তুঙ্গের কন্যা ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই তুঙ্গ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গ হতে পারেন। জগত্তুঙ্গ পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তবে পূর্বে হয়তো তিনি পিতার সাম্রাজ্যের অঞ্চলবিশেষ শাসন করছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় গোপাল (আ ৯৫২-৭২ খ্রী) এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (আ ৯৭২-৭৭ খ্রী)

রাজ্যপাল অন্ততঃ তাঁর ৩২শ রাজ্যবর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোপাল সিংহাসনে আসীন হন। বিহারে ও বাংলায় দ্বিতীয় গোপালের লেখাবলী পাওয়া গিয়েছে। তাঁর ষষ্ঠ বর্ষের জাজিলপাড়া শাসন দ্বারা তিনি পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তিতে ভূমিদান করেছিলেন, অর্থাৎ পিতা রাজ্যপালের ন্যায় উত্তরবাংলায় দ্বিতীয় গোপালের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাছাড়া, বর্তমান কুমিল্লা জেলার মন্ধুকগ্রামে অর্থাৎ সমসাময়িক চন্দ্রবংশীয় স্বাধীন রাজা শ্রীচন্দ্রের রাজ্যমধ্যে গোপালের রাজত্বের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং তিনি চন্দ্ররাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করেছিলেন। আবার চন্দ্রবংশের শাসনে বলা হয়েছে যে, শ্রীচন্দ্র গোপালকে সংরোপণ অর্থাৎ সিংহাসনে স্থাপিত বা পুনঃস্থাপিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, অবরুদ্ধা পালরাজমহিষীকে শ্রীচন্দ্র তাঁর স্বামীকে প্রত্যর্পণ করেছিলেন। এতে মনে হয় দ্বিতীয় গোপাল প্রথমে শ্রীচন্দ্রকে পরাজিত করে চন্দ্ররাজ্যের কিয়দংশ আত্মসাৎ করেন ; কিন্তু পরে তিনি শ্রীচন্দ্রের হস্তে পরাজিত হয়ে চন্দ্ররাজের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। কেউ কেউ মনে করেন যে, চন্দ্ররাজ্যের মধ্যে পালসম্রাট্‌দের রাজত্বকালীন মূর্তিলেখ-আবিষ্কার পালরাজা কর্তৃক চন্দ্ররাজ্য আক্রমণজনিত অল্পকালস্থায়ী সাফল্যের দ্যোতক। এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ মূর্তিলেখ সরকারী দলিল নয়, কোনও রাজার অধিকার-সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের স্বীকৃতিমূলক দলিল।

জাজিলপাড়া তাম্রশাসন বটপর্বতিকাস্থিত জয়কন্ধাবার থেকে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত হয়। বটপর্বতিকা (বটপর্বত) ভাগলপুরের ২৫ মাইলের মত পূর্বে কাহলগাঁয়ের কাছাকাছি। সেখানে এখনও বটেশ্বরনাথ শিব পূজা পেয়ে থাকেন। অষ্টম শতাব্দীর একখানি শিলালেখে এই শিবের ড়-এর স্থলে মূর্ধণ্য-ল দিয়ে লিখিত 'বড়েশ্বর' নাম দেখা গিয়েছে। জাজিলপাড়া শাসনের

প্রদত্ত গ্রাম ছিল দুটি—কাষ্ঠগৃহ ও মহারাজপল্লিকা। গ্রামদুটি পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির কুদ্দালখাত নামক বিষয়-সম্বদ্ধ আনন্দপুর-অগ্রহারের অন্তর্গত ছিল। ‘অগ্রহার’ কথা থেকে বোঝা যায় পূর্বে আনন্দপুর নিষ্করসম্পত্তি হিসাবে কাউকে দান করা হয়েছিল। তাই হয়তো কোনও কারণে ওটি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়, নয়তো পূর্বাগ্রহারিকের কাছ থেকে অগ্রহারের কিয়দংশ কিনে নিয়ে নূতন করে নিষ্কর দানের ব্যবস্থা হয়। দানের গ্রহীতা ছিলেন সামবেদীয় কাশ্যপগোত্রী ব্রাহ্মণ শ্রীধরশর্মা। তিনি সীহ(সিংহ)গ্রামের অধিবাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁর পরিবারের আদিবাস ছিল মুক্তাবস্তুগ্রামে। মুক্তাবস্তু মধ্যদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশে) অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়।

দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে ‘মৈত্রেয়ব্যাকরণ’-এর একখানি পুথি অনুলিখিত হয়। অনুলিখনের তারিখ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৫৭, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ এবং দেবদত্ত ভাণ্ডারকর ১১ রাজ্য-সংবৎসর পাঠ করেন। তারিখের প্রথম অঙ্কটি অবশ্যই ১; কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কটি ঠিক বোঝা যায় না। আমাদের বিবেচনায় ভাণ্ডারকরের পাঠই হয়তো ঠিক।

এই রাজার জাজিলপাড়া তাম্রশাসনে ‘দেশে প্রাচি প্রচুর-পয়সি’ ইত্যাদি চক্রবর্তিক্ষেত্র-বিজয় মূলক একটি শ্লোক আছে। কিন্তু এই ধরনের দিগ্বিজয়-বর্ণনায় কোনও ঐতিহাসিকতা থাকে না, আগে সেকথা বলেছি। এ বর্ণনাটির যে কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নেই, তার বিশেষ প্রমাণ রয়েছে। কারণ ঐ একই শ্লোক প্রথম মহীপালের একটি শাসনে তাঁর নিজের এবং অন্যশাসনে তাঁর পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের দিগ্বিজয়-বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে। আবার তৃতীয় বিগ্রহপালের শাসনে তাঁর নিজের দিগ্বিজয়ের বর্ণনাও ঐ শ্লোকটি দিয়েই সম্পন্ন হয়েছে দেখা যায়।

দ্বিতীয় গোপালের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অল্পকাল রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ের কোনও অভিলেখ বা পুথি আবিষ্কৃত হয় নি। বৈগুরাইয়ের নিকটবর্তী নৌলাগড়ে বিগ্রহপাল নামক রাজার ২৪শ বর্ষে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সেই বিগ্রহপালেরই ২৬শ রাজ্যসংবৎসরে ‘পঞ্চরক্ষা’র একখানি পুথি অনুলিখিত হয়। এই বিগ্রহ-পালকে কেউ কেউ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল বলে স্থির করেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত মনে করি। কারণ এই রাজার দীর্ঘরাজত্বের কিছুমাত্র প্রমাণ নেই; কিন্তু তাঁর প্রপৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল অন্ততঃ ১৭ বৎসর ছিল বলে জানা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় গোপাল (আ ৯৫২-৭২ খ্রী) এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (আ ৯৭২-৭৭ খ্রী)

রাজ্যপাল অন্ততঃ তাঁর ৩২শ রাজ্যবর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোপাল সিংহাসনে আসীন হন। বিহারে ও বাংলায় দ্বিতীয় গোপালের লেখাবলী পাওয়া গিয়েছে। তাঁর ষষ্ঠ বর্ষের জাজিলপাড়া শাসন দ্বারা তিনি পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তিতে ভূমিদান করেছিলেন, অর্থাৎ পিতা রাজ্যপালের ন্যায় উত্তরবাংলায় দ্বিতীয় গোপালের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাছাড়া, বর্তমান কুমিল্লা জেলার মনধুকগ্রামে অর্থাৎ সমসাময়িক চন্দ্রবংশীয় স্বাধীন রাজা শ্রীচন্দ্রের রাজ্যমধ্যে গোপালের রাজত্বের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং তিনি চন্দ্ররাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করেছিলেন। আবার চন্দ্রবংশের শাসনে বলা হয়েছে যে, শ্রীচন্দ্র গোপালকে সংরোপণ অর্থাৎ সিংহাসনে স্থাপিত বা পুনঃস্থাপিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, অবরুদ্ধা পালরাজমহিষীকে শ্রীচন্দ্র তাঁর স্বামীকে প্রত্যর্পণ করেছিলেন। এতে মনে হয় দ্বিতীয় গোপাল প্রথমে শ্রীচন্দ্রকে পরাজিত করে চন্দ্ররাজ্যের কিয়দংশ আত্মসাৎ করেন ; কিন্তু পরে তিনি শ্রীচন্দ্রের হস্তে পরাজিত হয়ে চন্দ্ররাজের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। কেউ কেউ মনে করেন যে, চন্দ্ররাজ্যের মধ্যে পালসম্রাট্‌দের রাজত্বকালীন মূর্তিলেখ-আবিষ্কার পালরাজা কর্তৃক চন্দ্ররাজ্য আক্রমণজনিত অল্পকালস্থায়ী সাফল্যের দ্যোতক। এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ মূর্তিলেখ সরকারী দলিল নয়, কোনও রাজার অধিকার-সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের স্বীকৃতিমূলক দলিল।

জাজিলপাড়া তাম্রশাসন বটপর্বতিকাস্থিত জয়কন্ধাবার থেকে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত হয়। বটপর্বতিকা (বটপর্বত) ভাগলপুরের ২৫ মাইলের মত পূর্বে কাহলগাঁয়ের কাছাকাছি। সেখানে এখনও বটেশ্বরনাথ শিব পূজা পেয়ে থাকেন। অষ্টম শতাব্দীর একখানি শিলালেখে এই শিবের ড়-এর স্থলে মূর্ধণ্য-ল দিয়ে লিখিত 'বড়েশ্বর' নাম দেখা গিয়েছে। জাজিলপাড়া শাসনের

প্রদত্ত গ্রাম ছিল, দুটি—কাষ্ঠগহ ও মহারাজপল্লিকা। গ্রামদুটি পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির কুদ্দালখন্ত নামক বিষয়-সম্বদ্ধ আনন্দপুর-অগ্রহারের অন্তর্গত ছিল। 'অগ্রহার' কথা থেকে বোঝা যায় পূর্বে আনন্দপুর নিস্করসম্পত্তি হিসাবে কাউকে দান করা হয়েছিল। তাই হয়তো কোনও কারণে ওটি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়, নয়তো পূর্বাগ্রহারিকের কাছ থেকে অগ্রহারের কিয়দংশ কিনে নিয়ে নূতন করে নিষ্কর দানের ব্যবস্থা হয়। দানের গ্রহীতা ছিলেন সামবেদীয় কাশ্যপগোত্রী ব্রাহ্মণ শ্রীধরশর্মা। তিনি সীহ(সিংহ)গ্রামের অধিবাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁর পরিবারের আদিবাস ছিল মুক্তাবস্তুগ্রামে। মুক্তাবস্তু মধ্যদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশে) অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়।

দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে 'মৈত্রেয়ব্যাকরণ'-এর একখানি পুথি অনুলিখিত হয়। অনুলিখনের তারিখ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৫৭, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ এবং দেবদত্ত ভাণ্ডারকর ১১ রাজ্য-সংবৎসর পাঠ করেন। তারিখের প্রথম অঙ্কটি অবশ্যই ১; কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কটি ঠিক বোঝা যায় না। আমাদের বিবেচনায় ভাণ্ডারকরের পাঠই হয়তো ঠিক।

এই রাজার জাজিলপাড়া তাম্রশাসনে 'দেশে প্রাচি প্রচুর-পয়সি' ইত্যাদি চক্রবর্তিক্ষেত্র-বিজয় মূলক একটি শ্লোক আছে। কিন্তু এই ধরনের দিগ্বিজয়-বর্ণনায় কোনও ঐতিহাসিকতা থাকে না, আগে সেকথা বলেছি। এ বর্ণনাটির যে কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নেই, তার বিশেষ প্রমাণ রয়েছে। কারণ ঐ একই শ্লোক প্রথম মহীপালের একটি শাসনে তাঁর নিজের এবং অন্যশাসনে তাঁর পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের দিগ্বিজয়-বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে। আবার তৃতীয় বিগ্রহপালের শাসনে তাঁর নিজের দিগ্বিজয়ের বর্ণনাও ঐ শ্লোকটি দিয়েই সম্পন্ন হয়েছে দেখা যায়।

দ্বিতীয় গোপালের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অল্পকাল রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ের কোনও অভিলেখ বা পুথি আবিষ্কৃত হয় নি। বেগুরাইয়ের নিকটবর্তী নৌলাগড়ে বিগ্রহপাল নামক রাজার ২৪শ বর্ষে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সেই বিগ্রহপালেরই ২৬শ রাজ্যসংবৎসরে 'পঞ্চরক্ষা'র একখানি পুথি অনুলিখিত হয়। এই বিগ্রহ-পালকে কেউ কেউ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল বলে স্থির করেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত মনে করি। কারণ এই রাজার দীর্ঘরাজত্বের কিছুমাত্র প্রমাণ নেই; কিন্তু তাঁর প্রপৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল অন্ততঃ ১৭ বৎসর ছিল বলে জানা

গিয়েছে। তাছাড়া, এখন আমরা জানি যে, মদনপাল ১১৪৩-৪৪ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন এবং তাঁর পিতা রামপাল অন্ততঃ তাঁর ৫৩তম রাজ্যবর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই গণ্ডীর কাছাকাছি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিগ্রহপাল উভয়ের দীর্ঘরাজত্ব সম্ভব বলে মনে হয় না। সুতরাং যাঁর ১৭ বৎসরের রাজত্বের প্রমাণ রয়েছে অন্ততঃ পক্ষে ২৬ বৎসরের রাজত্ব সেই তৃতীয় বিগ্রহপালেরই হওয়া সম্ভব; যাঁর রাজত্বের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি নে, সেই দ্বিতীয় বিগ্রহপালের ২৬ বৎসরের রাজত্বের কল্পনা নিতান্তই অবিশ্বাস্য। বিশেষতঃ, প্রথম মহীপালের অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী দীর্ঘ রাজত্ব তাঁর পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের ২৬ বৎসরের দীর্ঘরাজত্বের সমর্থক বলে মনে হয় না।

মহীপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম মহীপাল (আ ৯৭৭-১০২৭ খ্রী)

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালকে দ্বিতীয়-পালসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা
বলা হয়। এই বর্ণনায় অতিশয়োক্তি আছে। কারণ পূর্বে যখন দেবপালের
পর বাংলায় পাল-অধিকারের বিশেষ প্রমাণ ছিল না, তখন হয়তো সে সময়
পালসাম্রাজ্যের অধঃপতনের সম্ভাবনা কল্পনা করা চলত। কিন্তু এখন দেখা
যাচ্ছে যে, রাজ্যপাল ও দ্বিতীয় গোপালের রাজ্য বিহার ও বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল
জুড়ে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের অল্পকালের রাজত্বে এই অবস্থার
কতটা পরিবর্তন হয়েছিল, তা বলা সহজ নয়। তবে আসামের একখানি প্রাচীন
শাসনে শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্র কর্তৃক গৌড়রাজের পরাজয়ের ইঙ্গিত আছে।
এই গৌড়রাজ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল হওয়া সম্ভব। যাহোক, মহীপালের সময়
পালসাম্রাজ্যের গৌরব অবশ্যই কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মহীপালের তাম্রশাসনে তিনি দাবি করেছেন যে, অনধিকারীদের দ্বারা
বিলুপ্ত পিত্র্য রাজ্য তৎকর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। 'পিত্র্য রাজ্য' বলতে অনেকেই
পিতৃভূমি বুঝেছেন এবং বৈদ্যদেবের কমৌলি শাসন ও রামচরিতের 'জনক-ভূ'
কথাটির ঐ একই অর্থ করে বোঝা হয়েছে যে, মহীপাল বরেন্দ্রদেশ অর্থাৎ
উত্তরবাংলা কম্বোজদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু 'পিত্র্য রাজ্য'
ও 'জনক-ভূ' বলতে পৈতৃক রাজ্যাংশ বুঝতে হবে। কারণ এসময় উত্তরবাংলা
পাল-অধিকারে ছিল, কম্বোজ-অধিকারে নয়। আবার পালবংশের আদিবাস ছিল
সম্ভবতঃ বঙ্গালদেশ, উত্তরবাংলা নয়। আমরা আগে বলেছি যে, এসময়
কম্বোজেরা দক্ষিণপশ্চিম বাংলার একাংশে রাজত্ব করছিল। মহীপাল তাদের
উৎখাত করেছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ এর পরেও কম্বোজদের রাজত্বের
কিছু প্রমাণ আছে। কম্বোজবংশীয় নয়পালের নাম পালবংশীয় মহীপাল-পুত্র নয়-

পালের নামের অনুকরণ বলে মনে হয়। সুতরাং এই কম্বোজরাজ মহীপালের পরবর্তী। আবার মহীপালের রাজত্বের ৩য় ও ৪র্থ বৎসরে প্রতিষ্ঠিত দুটি মূর্তি চন্দ্রদের রাজ্যমধ্যে বর্তমান কুমিল্লা জেলার বাঘাউড়া ও নারায়ণপুর গ্রামে পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং তিনি চন্দ্ররাজকে বশত্যা স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন বলে বোধহয়। সমসাময়িক চন্দ্ররাজ লড়হচন্দ্র (আ ১০৩০-১০২০ খ্রী) বারাণসী ও প্রয়াগে তীর্থ পর্যটন করেছিলেন। সম্ভবতঃ মহীপালের বশীভূত-মিত্র রূপে তাঁর রাজ্যের মধ্য দিয়েই তাঁকে পশ্চিমে যেতে হয়েছিল এবং মহী-পালের সঙ্গে কলচুরিবংশীয় গাংগেয়দেবের সংঘর্ষের সূত্রে পাল-সেনাদলের সঙ্গে চন্দ্ররাজের পক্ষে বারাণসী ও প্রয়াগ-গমন সম্ভব হয়েছিল মনে করা যায়।

১০১৯ খ্রীস্টাব্দে কলচুরি গাঙ্গেয়দেবের রাজত্বকালে তীর-ভুক্তি বা উত্তর-বিহারে রামায়ণের একখানি পুথি অনুলিখিত হয়। এই গাঙ্গেয়কে গরুড়ধ্বজ বলা হয়েছে। 'গরুড়ধ্বজ' কথাটিকে ভ্রমবশতঃ 'গৌড়ধ্বজ' মনে করে অনেকে নানা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন। কলচুরিদের অভিলেখে বলা হয়েছে যে, গাঙ্গেয় অঙ্গ-দেশের রাজাকে পরাজিত করেন। এখানে তীরভুক্তির অনুল্লেখ আশ্চর্যজনক। যাহোক, গাঙ্গেয় (আ ১০১৫-৪১ খ্রী) কর্তৃক বিহারের অনেকাংশ অধিকার মহী-পালের রাজত্বকালীন ঘটনা। কিন্তু মহীপালের ৪৮তম রাজ্যবর্ষে প্রতিষ্ঠিত দুটি মূর্তি মজফরপুর জেলার ইমাদপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হওয়ায় বোঝা যায়, তিনি কিছুকালের মধ্যেই উত্তরবিহার এবং সম্ভবতঃ বিহারের অন্যান্য কলচুরি-অধিকৃত অঞ্চল পুনরধিকার করেন। আবার ১০২৬ খ্রীস্টাব্দে সারনাথে প্রাপ্ত অভিলেখ থেকে বোঝা যায়, মহীপালের ভ্রাতা স্থিরপাল এবং বসন্তপাল তখন বারাণসীতে মন্দিরাদি নির্মাণ করছিলেন। সে সময় বারাণসীতে মহীপালের শত্রুপক্ষের অধিকার স্বীকৃত হলে সেটা সম্ভব হত বলে মনে হয় না। অধিকন্তু এই সূত্রে মহীপালের সেনাদলের পক্ষে প্রয়াগ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয়। কিন্তু আরব লেখক বৈহাকীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ১০৩৪ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ মহীপালের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই বারাণসীতে গাঙ্গেয়ের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ে সুলতান মহমুদের আক্রমণে প্রতিহার-সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় বলে বারাণসী-প্রয়াগ অঞ্চলে চন্দেল্ল, কলচুরি ও পাল-রাজগণকে অভিযান করতে দেখা যায়।

১০২৫ খ্রীস্টাব্দে তামিল নাড়ুর রাজা রাজেন্দ্রচোলের ১৩শ রাজ্যবর্ষে উৎকীর্ণ তিরুমালৈ অভিলেখে দেখা যায়, ঐ তারিখের অল্পকাল পূর্বে চোল-

সৈন্য বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে উপস্থিত হয়ে কতিপয় স্থানীয় নরপতিকে পরাজিত করেছিল। এই রাজগণ হলেন—(১) দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল, (২) দক্ষিণরাঢ়ের রণশূর, (৩) বঙ্গালদেশের গোবিন্দচন্দ্র এবং (৪) উত্তররাঢ় অঞ্চলে পরাজিত মহীপাল। এই রাজগণের মধ্যে কেউ বা মহীপালের বশীভূত-মিত্র এবং কেউ বা সামন্ত ছিলেন মনে করা যায়। মেদিনীপুর জেলার দাঁতন অঞ্চলের রাজা ধর্মপাল হয়তো কম্বোজবংশীয় ছিলেন। এমনও হতে পারে যে, চোলসেনার অভিযানের জন্য দক্ষিণপশ্চিম বাংলা বশীভূত করা মহীপালের পক্ষে সহজ হয়েছিল। চোলসৈন্য দাবি করেছে যে, সঙ্গু নামক জনৈক ব্যক্তির সংগে তারা মহীপালকে পরাজিত করেছিল। সংগু সম্ভবতঃ উত্তররাঢ়ের জনৈক সামন্ত রাজা ছিলেন।

ক্ষেমীশ্বর রচিত 'চণ্ডকৌশিক' নাটকের একটি শ্লোকে রাজা মহীপালকে চন্দ্রগুপ্তমৌর্যের এবং কর্ণাটাদিগকে নন্দদের অবতার বলা হয়েছে, অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত যেমন নন্দবংশ ধ্বংস করেছিলেন, মহীপালও তেমনই কর্ণাটকুল নিধন করেন। এই মহীপাল পালবংশীয় প্রথম মহীপাল বলে মনে হয় না। কারণ তাঁর সময়ে কর্ণাট বলতে উত্তরকালীন চালুক্যরাজবংশ বোঝায় এবং এই চালুক্যদের সংগে পালরাজাদের সংঘর্ষের কোনই প্রমাণ নেই। 'চণ্ডকৌশিক'-এর মহীপাল অবশ্যই প্রতিহাররাজ প্রথম মহীপাল (আ ৯১৫-২৫ খ্রী) এবং কর্ণাট এস্থলে তাঁর বংশের চিরশত্রু রাষ্ট্রকূট রাজবংশ।

লেখাবলীতে মহীপাল বৌদ্ধ নরপতিরূপে উল্লিখিত হয়েছেন। কিন্তু বাণগড়ের একখানি শৈব প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি শৈবাচার্য ইন্দ্রশিবের প্রতি ভক্তিমান্ ছিলেন এবং এক বিশাল মঠ বা মন্দির নির্মাণ করে তাঁকে দান করেছিলেন। সারনাথে প্রাপ্ত বাগীশ্বরী মূর্তিলেখ থেকেও তাঁর শৈবধর্মানুরক্তি প্রমাণিত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, রাজার ভ্রাতা স্থিরপাল ও বসন্তপাল বৌদ্ধ ছিলেন ; কিন্তু মহীপাল স্বয়ং ওখানে বামরাশি নামক গুরুবের জন্য ঈশানমূর্তি, বিচিত্রঘণ্টা প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতে (বিশেষতঃ কর্ণাটকে) গুরব শব্দের অর্থ 'শৈবাচার্য'। এর অর্থ 'গুরু' নয়। 'রাশি' নামান্ত থেকে বোঝা যায়, বামরাশি কঠোরপন্থী পাশুপত ছিলেন।

অমলক্ষুদ্দুঙ্গাতে ; নান্দিস্বামিনী পুণ্ডরিকা-মণ্ডলের অন্তর্গত এবং গণেশ্বরগ্রাম ও পুষ্করিণী পঞ্চনগরী-বিষয়ে। পঞ্চনগরী-বিষয়ের প্রধাননগর বোধহয় বগুড়া জেলার অন্তর্গত পাঁচবিবিতে অবস্থিত ছিল। নিষ্কর ভূমিদান লাভ করেছিলেন হস্তিদাসগোত্রীয় ব্রাহ্মণ জীবধরদেবশর্মা। বিলাসপুর জয়কন্ধাবার থেকে প্রচারিত বাণগড় শাসনানুসারে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির কোটিবর্ষ-বিষয়ান্তর্গত গোকলিকা-মণ্ডলস্থিত কুরটপল্লিকাগ্রামটি স্থায়িভাবে নিষ্কর দান করা হয়। কোটিবর্ষের প্রধান নগর ছিল বর্তমান বাণগড়। দান গ্রহণ করেছিলেন মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্ক-বিদ্যাবিদ্ পরাশরগোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্যশর্মা। তিনি চবটি-গ্রামবাসী ছিলেন ; কিন্তু তাঁর পরিবারের আদিবাস ছিল হস্তিপদগ্রামে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নয়পাল (আ ১০২৭-৪৩ খ্রী) এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল (আ ১০৪৭-৭০ খ্রী)

মহীপালের দীর্ঘরাজত্বের পর তাঁর পুত্র নয়পাল অন্ততঃ তাঁর রাজত্বের ১৫শ বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে কলচুরিদের সঙ্গে সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। কলচুরিবংশের লেখাবলীতে গাঙ্গেয়ের পুত্র কর্ণকে (১০৪১-৭২ খ্রী) বঙ্গ ও গৌড়রাজগণের বিজেতা বলা হয়েছে। তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে পশ্চিমদেশের তীর্থিক রাজা কর্ণ্য (অর্থাৎ হিন্দুরাজা কর্ণ) বৌদ্ধ মগধরাজ নয়পালের রাজ্য (লেখাবলী অনুসারে, পশ্চিমবাংলার বীরভূম অঞ্চল) আক্রমণ করে পরাজিত হন এবং বৌদ্ধাচার্য অতিশ-দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় পাল-রাজের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে দেশে ফিরতে সমর্থ হন। এই ঘটনা দীপঙ্করের তিব্বতযাত্রার (১০৪২ খ্রী) পূর্ববর্তী ঘটনা অর্থাৎ কর্ণের রাজ্যলাভের অব্যবহিত পরের ব্যাপার। কিন্তু কর্ণ যে বাংলার বীরভূম জেলায় প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ঐ জেলার পাইকোড় গ্রামে প্রাপ্ত একটি শিলা-স্তম্ভে কর্ণের লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। বোলপুরের নিকট সিয়ানগ্রামে প্রাপ্ত শিলালেখ থেকেও জানা যায় যে, ঐ অঞ্চলে চেদিনৃপতি কর্ণের সেনাদল বিধ্বস্ত হয়েছিল। এই অভিলেখটি থেকে মনে হয়, সম্ভবতঃ পালরাজের সামন্ত সুহ্ম বা রাঢ়দেশের অধিপতির বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগে কর্ণ বীরভূম অঞ্চলে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। বোধ হয়, এই আক্রমণের সূত্রেই কর্ণের জামাতা এবং সম্ভবতঃ সেনাপতি জাতবর্মা অঙ্গদেশে রাজত্বের দাবি করেছিলেন।

তিব্বতীয় কিংবদন্তীতে নয়পালকে বৌদ্ধ বলা হয়েছে; কিন্তু বাণগড়ের শৈব প্রশস্তিতে দেখতে পাই, তিনি শৈবাচার্য সর্বশিবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বশিব বানপ্রস্থ অবলম্বন করলে, তাঁর ভ্রাতা ও শিষ্য মূর্তিশিব নয়পালের গুরুস্থানীয় হন। সিয়ানের খণ্ডিত শিলালেখটি নয়পালের বলেই মনে হয়। এতে বাংলা ও বিহারের নানাস্থানে মন্দিরনির্মাণ, বিগ্রহস্থাপন, মন্দিরশিখরে স্বর্ণ-কলস প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির বর্ণনা আছে। বর্ণনায় শিবেরই প্রাধান্য; তবে

অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীও বাদ পড়েন নি। কিন্তু বৌদ্ধ মন্দির বা মূর্তির কোনও উল্লেখ নেই। নয়পাল হয়তো শেষ জীবনে শৈব হন।

নয়পালের পর তাঁর পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজত্ব করেন। 'রামচরিত' অনুসারে তিনি ডাহলরাজ কর্ণকে পরাজিত করে তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। কর্ণের সহিত বিগ্রহপালের এই যুদ্ধ তাঁর নিজ রাজত্বের ঘটনা হতে পারে। তিনি নয়পালের সেনাপতি রূপে কর্ণকে পরাজিত করেছিলেন, এও অসম্ভব নয়। যোগদেব নামক ব্রাহ্মণ তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। বিগ্রহপালের রাজত্বের শেষ দিকে কল্যাণের চালুক্যবংশীয় প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্লের (১০৪৪-৬৮ খ্রী) পুত্র বিক্রমাদিত্য গৌড় এবং কামরূপ-রাজকে পরাজিত করার দাবি করেছেন।

নয়পাল ও বিগ্রহপালের সময় গয়াতে এক অতি ক্ষুদ্র সামন্তবংশীয় তিনজন ব্রাহ্মণ রাজার কথা জানা যায়—(১) পরিতোষ-পুত্র শূদ্রক, (২) তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ বা বিশ্বাদিত্য এবং (৩) তাঁর পুত্র যক্ষপাল। কেউ কেউ মনে করেছেন যে, এঁদের প্রতাপে দক্ষিণবিহারে পালপ্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। এই ধারণা নিতান্তই ভিত্তিহীন। কারণ পীঠী অর্থাৎ বোধগয়ার সামন্তেরা এ সময়ে মগধের অধিপতি বলে দাবি করতেন। পীঠীপতি ভীমযশাঃ রামপালের এবং পীঠীপতি আচার্য দেবসেন মদনপালের সামন্ত ছিলেন। বাংলা ও বিহারে মহীপালের রাজ্য তাঁর পুত্র ও পৌত্রের রাজত্বকালে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল বলেই মনে হয়।

বিগ্রহপালের আমগাছি শাসনানুসারে প্রদত্ত ভূমি পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ-বিষয়ের ব্রাহ্মণীগ্রাম-মণ্ডলে অবস্থিত ছিল। দান পেয়েছিলেন ক্রোড়াঞ্চি-বিনির্গত শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ খোদুলদেবশর্মা। বিলাসপুর থেকে প্রদত্ত বেলোয়া শাসনের ভূমি ছিল ঐ ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ফাণিতবীথী-বিষয়ের অধীন পুণ্ডরিকা-মণ্ডলে। পৈপ্পলাদ-শাখাধ্যায়ী ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জয়ানন্দদেবশর্মা দান গ্রহণ করেছিলেন। কাঞ্চনপুর থেকে প্রদত্ত বনগাঁও শাসনের ভূমি ছিল তীর-ভুক্তির অন্তর্গত হোদ্রেয়-বিষয়ের অধীন বসুকাবর্তে। এই দান-গ্রহীতা ব্রাহ্মণ ঘাণ্টুকশর্মার কথা কৌলীন্যবিষয়ক আলোচনায় কিছু বলা হচ্ছে। দূত ছিলেন রাজার পুত্র ও মন্ত্রী প্রহাসিতরাজ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় মহীপাল (আ ১০৭০-৭১ খ্রী)
ও দ্বিতীয় শূরপাল (আ ১০৭১-৭২ খ্রী)
বরেন্দ্রে কৈবর্ত-অধিকার (আ ১০৭১-১১০০ খ্রী)

উত্তর ও দক্ষিণ-বিহারে এবং উত্তরবাংলায় তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের স্পষ্ট প্রমাণ তাঁর লেখমালায় দেখা যায়। তাঁর ১১শ এবং ১২শ রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত বেলোয়া এবং আমগাছি তাম্রশাসন উত্তরবাংলায় ভূমিদানের দলিল। কিন্তু সন্ধ্যাকর-নন্দীর 'রামচরিত'-এ দেখা যায়, বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর পালসাম্রাজ্যের দুর্দশা উপস্থিত হয়। তাঁর রচনায় রামপালের দিকে পক্ষপাত দেখা যায়; কিন্তু মনে হয় যেন বিগ্রহপালের তিন পুত্র অর্থাৎ দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল এবং রামপালের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ ঘটেছিল। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় মহীপাল একদিকে এবং তাঁর দুই ভ্রাতা তাঁর বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসন অধিকার এবং ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করতে সমর্থ হন। এই গৃহযুদ্ধের সুযোগে স্বভাবতঃ সামন্ত ও প্রদেশ-শাসকেরা আপনাদের স্বার্থসাধনের চেষ্টায় বিদ্রোহ করেছিলেন। এর মধ্যে দিব্য বা দিব্বোক নামক জনৈক কৈবর্তজাতীয় কর্মচারী সম্ভবতঃ বিগ্রহপালের আমলে উত্তরবাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন এবং বরেন্দ্রদেশে দিব্যের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পালরাজের আত্মীয় জাতবর্মা দিব্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর কারারুদ্ধ ভ্রাতৃদ্বয় মুক্তিলাভ করেন এবং দ্বিতীয় শূরপাল অল্পকাল রাজত্বের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্বিতীয় মহীপাল ও দ্বিতীয় শূরপালের কোনও অভিলেখ আবিষ্কৃত হয়নি। একজন ঐতিহাসিক মহীপাল নামক রাজার ৫ম রাজ্যবর্ষে অনুলিখিত একখানি পাণ্ডুলিপির চিত্রসমূহ পরীক্ষা করে স্থির করেছেন যে, ইনি দ্বিতীয় মহীপাল, প্রথম মহীপাল নন। কিন্তু ১০২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মহীপালের রাজত্ব এবং ১১৪৩ খ্রীস্টাব্দে মদনপালের সিংহাসনারোহণ ধরে নিয়ে দ্বিতীয় মহীপালের ৫ বৎসর দীর্ঘ রাজত্বের সম্ভাবনা খুবই কম।

বরেন্দ্রীর কৈবর্তবংশীয় নরপতি দিব্য দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই রুদোক এবং রুদোকের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ভীম রাজা হন। রাজোচিত গুণাবলীর জন্য শত্রুপক্ষীয় কবি সন্ধ্যাকরনন্দী কৈবর্তরাজ ভীমের প্রশংসা করেছেন। এই ভীমকে পরাজিত করে রামপাল বরেন্দ্রদেশ অধিকার করেছিলেন। তিনজন কৈবর্তবংশীয় রাজা ২৫।৩০ বৎসর বরেন্দ্র শাসন করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

রাজা ভীমের সঙ্গে রামপালের যুদ্ধের বিষয় রামপাল-প্রসঙ্গে পরে কিছু বলা হচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পালসাম্রাজ্যের অন্তিমযুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রামপাল (আ ১০৭২-১১২৭ খ্রী)

রামপাল প্রথম যৌবনে সিংহাসন লাভ করে অন্ততঃ ৫৩তম বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর লেখাবলী সবই বিহারে পাওয়া গিয়েছে। রাজত্বের প্রথম ২০।৩০ বৎসর কাটবার পর তিনি উত্তরবাংলা পুনরধিকার করেন।

কৈবর্তযুদ্ধে রামপাল যাঁদের সাহায্য সর্বাপেক্ষা অধিক পেয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন তাঁর রাষ্ট্রকূটবংশীয় মাতুল অঙ্গপতি মথন বা মহণ এবং মহণের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজ এবং পুত্রদ্বয় মহামাণ্ডলিক কাহ্নুর এবং সুবর্ণ। এ ছাড়া 'রামচরিত'-এ যাঁদের নাম আছে, তাঁরা হলেন—

১। পীঠীপতি (বোধগয়ার রাজা) কান্যকুব্জরাজ-বিজেতা মগধেশ্বর ভীমযশাঃ।

২। কোটাটবীর রাজা বীরগুণ।—'দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্তী'।

৩। উৎকলরাজ কর্ণকেশরীর বিজেতা দণ্ডভুক্তিপতি জয়সিংহ। দণ্ডভুক্তি নগরী ছিল মেদিনীপুরে। সোমবংশী কর্ণের (আ ১১০০-১০ খ্রী) রাজধানী ছিল গুহেশ্বরপাটক বা গুহদেবপাটক (কটক জেলার অন্তর্গত যাজপুর)। তিনি গঙ্গবংশীয় অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৪৭ খ্রী) কর্তৃক উৎখাত হন।

৪। দেবগ্রামের নিকটবর্তী বালবলভীর রাজা বিক্রমরাজ।

৫। আটবিক-সামন্তচক্র-চূড়ামণি অপরমন্দার-পতি লক্ষ্মীশূর। তাঁর রাজ্য ছিল বর্তমান হুগলী জেলার গড়-মন্দারণ অঞ্চলে।

৬। কুজবটীর রাজা শূরপাল। স্থানটি সাঁওতাল পরগনা জেলায় নয়াদুমকার ১৪ মাইল উত্তরে।

৭। তৈলকম্পরাজ রুদ্রশিখর। স্থানটি ধানবাদ-পুরুলিয়া অঞ্চলের তেলকুপী।

৮। উচ্ছালরাজ ভাস্কর বা ময়মল্লসিংহ।

৯। ঢেক্করীরাজ প্রতাপসিংহ। স্থানটি সম্ভবতঃ বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী ঢেকুরী।

১০। কয়ংগল-মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জুন। কয়ঙ্গলের শুদ্ধরূপ 'কজঙ্গল' অর্থাৎ রাজমহলের দক্ষিণে অবস্থিত কাঁকজোল।

১১। সঙ্কটগ্রামের রাজা চণ্ডার্জুন।

১২। নিদ্রাবলীর রাজা বিজয়রাজ। এঁকে কেউ কেউ সেনবংশীয় বিজয়-সেন মনে করেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের নিদ্রাবলী নামক একটি গাঞি আছে।

১৩। কৌশাম্বীরাজ দ্বোরপবর্ধন। এই কৌশাম্বী বগুড়াজেলার পরগনা কুসুম্বী হতে পারে।

১৪। পদুবন্বা-মণ্ডলের দাবিদার সোম। পদুবম্বা বর্তমান পাবনা হতে পারে।

এই সামন্তরাজগণের অধিকাংশই দক্ষিণবিহার এবং দক্ষিণপশ্চিম বাংলায় রাজত্ব করতেন। উত্তরবাংলা থেকে হয়ত কেউ কেউ পালিয়ে এসে রামপালের আশ্রয় নিয়েছিলেন। 'রামচরিত'-এ দেখা যায়, রাষ্ট্রকূট শিবরাজ প্রথমে গঙ্গা অতিক্রমপূর্বক বরেন্দ্রী আক্রমণ করে কিছু সাফল্য প্রাপ্ত হন। তখন বৃহৎ নৌকায় রামপালের সেনাদল নদীর উত্তরতীরে পোঁছে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। হস্তি-পৃষ্ঠে যুদ্ধরত ভীম বন্দী হলে কৈবর্ত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। অতঃপর ভীমের মিত্র হরি কৈবর্তসেনার নায়করূপে পালসৈন্যকে প্রবল বাধা দিতে থাকেন। রামপাল কৌশলে তাঁকে স্বপক্ষে এনেছিলেন। সম্ভবতঃ এই হরি হচ্ছেন বর্মা বংশের জাতবর্মার পুত্র হরিবর্মা এবং রামপাল তাঁকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজা বলে স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হয়েছিলেন। 'রামচরিত' অনুসারে বর্মা বংশের রাজা রামপালের বশ্যতা স্বীকার করেন। যা হোক, পরাজিত কৈবর্তরাজ ভীমকে তাঁর অনুচরগণ সহ হত্যা করা হয়।

রামপালের রাজধানী ছিল রামাবতীনগরী। রামাবতী গৌড়ের নিকটেই অবস্থিত ছিল। স্থানটি গঙ্গা ও করতোয়ার সংগমের নিকটবর্তী থাকা সম্ভব; তবে সে যুগে গৌড় থেকে এই সঙ্গম বেশী দূরে ছিল, মনে করা কঠিন। অবশ্য নদীগুলির গতিপথের যে বহু পরিবর্তন ঘটেছে তা সকলেরই জানা আছে। রামপালের সময়েই গৌড় সেনাপতি তিমগ্যদেব কামরূপ অধিকার করেছিলেন। 'রামচরিতে'-এ রামপালের সঙ্গে উৎকল ও কলিঙ্গের সংঘর্ষের

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৪৭ খ্রী) উৎকল অধিকার করে পূর্বদিকে ভাগীরথী পর্যন্ত অধিকার-বিস্তারে সমর্থ হন। তখন থেকে দক্ষিণপশ্চিম বাংলার নিম্নাংশে পালেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নি।

'শব্দপ্রদীপ' সংজ্ঞক আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের প্রণেতা করণজাতীয় সুরেশ্বর বা সুরপাল বলেছেন যে, তাঁর পিতা ভদ্রেশ্বর 'বঙ্গেশ্বর' রামপালের বৈদ্য এবং প্রপিতামহ দেবগণ গোবিন্দচন্দ্রের রাজবৈদ্য ছিলেন। কিন্তু বঙ্গে অর্থাৎ দক্ষিণপূর্ব বাংলায় রামপালের কতটা প্রভুত্ব ছিল, তা অনুমান করা কঠিন। 'শব্দপ্রদীপ'কার রাজা ভীমপালের সভায় বৈদ্য ছিলেন। এই রাজার সঙ্গে পালরাজগণের সম্পর্ক অজ্ঞাত। রামপালের রাজত্বের ৫৩তম বর্ষে অনুলিখিত একখানি পাণ্ডুলিপি তাঁর রাজত্বের দৈর্ঘ্য প্রমাণ করে। বোধিদেব নামক ব্রাহ্মণ তাঁর মন্ত্রী ছিলেন।

'কলিঙ্গত্তু পরণি' সংজ্ঞক তামিল কাব্যানুসারে প্রথম কুলোত্তুঙ্গচোল (১০৭০-১১২০ খ্রী) গঙ্গা থেকে কাবেরী পর্যন্ত দেশের আধিপত্য এবং বঙ্গ, বঙ্গাল, মগধ প্রভৃতি দেশবিজয়ের দাবি করেন। অবশ্য উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত এইরূপ দাবির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করা সম্ভব নয়। ১১২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্রের মানের তাম্রশাসনে দেখা যায়, পাটনা জেলার অনেকাংশ তাঁর অধিকারে ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুমারপাল (আ ১১২৬-২৮ খ্রী) এবং তৃতীয় গোপাল (আ ১১২৮-৪৩ খ্রী)

রামপালের চার পুত্রের নাম জানা যায়। তন্মধ্যে বিত্তপাল ও রাজ্যপালের ক্রিয়াকলাপ 'রামচরিত'-এ উল্লিখিত আছে। অন্য পুত্র কুমারপাল পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং চতুর্থ পুত্র মদনপাল কুমারপাল-পুত্র তৃতীয় গোপালের পর রাজা হন। 'রামচরিত' রামপালের কৃতিত্বের কাহিনী হলেও পরবর্তী তিনজন রাজারও এতে উল্লেখ আছে। কিন্তু কুমারপাল এবং তৃতীয় গোপালের বর্ণনা সন্ধ্যাকরনন্দী এক-এক শ্লোকে খুব সংক্ষেপে সেরেছেন এবং মদনপালের কথা কিছু বিস্তৃত করে ৩৬টি শ্লোকে লিখেছেন। এর কারণ এই হতে পারে যে, রামপালের সময় গ্রন্থখানি শেষ হলেও গ্রন্থকার মদনপালের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তখন রাজপ্রসাদ-লাভের লোভে পরবর্তী কালের ইতিহাসবিষয়ক শ্লোকগুলি যোগ করেছিলেন। হয়তো বা তিনি কুমারপাল ও তৃতীয় গোপাল সম্পর্কে বর্ণনার উপযুক্ত বিশেষ গৌরবের কিছু দেখতে পান নি।

বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব কুমারপালের সচিব ছিলেন। বৈদ্যদেব বঙ্গে যুদ্ধ করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ইতিপূর্বে পালসেনাপতি তিমগ্যদেব কামরূপ অধিকার করেন। সেখানে তাঁর বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে গৌড়েশ্বর কুমারপাল বৈদ্যদেবকে কামরূপে প্রেরণ করেছিলেন। প্রভুর আদেশে বৈদ্যদেব তিমগ্যদেবকে পরাজিত করে কামরূপদেশের অধিপতি হন। তাঁর কমৌলি শাসন থেকে জানা যায়, তিনি কিছুকাল পালরাজের শাসনকর্তা বা সামন্ত রূপে কামরূপ শাসন করছিলেন। 'শাসনকর্তা'ই বলা উচিত কারণ ঐ শাসনে প্রাগজ্যোতিষকে একটা 'ভুক্তি' অর্থাৎ পালসাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বলা হয়েছে।

কামরূপে বৈদ্যদেবের শাসনকাল ১১২৮-৩৬ খ্রী মধ্যে অনুমান করা যায়। কমৌলি শাসনে তাঁর শাসনদানকালীন পালবংশীয় প্রভুর নামোল্লেখ নেই। শাসনটি তাঁর নিজের ৪র্থ রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হয়েছিল বলে বোধ হয়। হয়তো কুমারপালের মৃত্যুর পর বৈদ্যদেব অর্ধস্বাধীনভাবে কামরূপ শাসন করছিলেন।

তৃতীয় গোপালের রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকমহলে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। প্রথমতঃ, মদনপালের মনহলি শাসনে আছে যে, গোপাল 'ধাত্রী-পালন-জৃম্ভমাণ-মহিমা' হয়ে শৈশবে ক্রীড়া-বিস্তার করেছিলেন। এ থেকে বোঝা হয়েছে যে, তিনি শৈশবে ধাত্রীদ্বারা পালিত হবার সময়ে রাজ্য লাভ করেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। অর্থাৎ তিনি অতি অল্পদিনমাত্র রাজত্ব করেছিলেন। এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ তাঁর ১৪।১৫ বৎসর রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। শ্লোকটিতে 'ধাত্রী' অর্থ পৃথিবী বুঝতে হবে। বলা হয়েছে যে, তৃতীয় গোপাল শৈশবেই পৃথিবী-পালন আরম্ভ করেন অর্থাৎ রাজা হন। দ্বিতীয়তঃ, অনেকে 'রামচরিত'-এর ৪।১২ শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, গোপাল শত্রুঘ্ন হয়েও (অর্থাৎ শত্রুর ধ্বংসসাধক হয়েও) অপায়-হেতু (দুর্বিপাকে পড়ে বা দুরদৃষ্টবশতঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং যে রাজা 'অস্ত-নয়' হয়ে (অর্থাৎ রাজনীতি পরিত্যাগ করে) 'কুম্ভীন'কে (অর্থাৎ গজপতিকে বা হস্তিসেনার অধিনায়ককে) হত্যা করেছিলেন, তাঁর পক্ষে এইরূপ মৃত্যু উপযুক্তই হয়েছিল। তৃতীয় গোপাল যে শত্রুসেনাকে পরাজিত করেও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান, সেকথা তাঁর রাজশাহী জেলার মান্দাগ্রামের নিকটবর্তী নিমদীঘিতে প্রাপ্ত শিলালেখ থেকে বোঝা যায়। রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করার মত বয়সে তৃতীয় গোপালের মৃত্যু হয়েছিল। সুতরাং শৈশব বা বাল্যকালে তাঁর মৃত্যু হয় নি। এই প্রসঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা উচিত যে, কোনও সুকবি একই ভাব বোঝাতে 'শৈশব' ও 'ধাত্রীপালনের কাল' এই দুটি কথা একত্রে ব্যবহার করবেন, এটা অনেকটা অভাবনীয়।

নিমদীঘি অভিলেখে বলা হয়েছে যে, রাজা গোপাল স্বেচ্ছায় যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর সামন্ত শুভদেব-পুত্র প্রভুভক্ত ঐড়দেবও যুদ্ধক্ষেত্রে স্বর্গলাভ করেন। সম্ভবতঃ গোপাল সেনানায়কদের পরামর্শের বিরুদ্ধে জীবন বিপন্ন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যুদ্ধস্থলে যেখানে মৃতদেহগুলি দাহ করা হয়, সেখানে ঐড়দেবের ভ্রাতা বা আত্মীয় ভাবকদাস একটি মন্দির (সম্ভবতঃ শিবমন্দির) নির্মাণ করান। অভিলেখটি থেকে বোঝা যায়, রাজার মৃত্যু হলেও শত্রুপক্ষ বোধ হয় পরাজিত হয়েছিল। কারণ শত্রুগণ ঐ অঞ্চল অধিকার করতে পারে নি; তা হলে আর রাজপক্ষীয় কারও পক্ষে সেখানে মন্দির নির্মাণ করে তাতে এই ধরণের প্রশস্তি সংযুক্ত করা সম্ভব হত না।

একজন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, রাজীবপুরের সদাশিব মূর্তিটি দ্বিতীয়

গোপালের রাজত্বকালীন এবং তৃতীয় গোপাল মাত্র ৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। এইমত ভ্রান্ত। কারণ মূর্তিটির নির্মাণরীতি ও লেখটির অক্ষর দ্বাদশ শতাব্দীর, দশম শতাব্দীর নয়। রাজীবপুর মূর্তির প্রতিষ্ঠার তারিখ গোপালের ১৪শ রাজ্যবর্ষ পড়তে হবে। ব্রিটিশ মুাজিয়মে রক্ষিত একখানি চিত্রযুক্ত পাণ্ডুলিপি গোপালের ১৫শ রাজ্য-সংবৎসরে অনুলিখিত। কারও মতে এর চিত্রগুলি ১০ম শতকের পরবর্তী ; সুতরাং এই গোপাল তৃতীয় গোপাল হবার সম্ভাবনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মদনপাল (আ ১১৪৩-৬১ খ্রী)

পরবর্তী রাজা মদনপালই পালবংশের একমাত্র নরপতি যাঁর রাজত্বের দৈর্ঘ্য আমরা নিঃসন্দেহে জানতে পারি। মুঙ্গের জেলার বালুগুদরে প্রাপ্ত একখানি অভিলেখের তারিখ শকাব্দের ১০৮৩ বর্ষ এবং মদনপালের ১৮শ রাজ্য-সংবৎসর। সুতরাং তিনি ১১৪৩-৪৪ খ্রী থেকে অন্ততঃ ১১৬১ খ্রী পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। আবার তিনি যে ১১৬১ খ্রীস্টাব্দের পর আর বেশীদিন রাজত্ব করেন নি, তা গোবিন্দপালের গয়ালেখের তারিখ থেকে বোঝা যায়। কারণ গোবিন্দপালের সিংহাসন লাভের পর ১১৭৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ১৪শ রাজ্য-সংবৎসর পড়েছিল। অর্থাৎ ১১৬১ বা ১১৬২ খ্রীস্টাব্দেই তাঁর রাজত্বের আরম্ভ।

মদনপালের সময় বাংলা পালবংশীয় গৌড়েশ্বরদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। আগে থেকেই সেনবংশীয় বিজয়সেন (আ ১০৯৬-১১৫৯ খ্রী) রাঢ়দেশে অর্থাৎ বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চলে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমে তিনি বর্মাদিগকে উৎখাত করে বিক্রমপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং সেখান থেকে তাম্র-শাসন প্রদান করেন। উত্তর-বাংলাতেও তাঁর অধিকার প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনা মদনপালের রাজত্বের ৮ম বৎসরের অর্থাৎ ১১৫০ খ্রীস্টাব্দের পরে ঘটেছিল। কারণ ঐ সময়ে মদনপাল রামাবতীনগরী থেকে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ-বিষয়ের হলাবর্ত-মণ্ডলে অর্থাৎ বর্তমান দিনাজপুর-অঞ্চলে ভূমিদান করেছিলেন।

কিন্তু বিজয়সেনই মদনপালের একমাত্র শত্রু ছিলেন না। ১১৪৬ খ্রীস্টাব্দে গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্র মুদগগিরি থেকে তাঁর লার তাম্রশাসন প্রদান করেন। এই সময় পাটনা জেলা এবং মুঙ্গেরের পশ্চিমাঞ্চলে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু মদনপালের ৩য় বর্ষের বিহারশরীফ লেখের পরবর্তী আরমা ও জয়নগর লেখ দুটি থেকে জানা যায় যে, পাটনা ও মুঙ্গের শত্রুকবল-মুক্ত হয়। তাছাড়া, গৌড়রাজের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেবের রাজঘাট শিলালেখে দেখা যায়, তিনি অবিমুক্তক্ষেত্র বা বারাণসীতে শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনিই মনহলি তাম্রশাসনের দূতক সান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব। তাঁর পিতামহ

ঐতিহাসিক এই রাজার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করেছেন। বলা হয়েছে যে, 'পলপাল' নামের ভাল অর্থ হয় না ; আর নামটি লিখতে দুরকমের 'ল' ব্যবহৃত হয়েছে এবং সে জন্য নাকি অভিলেখটির ঐতিহাসিকতা সন্দেহজনক। এই ধরণের যুক্তি নিতান্তই অসার। যিনি বলেন, 'পলপাল'-এর ভাল অর্থ হয় না, তিনি 'ডোম্মন-পাল'-এর একটা অর্থ বের করুন দেখি। বল্লালসেনের সনোখার মূর্তিলেখে তাঁর নাম দেখা যায় 'বললশেণ' অর্থাৎ নামের বানানে ভুল আছে, এবং এখানে দুটি 'ল' দুরকমে লেখা। তাতে কি স্থির করতে হবে যে, বল্লালসেন নামক কোনও রাজা ছিলেন না ?

রামপালের পর পালবংশে পলপালের মত এত দীর্ঘকাল আর কেউ রাজত্ব করেন নি। তিনি যে অঞ্চলে রাজত্ব করছিলেন, সেখানেই ভাগলপুরের নিকটে সনোখার গ্রামে বল্লালসেনের ৯ম রাজ্যবর্ষে (আ ১১৬৭ খ্রী) সেন-অধিকার প্রমাণিত হয়। সুতরাং পলপাল সেনরাজের বশীভূত-মিত্র ছিলেন বলে বোধ হয়।

লক্ষ্মীসরাই থেকে ১০ মাইল দূরবর্তী লৈ নামক গ্রামে জনৈক ক্ষুদ্ররাজার পট্টরাজ্ঞী বিক্রমদেবীর নির্মিত একটি মূর্তিতে লেখ পাওয়া গিয়েছে। মূর্তিটির 'দানপতি' (অর্থাৎ যিনি নির্মাণ করবেন বলে মানত করেছিলেন, তিনি) হলেন বিক্রমদেবীর স্বামী বাসাগারিক রাণক যশঃপাল। এই রাণক কোনও নরপতির বাসাগারের তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী ছিলেন। তাঁর নাম অভিলেখে নেই ; কিন্তু তাঁর ৩২শ রাজ্যবর্ষে মূর্তিলেখটি লিখিত হয়েছিল। যশঃপালের প্রভু পলপাল বলে আমাদের মনে হয়। লেখবিদ্যানুসারে অভিলেখটির কাল দ্বাদশ শতাব্দী এবং সে সময় পলপাল ব্যতীত আর কারও এত দীর্ঘ রাজত্ব নেই। তাছাড়া পলপালের রাজধানী হয়তো ছিল লৈ-এর অদূরবর্তী কাবায়া-জয়নগর যেখানে মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছে। 'বাসাগারিক' যশঃপালের কর্মস্থল অর্থাৎ তাঁর প্রভুর বাসস্থান লৈগ্রামের নিকটে ছিল বলেই বোধ হয়।

এই সময়ে বিহারের অধিকার নিয়ে গাহড়বালরাজ জয়চ্চন্দ্রের সংগে সেন-বংশীয় লক্ষ্মণসেনের বিবাদ চলছিল। গয়াতে গাহড়বাল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেনরাজের সেনাদল যুদ্ধ করতে করতে পশ্চিম দিকে বারাণসী ও প্রয়াগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু ১১৯৩ খ্রীস্টাব্দে গাহড়বালরাজ জয়চ্চন্দ্র তুর্কী মুসলমানদের হস্তে পরাজিত হন এবং অচিরে উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে (আ ১১৯৩ খ্রী) মুসলমান অধিকার প্রসারিত হয়। ১২০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যান্তর্গত রাঢ় এবং বরেন্দ্রে পর্যন্ত তুর্কী মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। এর পর পালবংশের অস্তিত্ব এবং ইতিহাস-বিষয়ে আর কিছু জানা যায় নি।

তৃতীয় ভাগ

অন্যান্য রাজবংশ

প্রাক্-সেন যুগের বংশাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমতটের দেববংশ এবং হরিকেলীয় রাজবংশ

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন এবং ভাস্করবর্মার হস্তে তাঁর উত্তরাধিকারী পরাজিত হলে গৌড়রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় সামন্তরাজগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী খড়্গবংশীয়েরা বঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে বোধ হয়। আর সমতটের রাতবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল কুমিল্লার নিকটবর্তী ময়নামতী পাহাড়ের দক্ষিণপ্রান্তস্থ চণ্ডীমুড়ায় অবস্থিত দেবপর্বত। নগরটি ক্ষীরোদা (আধুনিক খীরা বা খীরনই) নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে খড়্গরাজগণ রাতবংশ উচ্ছেদ করে সমতট অধিকার করেন এবং ঐ অঞ্চলে তাঁদের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় বলে মনে করা যায়। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমরা দেবপর্বতে নূতন এক রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই। এটাই সমতটের বা দেবপর্বতের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেববংশ। এই দেববংশীয় প্রথম রাজা খড়্গদের অধিকার বিলুপ্ত করেছিলেন বলে বোধ হয়।

দেববংশীয় রাজগণের কয়েকখানি তাম্রশাসন বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় আবিস্কৃত হয়েছে। শাসনগুলির মধ্যে একটির পাঠ প্রকাশিত হয়েছে এবং অন্য দু-একটির সম্পর্কে কিছু বিবরণ মাত্র জানা গিয়েছে। অন্যান্য বৌদ্ধ রাজবংশের মত এঁদের সীলমোহর ছিল ধর্মচক্র-মুদ্রা।

এই বংশের প্রথম ও দ্বিতীয় রাজা শান্তিদেব (আ. ৭২০-৩৫ খ্রী) এবং তৎপুত্র বীরদেব (আঁ ৭৩৫-৫০ খ্রী) সম্ভবতঃ পালবংশীয় প্রথম গোপাল কর্তৃক সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শান্তিদেবের নাম তাঁর পৌত্রের এবং বীরদেবের নাম তদীয় পুত্র ও পৌত্রের তাম্রশাসন থেকে জানা গিয়েছে। এঁরা দুজনেই পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ ছিলেন। বীরদেব শত্রুগণকে ধ্বংস করেন এবং ভূমীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ রাজ্যলাভ করেন।

ময়নামতীর শালবনবিহারে প্রাপ্ত বীরদেব-পুত্র আনন্দদেবের (আ ৭৫০-৭৫ খ্রী) তাম্রশাসনে তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ভবদেবের দ্বাদশ রাজ্য-সংবৎসরের একটি ক্রোড়পত্র আছে। শাসনের মুদ্রায় দেখা যায়, আনন্দদেবের উপাধি ছিল 'শ্রীবঙ্গালমৃগাঙ্ক'। বঙ্গালদেশ মূলতঃ বাখরগঞ্জ জেলার একাংশের নাম ছিল বলে বোধ হয়। আনন্দদেবের উপাধি থেকে মনে হতে পারে, তিনি ঐ অঞ্চল জয় করেছিলেন। এই আনন্দদেবকে পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম গোপালের সমসাময়িক বলা যায়। লামা তারনাথের বর্ণিত কাহিনী অনুসারে, বঙ্গাল দেশের অরাজকতা দূর করার জন্যই নাকি গোপাল সেখানকার রাজপদে বৃত হয়েছিলেন। সমতটেশ্বর আনন্দদেবের আক্রমণ এই অরাজকতা-সৃষ্টির কারণ হতে পারে। দুঃখের বিষয়, গোপাল ও তৎপুত্র ধর্মপালের সঙ্গে আনন্দদেব ও তৎপুত্র ভবদেবের সম্পর্কবিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু জানি নে। সুতরাং নূতন তথ্যের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে সিয়ান শিলালেখ থেকে মনে হয়, গোপাল সমতট জয় করেছিলেন।

পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ভবদেবের (আ ৭৭৫-৮০০ খ্রী) দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত একটি তাম্রশাসন কুমিল্লা জেলার কোনও স্থানে আবিষ্কৃত হয়। তিনিও পরমসৌগত ছিলেন। রাজধানী দেবপর্বত থেকে প্রদত্ত এই শাসনের সীলমোহরে এবং ভিতরের বর্ণনায় তাঁর 'শ্রীঅভিনব-মৃগাঙ্ক' উপাধি দেখা যায়। মহাসামন্তাধিপতি নন্দধর বিভূতিদাসের আবেদন অনুমোদন করায় রাজা বেন্ডমতী-বিহারিকার রত্নত্রয়ের উদ্দেশ্যে ৭½ পাটক ভূমি দান করেন। ভূমিখণ্ডসমূহ পেরনাটন-বিষয়ে অবস্থিত ছিল। 'রত্নত্রয়' বলতে বৌদ্ধমন্দির বোঝাত যেখানে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ পূজিত হতেন।

ভবদেবের পরবর্তী কালীন দেববংশের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। হরিকেলা-মণ্ডলের অধিপতি কান্তিদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসন সম্পাদনকালে রমেশচন্দ্র মজুমদার লক্ষ্য করেন যে, কান্তিদেবই তাঁর বংশের প্রথম নরপতি। তাই তিনি অনুমান করলেন যে, কান্তিদেব সম্ভবতঃ তাঁর মাতামহের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ভবদেবের কুমিল্লা জেলায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম, হয়তো কান্তিদেব ভবদেবের দৌহিত্র এবং উত্তরাধিকারী ছিলেন। History of Ancient Bengal গ্রন্থে মজুমদার মহাশয় স্বকীয় মত হিসাবে আমাদের ধারণারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। তবে তিনি একটা নূতন

কথাও বলেছেন। সেটা এই যে, কান্তিদেব ভবদেবের উত্তরাধিকারী হবার পরেই হয়তো পৈতৃক 'দত্ত' নামান্ত ত্যাগ করেছিলেন। কারণ তাঁর পিতার নাম ছিল ধনদত্ত এবং পিতামহের নাম ভদ্রদত্ত।

কান্তিদেব সম্ভবতঃ ৮০০-২৫ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পূর্ববর্তী সমতটের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। পাল, প্রতিহার ও কম্বোজদের সঙ্গে ঐ অঞ্চলের তৎকালীন সম্পর্ক অনুমান করা কঠিন। তবে দশম শতাব্দীর সূচনায় কম্বোজেরা সমতট-রাজধানী দেবপর্বত অধিকার করেছিল।

কয়েকটি অভিধানে শ্রীহট্ট-জনপদের নাম রূপে হরিকেলা, হরিকেলি বা হরিকেল্ল উল্লিখিত হয়েছে। কখনও ঐ দেশের অধিকার বঙ্গে প্রসারিত হয় বলে বোধহয় একটি অভিধানে বঙ্গের জনগণের হরিকেলীয় নাম দেখা যায়। ই-চিং বলেছেন, দেশটি ভারতের পূর্বসীমান্তবর্তী।

কল্যাণচন্দ্র, আ ৯৭৫-১০০০ খ্রী; (৬) লড়হচন্দ্র, আ ১০০০-২০ খ্রী; এবং (৭) গোবিন্দচন্দ্র, আ ১০২০-৫৫ খ্রী।

চন্দ্রবংশের স্থাপয়িতা পূর্ণচন্দ্র ক্ষুদ্র নরপতি ছিলেন। বংশটির আদিবাসস্থান রোহিতাগিরি বোধ হয় বর্তমান বিহারের অন্তর্গত রোহতাসগড়। পূর্ণ প্রথম থেকে পালরাজের সামন্ত ছিলেন কিংবা প্রতিহার মহেন্দ্রপাল কর্তৃক বিহারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তা বলা কঠিন। তাঁর পুত্র সুবর্ণচন্দ্র বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তিনিও ক্ষুদ্ররাজা ছিলেন। পরবর্তী চন্দ্ররাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মুদ্রা ধর্মচক্র-চিহ্নিত ছিল। সুবর্ণের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র রাজা হিসাবে প্রথম চন্দ্রদ্বীপে অর্থাৎ বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে অধিষ্ঠিত হন। তাঁকে ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাপরাক্রান্ত নরপতি দিলীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং তাঁর সৈন্যগণ কর্তৃক সমতটদেশ ও সে দেশের রাজধানী ক্ষীরোদা নদীর তীরবর্তী দেব-পর্বত বিজয়ের এবং বঙ্গ আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজত্বের শেষ দিকে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁকে হরিকেল-রাজশ্রীর আধার অর্থাৎ হরিকেল বা শ্রীহট্ট-রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ (মিত্র, লঘুমিত্র বা সামন্ত) বলা হয়েছে। 'হরিকেল' মূলতঃ শ্রীহট্টের নাম এবং শ্রীহট্টরাজ্যের বঙ্গে বিস্তৃতির ফলে, পরবর্তী কালে ওটি বঙ্গেরও নাম রূপে ব্যবহৃত হত। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের রাজত্বের প্রথমদিকে উত্তরবাংলায় ও দক্ষিণবিহারে প্রতিহার মহেন্দ্রপালের অধিকার ছিল। তাঁর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে হরিকেলরাজের পক্ষে পূর্বদক্ষিণ বাংলা থেকে পাল-প্রভুত্ব উচ্ছেদ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু ত্রৈলোক্যের পুত্র শ্রীচন্দ্রের রাজত্বের ৫ম বর্ষে প্রদত্ত শাসনে দেখা যায়, তিনি বাংলার বিক্রমপুর থেকে শ্রীহট্ট-মণ্ডলে ভূমি দান করেছিলেন। সুতরাং ইতিমধ্যে পূর্ববাংলায় হরিকেল বা শ্রীহট্টের প্রভুত্বের অবসান ঘটেছিল।

'আধারো হরিকেল-রাজ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াম্'-এর আসল অর্থ 'হরিকেলরাজের শ্বেতচ্ছত্রই যাঁর শুভ্রহাস্য সেই রাজলক্ষ্মীর আশ্রয়' অর্থাৎ হরিকেল-রাজের নির্ভর বা প্রধান সহায়। যেমন 'বেঙ্গী-চালুক্য-রাজ্য-মূল-স্তম্ভ' রূপে জনৈক চালুক্য-সামন্তের উল্লেখ আছে, সেইরূপ। হরিকেলরাজকে পরাজিত করায় হরিকেল-রাজলক্ষ্মী ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে আশ্রয় করেছিলেন, বোধহয় এরূপ অর্থও অসম্ভব নয়। 'শ্রী' শব্দে বহুবচন-প্রয়োগের কারণ গৌরব ব্যতীত অন্য কিছুও হতে পারে। রাজাদের রাজ্যলক্ষ্মী ব্যতীত আরও কতিপয় লক্ষ্মী থাকতেন যেমন ভূলক্ষ্মী, কীর্তিলক্ষ্মী, জয়লক্ষ্মী প্রভৃতি। তাঁরা সকলেই রাজার পত্নীরূপে

কম্পিতা হতেন। সুতরাং শ্রীচন্দ্রের রামপাল শাসনের কবি হয় তো এই কথাটি ভেবেই 'শ্রী' শব্দে বহুবচন প্রয়োগ করেছেন।

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সেনাদল কর্তৃক সমতট এবং লালম্বীবনের (লালমাইর) নিকট কম্বোজ-বিধ্বস্ত দেবপর্বত অধিকার ব্যতীত বলা হয়েছে যে, তারা কৃষ্ণশিখরিগ্রামে বঙ্গের বিখ্যাত দধি ভোজন করে তৃপ্ত হয়। সেখান থেকে তারা পশ্চিমে বিন্ধ্য-অঞ্চলে সুরঙ্গা-নদীতীরে এবং দক্ষিণে কাবেরীতীরবর্তী মলয়োপত্যকায় উপস্থিত হয়। শেষের দাবিদুটির মূল্য কি, তা বোঝা কঠিন। ত্রৈলোক্যর স্ত্রীর নাম কাঞ্চিকা বা কাঞ্চনা (নেপালী 'কানুছি'?)।

কল্যাণচন্দ্রের ঢাকা তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে গৌড়গণের বিজেতা বলা হয়েছে। এদিকে পশ্চিমভাগ শাসনে তাঁর সেনাদল কর্তৃক সমতট এবং বঙ্গের অঞ্চলবিশেষ আক্রমণের কথা আছে। তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্র ও পৌত্র কল্যাণচন্দ্র গৌড় ও কামরূপ-দেশবাসীদের জয় করেছেন বলে দাবি করেছিলেন। কখনও কামরূপবাসীদের লৌহিত্যতীরবাসী ম্লেচ্ছ অর্থাৎ শালস্তম্ভবংশীয় বলা হয়েছে। শ্রীচন্দ্রের সেনাদল উত্তরাপথ-জয়ের অভিলাষে উত্তরে চিত্রশিলা ও পুষ্পভদ্রা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কেউ কেউ চন্দ্রগণ কর্তৃক পরাজিত গৌড়রাজকে কম্বোজবংশীয় বলে স্থির করেছেন। তাঁরা ভাতুড়িয়া স্তম্ভলেখের রাজ্যপালকে ইর্দা ও কালান্দা শাসনের কম্বোজবংশীয় রাজ্যপালের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। আমরা এই ধারণা ভ্রান্ত মনে করি। কারণ প্রথমতঃ, দিনাজপুর স্তম্ভলেখের কম্বোজবংশীয় কুঞ্জরঘটাবর্ষই কেবল গৌড়-পতি ছিলেন; ইর্দা ও কালান্দা তাম্রশাসন উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় পাওয়া গিয়েছে। এগুলি প্রিয়ঙ্গু নামক স্থান থেকে প্রচারিত এবং প্রদত্ত ভূমি মেদিনীপুর-বালেশ্বর অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যপালের পুত্র দ্বিতীয় গোপালের প্রথমবর্ষে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তি কুমিল্লা জেলার মনধুক গ্রামে পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং শ্রীচন্দ্র তাঁকে সিংহাসনারোহণে সাহায্য করলেও চন্দ্ররাজ্যের মধ্যভাগে রাজত্বের প্রথমেই গোপালের অধিকার স্বীকৃত হতে দেখা যায়। আবার মালদহ জেলায় জাজিলপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন দ্বারা দ্বিতীয় গোপাল পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি অর্থাৎ উত্তরবাংলায় ভূমি দান করেছিলেন। এদিকে বিহারে নালন্দায় গোপালের প্রথম বৎসরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং রাজত্বের প্রথম দিকেই দ্বিতীয় গোপালের অধিকার বিহার এবং উত্তর ও পূর্ব বাংলায় স্বীকৃত দিল। এ সময় উত্তরবাংলায় কম্বোজ অধিকার থাকতে পারে না; এই সময়ে শ্রীচন্দ্র স্বাধীনতা রক্ষার

জন্য যুদ্ধ করছিলেন কিংবা পালসম্রাটের লঘুমিত্রত্ব স্বীকার করেছিলেন, তা বলা যায় না। শ্রীচন্দ্র দাবি করেছেন যে, তিনি লীলা-নির্জিত-রুদ্ধ-পাল-মহিষীকে প্রত্যর্পণ করেছিলেন। তিনি পরাজিত ও অবরুদ্ধ পালনৃপতিকে তাঁর মহিষী প্রত্যর্পণ করেছিলেন কিংবা যুদ্ধে পালমহিষীকে পরাজিত ও বন্দিনী করে তাঁকে তাঁর স্বামীর কাছে প্রত্যর্পণ করেছিলেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। হয়তো প্রথম অর্থটাই ঠিক। তিনি গোবর্ণনামক স্থান বা ব্যক্তিকে ধ্বংস করেন।

শ্রীচন্দ্র এবং তাঁর উত্তরাধিকারিগণ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের কোন লেখ আবিষ্কৃত হয় নি। তাই তিনি এইরূপ সম্রাটের উপাধি গ্রহণ করেছিলেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু ত্রৈলোক্য প্রথমে দক্ষিণবাংলায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। আবার রাজেন্দ্রচোলের অভিলেখে গোবিন্দচন্দ্রকে বঙ্গালদেশের রাজা বলা হয়েছে। মূলতঃ বঙ্গাল দক্ষিণবঙ্গের নাম ছিল। সম্ভবতঃ চন্দ্রেরা দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশ অধিকার করে বিক্রমপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করলে ক্রমশঃ সমগ্র পূর্বদক্ষিণ বাংলা বঙ্গাল নামে পরিচিত হয়। পশ্চিমভাগ শাসনে 'বঙ্গাল' এবং 'দেশান্তরীয়' (ভিন্নদেশীয়) মঠ আলাদা করা হয়েছে। শ্রীচন্দ্রের একখানি শাসনে বোধহয় সতট-পদ্মাবতী-বিষয়ে ভূমি-দানের কথা আছে। 'সতট-পদ্মাবতী' নামে 'পদ্মাবতী' বর্তমান পদ্মানদীর নাম। আবার 'সতট' 'সমতট'-এর অশুদ্ধরূপও হতে পারে। এই সময়ে দক্ষিণপূর্ব বাংলার ঢাকা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চল পৌণ্ড্র-ভুক্তি বা পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত বলে ধরা হত। এর কারণ এ সব স্থানের রাজগণ মূলতঃ পালেদের সামন্ত ছিলেন। পরবর্তী সেন আমলে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী খাড়ী অঞ্চলও পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হত।

সম্প্রতি কামরূপের ব্রহ্মপালবংশীয় রত্নপাল (আ ৯২০-৬০ খ্রী) এবং ইন্দ্রপাল (আ ৯৬০-৯০ খ্রী) দ্বারা যথাক্রমে গৌড়রাজ রাজ্যপাল (পালবংশীয় রাজ্যপাল) এবং শ্রীচন্দ্র-পুত্র কল্যাণচন্দ্রের পরাজিত হওয়ার দাবি পাওয়া গিয়েছে। কল্যাণচন্দ্রের সময়ের পূর্বেই ম্লেচ্ছ শালস্তম্ভের বংশের রাজত্ব শেষ হয়। সুতরাং তাঁর সংগে ইন্দ্রপালের সংঘর্ষকেই তিনি ম্লেচ্ছসংঘর্ষ বলেছেন বলে মনে হয়। এদিকে যেমন শ্রীচন্দ্রের রাজত্বকালে কখনও বা কুমিল্লা জেলায় পালবংশীয় দ্বিতীয় গোপালের অধিকার স্বীকৃত হত, তেমনই মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে প্রতিষ্ঠিত দুটি মূর্তিতে উৎকীর্ণ অভিলেখ থেকে জানা যায় যে, তাঁর অধিকারও ঐ অঞ্চলে স্বীকৃত হত। এটা দুই রাজবংশের মধ্যে যুদ্ধ-

বিগ্রহের দ্যোতক। চন্দ্ররাজগণ কখনও কখনও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে সমর্থ হতেন; কিন্তু অনেক সময় তাঁরা পালসম্রাটের লঘুমিত্রত্ব বা সামন্তত্ব-স্বীকারে বাধ্য হতেন, এই আমাদের সন্দেহ।

চন্দ্ররাজ লড়হচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্র গতানুগতিকভাবে সৌগত (বৌদ্ধ) রূপে বর্ণিত হতেন; কিন্তু তাঁরা খাঁটি বৌদ্ধ ছিলেন না। লড়হচন্দ্র বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি পট্টিকেরক নামক স্থানে লড়হমাধব নামে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর উদ্দেশ্যে ভূমি দান করেন। এই স্থানটি ময়নামতী পাহাড়ের নিকটবর্তী পাইটকারা পরগণায় অবস্থিত ছিল। তিনি হিন্দুতীর্থ বারাণসী এবং প্রয়াগে গিয়ে পিতৃপুরুষের তর্পণ করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র আবার ছিলেন শৈবধর্মের অনুরাগী। এই দুইজন রাজার বৌদ্ধধর্মে অনাস্থা বৌদ্ধ পালবংশীয় নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল ও নয়পালের শৈবধর্মের প্রতি অনুরাগের সহিত তুলনীয়। বাংলায় কিভাবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ধীরে ধীরে হিন্দু হয়ে যাচ্ছিল এ থেকে তা অনুমান করা যায়। লড়হের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে প্রতিষ্ঠিত একটি নটরাজ শিবের মূর্তি কুমিল্লার নিকট পাওয়া গিয়েছে।

গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বের ১২শ ও ২৩শ বৎসরে প্রতিষ্ঠিত দুটি দেবমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে—প্রথমটি ফরিদপুর ও দ্বিতীয়টি ঢাকা জেলায়। অন্যান্য চন্দ্রশাসনের ন্যায় তাঁর ময়নামতী শাসন বিক্রমপুর থেকে প্রদত্ত। আমরা দেখেছি, শ্রীচন্দ্র ও কল্যাণচন্দ্র পালবংশীয় গৌড়রাজকে পরাজিত করার দাবি করলেও তাঁদের রাজত্বকালে কখনও দ্বিতীয় গোপাল ও মহীপালের অধিকার কুমিল্লা জেলায় অর্থাৎ চন্দ্ররাজ্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে স্বীকৃত হত; আবার ঢাকা জেলার রাজধানী থেকে চন্দ্রেরা ফরিদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট জেলায় ভূমিদান করেছেন এবং কুমিল্লা-অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয় লড়হচন্দ্রের এবং ঢাকা ও ফরিদপুর-অঞ্চলে গোবিন্দচন্দ্রের মূর্তিলেখ পাওয়া গিয়েছে। তাই চন্দ্ররাজগণ কখনও কখনও পালরাজের বশ্যতা বা লঘুমিত্রতা স্বীকার করেছিলেন বলে আমরা অনুমান করেছি। কিন্তু লড়হচন্দ্র পালবংশীয় প্রথম মহীপালের লঘুমিত্র ছিলেন মনে করার আরও কারণ আছে। তিনি বারাণসী ও প্রয়াগে তীর্থযাত্রা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর সময়ে উত্তরবাংলা, দক্ষিণপশ্চিমবাংলার উত্তররাঢ় অঞ্চল এবং বিহারে মহীপালের অধিকার ছিল। সুতরাং দক্ষিণপূর্ব বাংলা থেকে লড়হচন্দ্রের পক্ষে মহীপালের রাজ্যের মধ্য দিয়েই বারাণসী ও প্রয়াগে যেতে হয়েছিল। মহীপালের

সংগে শত্রুতা থাকলে তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হত না। মহীপাল এবং কলচুরি গাংগেয়দেবের মধ্যে সংঘর্ষ চলার সময়ে কখনও (যেমন ১০১৯ খ্রীস্টাব্দে) গাংগেয় তীর-ভুক্তি অধিকার করেন, কখনও (যেমন ১০২৬ খ্রীস্টাব্দে) মহীপাল বারাণসী অধিকার করেন। সম্ভবতঃ এই সংঘর্ষ-সূত্রেই ১০১৯ খ্রীস্টাব্দের আগেই মহীপালের সহায়ক হিসেবে লড়হচন্দ্র বারাণসী ও প্রয়াগে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরবর্তী সেনবংশীয় রাজাও এরূপভাবে বারাণসী ও প্রয়াগে কীর্তিস্তম্ভ-স্থাপনের দাবি করেছিলেন।

পৌণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তিতে শ্রীচন্দ্র ভূমিদান করেছেন—শ্রীহট্ট-মণ্ডলের গরলা, পোগার ও চন্দ্রপুর-বিষয়ে (পশ্চিমভাগ), যোলা-মণ্ডলে (মদনপুর), নান্য-মণ্ডলে (রামপাল), খেদিরবিল্লী-বিষয়ে (ধুল্লা) ও কুমারতাল-মণ্ডলস্থ সতট-পদমাবাটী(বতী)-বিষয়ে (ইদিলপুর)। ভুক্তির নামটি গুপ্ত ও পাল-যুগের শাসনে পুণ্ড্রবর্ধন; কিন্তু মনহলি শাসনে পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি। চন্দ্র ও বর্মাদের শাসনে নামটি পৌণ্ড্র-ভুক্তি, কিন্তু পশ্চিমভাগ শাসনে পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি। সেনরাজ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমে বর্ধমান-ভুক্তি (দণ্ডভুক্তি-মণ্ডলসহ) এবং তার উত্তরপশ্চিমে কংকগ্রাম-ভুক্তি; বাকী উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা সমস্তই পৌণ্ড্র-বর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত—উত্তরে বরেন্দ্রী, পূর্বে বঙ্গের বিক্রমপুর ও নাব্য অঞ্চল এবং দক্ষিণে ২৪-পরগণা জেলার খাড়ী-বিষয় পর্যন্ত। দামোদরের মেহার শাসন এবং বীরধরের ময়নামতী শাসনে সমতট-মণ্ডল পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং একই জনপদকে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি ও পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি এবং পৌণ্ড্র-ভুক্তি ও পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি বলা হয়েছে। তাছাড়া সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত'-এর কবিপ্রশস্তির প্রথম শ্লোকে পুণ্ড্রবর্ধননগরকে 'পৌণ্ড্রবর্ধনপুর' বলা হয়েছে। 'পুণ্ড্র' ও 'পৌণ্ড্র' একই জাতির নামের ভিন্ন রূপ, যেমন কুরু = কৌরব, ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
গৌড় ও প্রিয়ঙ্গুর কম্বোজবংশ

নবম শতাব্দীর শেষদিকে ও দশম শতাব্দীর সূচনায় বিহার এবং উত্তর বাংলায় প্রতিহারবংশীয় মহেন্দ্রপালের অধিকার প্রসারিত হয়। আমরা অনুমান করেছি যে, তাঁর প্রপিতামহ নাগভট তিব্বতরাজের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে ধর্মপালকে আক্রমণ করেছিলেন। তিব্বতীয় বিবরণে রাজা Mu-tig Btsan-po কর্তৃক ধর্মপালকে পরাজিত করার এবং Ral-pa-chan কর্তৃক দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হবার দাবি আছে। এই সময়ে অনেক তিব্বতীয় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়েছিল বলে বোধ হয়। তারাই সম্ভবতঃ এদেশে কম্বোজ (পুরবর্তীকালের কোচ বা কোঁচ) নামে পরিচিত হয়। মহেন্দ্রপালের উত্তরবাংলা-জয়ে তারা সহায়ক হয়েছিল এবং ফলে তাদের স্থানীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল, বলে মনে করা যায়। যাহোক, আমরা মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই উত্তরবাংলায় কম্বোজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই।

বহুকাল পূর্বে দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে কম্বোজবংশীয় 'গৌড়-পতি' কুঞ্জরঘটাবর্ষের একটি স্তম্ভলেখ পাওয়া গিয়েছিল। তাতে তৎকর্তৃক একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। কম্বোজগণ তিব্বতীয় হলে এক শতাব্দী মধ্যে তারা অনেকটা ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল। ঐ স্তম্ভলেখের অক্ষর দশম শতাব্দীর বলে পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন। কুঞ্জরঘটাবর্ষ সম্ভবতঃ মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর অল্প-কাল পরেই উত্তরবাংলায় রাজত্ব করেন। কারণ ত্রৈলোক্যচন্দ্র (আ ৯০৫-২৫ খ্রী) কর্তৃক সমতট-রাজধানী দেবপর্বত-অধিকারের পূর্বেই কম্বোজেরা বর্তমান কুমিল্লা-অঞ্চলে অভিযান করেছিল বলে মনে হয়। পশ্চিম-ভাগ তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে, চন্দ্র-সেনাদল দেবপর্বতে পৌঁছে সেখানে কম্বোজদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের বিষয় শুনতে পায়। সুতরাং উত্তরবাংলায় কুঞ্জরঘটাবর্ষের রাজ্যকাল আনুমানিক ৯১৫-২৫ খ্রী অনুমান করা যেতে পারে। কারণ উত্তরবাংলার ঘাঁটি থেকেই কম্বোজেরা কুমিল্লার দিকে যায়।

মহেন্দ্রপালের সময় পালসাম্রাজ্যের কোনও অংশের উপর পালবংশীয় নারায়ণ-পালের (আ ৮৬১-৯১৭ খ্রী) কোনওরূপ অধিকার ছিল কিনা, তা বোঝা

কঠিন। কিন্তু নারায়ণের রাজত্বের ৫৪তম বর্ষের একটি মূর্তিলেখ থেকে জানা যায় যে, রাজত্বের শেষদিকে বিহারে তাঁর অধিকার স্বীকৃত হয় এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের সময়েও বিহারে পালপ্রভুত্বের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এদিকে রাজশাহীর নিকটবর্তী ভাতুড়িয়াতে প্রাপ্ত স্তম্ভলেখ থেকে উত্তরবাংলায় নারায়ণের পুত্র রাজ্যপালের অধিকার প্রমাণিত হয়। রাজ্যপালের পুত্র দ্বিতীয় গোপাল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে অর্থাৎ উত্তরবাংলায় ভূমিদান করেছিলেন এবং কুমিল্লা জেলায় তাঁর রাজত্বের প্রথম বর্ষে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিলেখ পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং উত্তরবাংলায় কম্বোজ অধিকার অল্পকালমাত্র স্থায়ী হয়েছিল।

উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার ইরদা এবং কালান্দা গ্রাম থেকে কম্বোজবংশের দুখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। তাতে দেখা যায়, বর্তমান মেদিনীপুর-বালেশ্বর অঞ্চলে একটি কম্বোজ রাজবংশ রাজত্ব করছিল। সম্ভবতঃ প্রিয়ঙ্গুনগরে এই কম্বোজরাজগণের রাজধানী ছিল। এদের সঙ্গে কুঞ্জরঘটাবর্ষের সম্পর্কের বিষয় কিছু জানা যায় না। প্রিয়ঙ্গুর কম্বোজবংশের দুখানি তাম্রশাসনই পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ নয়পাল কর্তৃক প্রদত্ত। এ দুটি দণ্ডভুক্তি-মণ্ডলে ভূমিদান-বিষয়ক। যাহোক, শাসনদ্বয়ে রাজার অগ্রজ নারায়ণপাল এবং পিতা রাজ্যপাল, এই দুজন রাজারও উল্লেখ আছে। এ তিনজন নরপতির রাজত্বকাল আনুমানিক অর্ধশতাব্দী অনুমান করা যেতে পারে। অর্থাৎ রাজ্যপাল আ ৯৮০-১০০৫ খ্রী, নারায়ণপাল আ ১০০৫-৩০ খ্রী এবং নয়পাল ১০৩০-৫৫ খ্রী। ১০২৫ খ্রীস্টাব্দের কিয়ৎকালপূর্বে যিনি চোলসৈন্য কর্তৃক পরাজিত হন সেই দণ্ডভুক্তিরাজ ধর্মপাল এই কম্বোজরাজবংশ-সম্ভূত বলে মনে হতে পারে। সে সময় উত্তররাঢ়ে পালবংশীয় মহীপালের অধিকার স্বীকৃত হত। দক্ষিণরাঢ়ের রাজা রণশূর এবং দণ্ডভুক্তিপতি ধর্মপাল মহীপালের সামন্ত ছিলেন কিনা, বলা কঠিন।

উপরের অনুমানের একটি অসুবিধা এই যে, প্রিয়ঙ্গুরাজ নয়পাল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত দণ্ডভুক্তি-মণ্ডলে ভূমিদান করেছিলেন, যদিও বর্ধমান-অঞ্চল তাঁর অধীন ছিল বলে মনে হয় না। তবে কি ধর্মপাল কিছুকালের জন্য মাত্র দণ্ডভুক্তি অধিকার করেছিলেন? যাই হোক, এই অঞ্চলে কম্বোজবংশের রাজত্বের সঙ্গে অবশ্যই তিব্বতরাজ Ral-pa-chan-এর গঙ্গাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হবার দাবির সম্পর্ক রয়েছে। এই কম্বোজেরা পালরাজাদের নাম অনুকরণ করতেন ও হয়তো তাঁদের বশীভূত-মিত্র ছিলেন। পূর্বে এ কথা আলোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সেনরাজবংশ পূর্বে কর্ণাটদেশের অর্থাৎ আধুনিক কন্নডভাষাভাষী কর্ণাটকরাজ্যের অধিবাসী ছিল। সেনরাজ বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালেখে বলা হয়েছে যে, দাক্ষিণাত্যের চন্দ্রবংশীয় রাজগণের অন্যতম বীরসেন ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। এই বীরসেনের বংশকে সেনবংশ এবং তদ্বংশীয় রাজগণকে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি থেকে বোঝা যায় যে, সেনবংশীয় রাজগণের শরীরে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের রক্ত সংমিশ্রিত ছিল। কিন্তু অন্যান্য ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় রাজবংশের ন্যায় সেনেরাও পরে আপনাদিগকে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় অথবা কর্ণাট-ক্ষত্রিয় (কর্ণাটদেশীয় ক্ষত্রিয়) বলে প্রচার করতেন। কেউ কেউ মনে করেছেন যে, সেনবংশ মূলতঃ ব্রাহ্মণ, কিন্তু পরে ক্ষত্রিয়ত্ব অবলম্বন করে বলে সেনরাজগণকে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। এ ধারণা ভ্রান্ত।

বীরসেনের বংশে বিজয়ের পিতামহ সামন্তসেনের জন্ম হয়। দেওপাড়া

করেন এবং বৃদ্ধবয়সে বানপ্রস্থ ও মুনিবৃত্তি অবলম্বন করে গঙ্গাতীরবাসী হন। বিজয়ের পুত্র বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে দেখা যায়, চন্দ্রবংশীয় রাজগণ অর্থাৎ সেনেরা রাঢ়াদেশ অলংকৃত করেছিলেন এবং তাঁদের বংশে সামন্তসেনের জন্ম হয়। এ থেকে যদি মনে করা হয়, সামন্তসেনের পূর্বপুরুষরাও রাঢ়াবাসী ছিলেন, তবে সে ধারণা অবশ্যই ভুল হবে। কেউ কেউ কর্ণাটদেশের একদল জৈন সাধুকে সেনবংশীয় বলা হয়েছে বলে বাংলার সেনরাজগণকে ঐ জৈন সাধু-দিগের বংশধর বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু সেনরাজগণ খাঁটি ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী; তাঁদের সঙ্গে জৈন সাধুদের কোনও সম্পর্ক ছিল বলে মনে করা যায় না।

পালবংশীয় অনেক রাজাই কর্ণাটদেশীয় রাজকন্যা বিবাহ করেছিলেন এবং পীঠীপতি দেবরক্ষিতের ন্যায় তাঁদের কর্ণাটদেশীয় সামন্তরাজের কথাও জানা যায়। আবার তাঁদের সেনাদলে কর্ণাট প্রভৃতি নানা দেশের সেনাদল থাকত। রাঢ়দেশে সেনবংশের প্রতিষ্ঠা এবং মিথিলায় কর্ণাটবংশীয় নান্যদেবের অভ্যুত্থান এইসূত্রে ঘটা সম্ভব। কিন্তু অনেকেই এই প্রসঙ্গে চালুক্যবংশীয় ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পূর্বদিক্ বিজয়ের উল্লেখ করেছেন। বিল্‌হণের 'বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত' অনুসারে বিক্রমাদিত্য তাঁর পিতার রাজত্বকালে আনুমানিক ১০৬৮ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশ ও আসাম আক্রমণ করেছিলেন। আবার তাঁর রাজত্বকালীন (১০৭৬-১১২৬ খ্রী) লেখাবলীতে তৎকর্তৃক অঙ্গ, বঙ্গ, গৌড়, মগধ, কলিঙ্গ এবং নেপাল জয়ের দাবি আছে। যদিও এই যুগের ছোট-বড় অনেক কর্ণাটরাজই এই ধরনের দাবি করেছেন বলে সেগুলিকে সবক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে মেনে নেওয়া কঠিন, তবু বাংলা ও বিহারে কর্ণাটজাতীয় রাজবংশ স্থাপনের কাহিনী থেকে বিক্রমাদিত্যের দাবিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। বিক্রমা-দিত্যের পুত্র তৃতীয় সোমেশ্বর (১১২৬-৩৮ খ্রী) অন্ধ্র, দ্রাবিড়, মগধ ও নেপাল এবং কলচুর্যবংশীয় বিজ্জল (আ ১১৫৬-৬৮ খ্রী) বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও নেপাল জয়ের দাবি করেছেন। বিজ্জলের পুত্র সোমেশ্বর পর্যন্ত নেপাল, কলিঙ্গ ও গৌড় পদানত করার কথা বলেছেন। সম্ভবতঃ এই কর্ণাটদেশীয় রাজগণ বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যার কর্ণাট রাজবংশগুলির উপর আধিপত্যের দাবি করতেন। কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্র-শাসনের তারিখ ৬২তম বর্ষ চালুক্য-বিক্রমসংবতের বৎসর অর্থাৎ ১১৩৮ খ্রী; সুতরাং বিজয়সেন ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের লঘুমিত্র ছিলেন। ধারণাটি অবশ্য

অনুমানমূলক। আমাদের মনে হয়, সামন্তসেন পালবংশীয় তৃতীয় বিগ্রহপালের (১০৪৩-৭০ খ্রী) সামন্তরূপে রাঢ়ের অঞ্চলবিশেষ শাসন আরম্ভ করেন এবং পুত্র হেমন্তসেনকে ঐ জনপদের ভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন।

হেমন্তসেনও পালসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করতেন বলে মনে হয়। তাঁর পুত্রের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে তাঁকে 'মহারাজাধিরাজ' বলা হয়েছে দেখে তাঁকে স্বাধীন নরপতি মনে করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ ডোম্মনপালের ন্যায় কোনও কোনও সামন্ত নরপতি এযুগে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ভোগ করতেন। এমনকি হেমন্তের পুত্র বিজয়সেনও প্রথমজীবনে পালবংশের সামন্ত ছিলেন মনে করে অনেকে তাঁকে রামপালের সামন্তচক্রের অন্যতম নিদ্রাবলীয় বিজয়রাজের সঙ্গে অভিন্ন ধরে থাকেন। অবশ্য এই সময় কিছুকালের জন্য পালসাম্রাজ্যের দুর্দিন চলছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-৭১ খ্রী) বিদ্রোহী প্রজাগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হন এবং উত্তরবাংলায় দিব্যের নায়কতায় কৈবর্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় শূরপালের (আ ১০৭১-৭২ খ্রী) রাজত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। শূরপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল (আ ১০৭২-১১২৬ খ্রী) সম্ভবতঃ তাঁর পিতার মৃত্যুর ২০।৩০ বৎসর পরে দিব্যের ভ্রাতা রুদোকের পুত্র ভীমের হাত থেকে উত্তরবাংলা পুনরধিকার করেন। কিন্তু কৈবর্তগণের সংগে যুদ্ধ করতে গিয়ে রামপাল দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সামন্তরাজগণের সাহায্য পেয়েছিলেন। সুতরাং তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরবর্তী দুর্দিনেও রাঢ়-অঞ্চলে পাল-প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল বলে মনে করা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালবংশের দীর্ঘ রাজত্বের পর ব্রহ্মবাদী সামন্তসেনের খাঁটি হিন্দু বংশধরগণ যে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। 'দানসাগর', 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' প্রভৃতি সেনযুগে রচিত গ্রন্থ এবং সেনরাজগণ কর্তৃক মহাদানাদির অনুষ্ঠান তার প্রমাণ।

সামন্তসেন ও হেমন্তসেনের কোনও অভিলেখ আবিষ্কৃত হয় নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয়সেন (আ ১০৯৬-১১৫৯ খ্রী)

হেমন্তসেনের পর তাঁর মহিষী যশোদেবীর গর্ভজাত পুত্র বিজয়সেন পিতার সিংহাসন লাভ করেন। বিজয়ের ব্যারাকপুর অনুশাসনের তারিখ ৬২ সংবৎসর। এটাকে সাধারণতঃ তাঁর রাজ্যবর্ষ বলে ধরা হয়। তাঁর পুত্র বল্লালের রাজ্যারম্ভ অর্থাৎ আনুমানিক ১১৫৯ খ্রীস্টাব্দের মোটামুটি ৬২ বৎসর পূর্বে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজ্যারোহণের তারিখ মিথিলায় কর্ণাটবংশীয় নান্যদেবের রাজ্যারম্ভ-তারিখ থেকে বোধহয় বেশী পূর্ববর্তী ছিল না। কেউ কেউ মনে করেন, বিজয় প্রথমে নিদ্রাবল নামক স্থানে বাস করতেন। এই নিদ্রাবলের অবস্থান ঠিক জানা যায় না। কিন্তু কবি ধোয়ীর 'পবনদূত'-কাব্যে গঙ্গার পশ্চিমতীরে ত্রিবেণীর নিকটে অবস্থিত বিজয়-পুরকে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বলা হয়েছে। এই বিজয়পুর বিজয়সেনের নামাঙ্কিত এবং তাঁর সময়ে সেন-রাজধানী ছিল বলে মনে হয়। অনেকের মতে, বিজয়পুর বর্তমান নবদ্বীপ, এবং মুসলমান ঐতিহাসিকেরা একেই নওদীয়া বা নোদীয়া (আধুনিক বানানে 'নদীয়া') বলেছেন। কুলপঞ্জী ও 'বল্লালচরিত'-এর উত্তরকালীন কিংবদন্তীতে বল্লালসেনের সময়েও নবদ্বীপ সেন-রাজধানী বলে স্বীকৃত হত। বোধহয় নবদ্বীপ একটা তীর্থের মর্যাদা লাভ করেছিল।

উত্তরবঙ্গের পাল অধিকার উচ্ছেদ করার পর পালবংশের রাজধানী গৌড়-নগর বিজয়ের অধিকারে এসেছিল, মনে হতে পারে। কিন্তু সেন-লেখমালায় দেখা যায়, বিজয় গৌড়রাজকে পরাজিত করেছিলেন এবং লক্ষ্মণসেনও যখন কুমার ছিলেন (অর্থাৎ তাঁর পিতামহের আমলে) সেই গৌড়পতিকে পরাজিত করেন। এই গৌড়রাজ পালসম্রাট, এবং বিজয় ও লক্ষ্মণের দাবি বাংলায় সেন-প্রভুর 'গৌড়েশ্বর'-বিরুদ ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত। অবশ্য উপাধিটির অর্থ 'গৌড়জনের অধীশ্বর', 'গৌড়নগরের অধীশ্বর' নয়। সেন-আমলে পাল রাজারা, যখন বিহারের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকলেও তাঁরা নিজেদের 'গৌড়েশ্বর' বলতেন। এদিকে বিজয় ও বল্লালের রাজত্বকালে এবং লক্ষ্মণের

রাজত্বের প্রথমদিকে সেনরাজগণ উপাধিটি গ্রহণ করেছিলেন কিনা সন্দেহ ; কারণ লক্ষ্মণসেনের আমলের শেষদিকের এবং পরবর্তী রাজগণের লেখাবলীতেই কেবল ওটির ব্যবহার দেখা যায়। অথচ ভাগলপুর জেলা বল্লালসেনের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তার প্রমাণ আছে ; সুতরাং সে সময়ে উত্তরবাংলায় পাল অধিকার ছিল বলে মনে করা যায় না। আবার গৌড়নগরে কিংবা তার গায়ে অবশ্যই লক্ষ্মণসেনের অন্যতম রাজধানী ছিল। কারণ মুসলমান ঐতিহাসিকেরা গৌড়কে লখনৌতী বা লক্ষ্মণাবতী নামে উল্লেখ করেছেন। নামটি সেনরাজ লক্ষ্মণসেনের সহিত সম্পর্কিত। কিন্তু সেনবংশের প্রধান রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। কারণ বিজয় ও বল্লালসেনের এবং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথমভাগের সমস্ত তাম্রশাসনই বিক্রমপুর থেকে প্রদত্ত।

বিজয়সেন প্রথমদিকে যখন রাঢ় অঞ্চলে রাজত্ব করতেন, তখন তাঁর রাজ্য পশ্চিমদিকে বিহারসীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কারণ বীরভূম জেলার রামপুরহাটের নিকটবর্তী পাইকোড় গ্রামে প্রাপ্ত একটি ভগ্ন শিলাস্তম্ভে তাঁর একটি অভিলেখের অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু শেষজীবনে তিনি উত্তর ও পূর্ব-বাংলায় অধিকার বিস্তার করেন। উত্তরবাংলায় রাজশাহী শহরের সাত মাইল দূরবর্তী দেওপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত তাঁর শিলালেখে দেখা যায়, ঐ স্থানে পরমমাহেশ্বর বিজয়সেন একটি বৃহৎ মন্দিরে প্রদ্যুম্নেশ্বর নামে হরিহরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পদ্মসর নামক দীঘির তীরে মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। যাহোক পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি বা উত্তরবাংলায় মদনপালের রাজত্বের অষ্টমবর্ষ অর্থাৎ ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাল-সম্রাটের অধিকার স্বীকৃত হত। আবার বিজয়ের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর (অধুনা পদ্মাগর্ভে বিলীন) থেকে প্রদত্ত হয়। পূর্বাবাংলায় তিনি বর্মা রাজবংশীয় কোনও নরপতির অধিকার উচ্ছেদ করেছিলেন।

দেওপাড়া শিলালেখের দ্বাবিংশ শ্লোকে পাশ্চাত্যচক্র অর্থাৎ পশ্চিমদেশের রাজগণকে জয় করার উদ্দেশ্যে গঙ্গানদীর প্রবাহ অনুসরণ করে বিজয়সেনের নৌবাহিনীর অগ্রগতির উল্লেখ আছে। এ থেকে বিহারে অবস্থিত পালরাজ ও তাঁর সামন্তগণের সঙ্গে যুদ্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ভাগলপুর জেলার কাহলগাঁও এর নিকটবর্তী আণ্টিচকে বিক্রমশীল-বিহারের ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত একটি শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ অভিলেখের উল্লেখ প্রয়োজন। লেখটি আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর জনৈক স্থানীয় বৌদ্ধ জননায়কের প্রশস্তি। তাঁর নাম সাহুর

(বা সাহুর) এবং তাঁর পিতার নাম ছিল হংসন। এঁরা ছিলেন চম্পা অর্থাৎ ভাগলপুরের কেসর নামক জনৈক প্রাচীন স্বাধীন রাজার বংশধর। প্রশস্তিটি সাহুরের পুত্র একজন বৌদ্ধ সাধুকে দিয়ে সম্ভবতঃ পিতার মৃত্যুর পর উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। এতে সাহুর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি পণ্ডিত ও কবি ছিলেন, বলে গৌড়েশ্বর তাঁকে বন্ধুভাবে সম্মানিত করেন এবং গৌড়রাজের সামন্ত বা সেনাপতি রূপে তিনি বঙ্গেশ্বরের নৌবাহিনী ধ্বংস করেছিলেন। এই গৌড়েশ্বর মদনপাল এবং বঙ্গপতি বিজয়সেন হতে পারেন। এ থেকে মনে হয়, বিজয়সেন বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হবার পরেও উত্তরবাংলার পশ্চিমাংশে অর্থাৎ গৌড় অঞ্চলে মদনপালের অধিকার স্বীকৃত হত।

পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিজয়সেনের উপাধি ছিল অরিরাজ-বৃষভশঙ্কর। তাঁর উত্তরাধিকারীরাও এই ধরনের উপাধি গ্রহণ করতেন। বিজয় পরমমাহেশ্বর অর্থাৎ শৈব ছিলেন। তিনি দক্ষিণপশ্চিম বাংলার শূর রাজবংশের কন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। এতে একদিকে যেমন দেখা যায়, দূর-দূর দেশের বিভিন্ন রাজপরিবারে বিবাহের প্রচলন, তেমনই দেখি, একটি দাক্ষিণাত্য-সম্ভূত বঙ্গবাসী পরিবারের বাঙালীসমাজে মিশ্রণ। বাংলার বৈদ্য ও কায়স্থ-সমাজ সেনবংশীয় রাজাদের আপন-আপন সমাজভুক্ত বলে দাবি করে। কিন্তু শূরবংশ বোধ হয় কায়স্থ ছিল।

দেওপাড়া প্রশস্তিতে কবির ভাষায় বলা হয়েছে যে, বিজয়সেন নান্য, বীর, রাঘব এবং বর্ধন নামক রাজার এবং গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গের অধীশ্বরদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন। এর মধ্যে এক স্থানে যাঁকে রাঘব বলা হয়েছে, অন্যত্র তাঁকেই কলিঙ্গরাজ বলা হয়েছে বলে মনে করা যায়। এই রাঘব (১১৫৬-৭০ খ্রী) উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজা। আনন্দভট্টের 'বল্লালচরিত'-এ উল্লিখিত একটি কিংবদন্তী অনুসারে বিজয়সেন নাকি রাঘবের পিতা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের (১০৭৮-১১৪৭ খ্রী) সখা ছিলেন[৭] নান্য ছিলেন মিথিলার কর্ণাট-রাজবংশের স্থাপয়িতা। তাঁর রচিত ভরতের 'নাট্যসূত্র'-টীকার পুষ্পিকায় বলা হয়েছে যে, তিনি বঙ্গ ও গৌড়ের শক্তিনাশ করেছিলেন। এ থেকে পাল-সেন রাজগণের সঙ্গে নান্যের সংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বীর এবং বর্ধনকে কেউ কেউ রামপালের সামন্তচক্রের মধ্যে পরিগণিত কোটাটবীর বীরগুণ এবং কৌশাম্বীর দ্বোরপবর্ধনের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন।[৮] গৌড়রাজ অবশ্যই মদনপাল। আসাম বা কামরূপ-রাজ কে, তা নিশ্চিত বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। মদনপালের রাজত্বের প্রথম দিকে ১২০১ বিক্রমাব্দে (১১৪৩-৪৪ খ্রী) এবং তাঁর তৃতীয় রাজ্যবর্ষে (১১৪৫-৪৬ খ্রী) পাটনা জেলার বিহারশরীফে এবং মুঙ্গের জেলার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত নোণুগড়ে তাঁর অধিকার স্বীকৃত হবার প্রমাণ আছে। কিন্তু ১১৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই এপরিল গোবিন্দচন্দ্র মুদ্গগিরি থেকে তাঁর লার তাম্রশাসন দান করেন। অর্থাৎ সে সময় পাটনা ও পশ্চিমমুঙ্গেরে গাহড়বাল-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদিকে মদনপালের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ভবদেব গাহড়বাল রাজের হাত থেকে বারাণসী অধিকার করেছিলেন। এই ঘটনা গোবিন্দ-চন্দ্রকর্তৃক মুঙ্গের অধিকারের আগের কি পরের ঘটনা, তা বলা কঠিন। পূর্ববর্তী ঘটনা হলে মনে করা যায় যে, মদনপাল সাম্রাজ্যের পশ্চিমদিকের শত্রুকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকার জন্যেই বিজয়সেন শক্তিসঞ্চয় ও স্বাধীনতালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। মদনপালের কৃতিত্ব গোবিন্দচন্দ্র কর্তৃক মুঙ্গের অধিকারের পরবর্তী হলে, কোনও প্রবল সহায়ক না পেলে পালরাজের পক্ষে পাটনা ও মুংগের পুনরধিকার এবং বারানসীবিজয় সম্ভব হত বলে মনে হয় না। তাঁর পক্ষে সেনরাজের সংগে সন্ধি করে বিজয়সেনের সাহায্যে তা সম্ভব হতে পারে। এ সম্ভাবনার কথা আমরা উপরে বলেছি। মদনের ১৪শ বর্ষীয় আরমা ও জয়নগর লেখ এবং সেন-গাহড়বাল দ্বন্দ্ব থেকে এটাই আমাদের সম্ভব মনে হয়।

বিজয়সেন শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর দেওপাড়া প্রশস্তির রচয়িতা ছিলেন বিখ্যাত কবি উমাপতিধর এবং খ্যাতনামা শিল্পী শূলপাণি অভিলেখটি উৎকীর্ণ করেন। এই শূলপাণিকে বরেন্দ্রদেশের শিল্প-গোষ্ঠীর চূড়ামণি বলা হয়েছে। তাঁকে রাণক উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কারও কারও মতে শ্রীহর্ষ নামক কবির 'বিজয়প্রশস্তি' ও 'গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি' সংজ্ঞক এখন-পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত দুখানি কাব্যগ্রন্থ সেনরাজ বিজয়সেনের এবং তাঁর বংশের কীর্তি-কাহিনী নিয়ে রচিত। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থটি সম্পর্কে এই ধারণা সত্য বলে মনে হয় না। কারণ বিজয়সেনের সময়ে সেনবংশকে 'গৌড়োর্বীশকুল' (অর্থাৎ গৌড়দেশের অধিপতি-বংশ) বলার কারণ ছিল না। সেনবংশে লক্ষ্মণসেনই বোধ হয় প্রথম গৌড়েশ্বর।

পরমেশ্বর পরমমাহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিজয়সেনের তাম্র-শাসন বিক্রমপুর থেকে তাঁর ৬২তম রাজ্যবর্ষে দেওয়া হয়। প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ

ছিল সমতটদেশীয় নলের মাপে ৪ পাটক এবং সেই ভূমিখণ্ড পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত খাড়ী-বিষয়ের ঘাসসম্ভোগ-ভুক্ত ভাট্টবডাগ্রামে অবস্থিত ছিল। খাড়ী-বিষয় বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণা জেলায় অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়। রাজ্ঞী বিলাসদেবী কর্তৃক চন্দ্রগ্রহণকালে কনক-তুলাপুরুষ-দান উপলক্ষ্যে মধ্যদেশ-বিনির্গত কান্তিজোঙ্গবাসী উদয়কর নামক বৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে হোমকর্মের দক্ষিণাস্বরূপ ঐ ভূমি নিষ্কর দেওয়া হয়েছিল। ভূমিখণ্ডের বার্ষিক আয় ছিল ২০০ কপর্দক-পুরাণ (কড়িতে গণিত রৌপ্যমুদ্রা)। এ সময় পূর্ব ও দক্ষিণ-বাংলা পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত অর্থাৎ বোধ হয় গৌড়-সাম্রাজ্যের অংশ রূপে উল্লিখিত হত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বল্লালসেন (আ ১১৫৯-৭৯ খ্রী)

বিজয়সেনের মৃত্যুর পর তাঁর শূরবংশীয়া মহিষী বিলাসদেবীর গর্ভজাত পুত্র বল্লাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। 'বল্লাল' আসলে কর্ণাটদেশীয় নাম। 'অদ্ভুতসাগর'-এর কোনও পুঁথিতে 'ভুজবসুদশ-১০৮১' শকাব্দে বল্লালের 'রাজ্যাদি' বলা হয়েছে। কিন্তু 'ভুজ-বসু-দশ' প্রকৃতপক্ষে '১০৮২'। সুতরাং বল্লালের রাজ্যারম্ভ ভুল করে ১১৫৯-৬০ এবং ১১৬০-৬১ খ্রী বলা হল। চালুক্য রাজকুমারী রামদেবী বল্লালের মহিষী ছিলেন। এই রাজা সুপণ্ডিত ছিলেন এবং 'দানসাগর' নামক গ্রন্থ এবং 'অদ্ভুতসাগর' সংজ্ঞক গ্রন্থের সমস্তটা অথবা অন্ততঃ অধিকাংশ রচনা করেছিলেন। ১০৯০ (বা ১০৮৯) শকাব্দে আরব্ধ 'অদ্ভুতসাগর'-এ বল্লালকে গৌড়রাজের দমনকারী বলা হয়েছে। তিনি 'অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর' উপাধি ধারণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ ১০৯১ শকাব্দে (১১৬৯-৭০ খ্রী) 'দানসাগর' রচিত হয়।

'বল্লালচরিত'-এর কিংবদন্তী অনুসারে বল্লালসেনের রাজ্য বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগড়ী ও মিথিলা—এই পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই জনশ্রুতির কোনও ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা সন্দেহ। কারণ বিহারের ভাগলপুর জেলায় অর্থাৎ প্রাচীন অঙ্গ জনপদে বল্লালের রাজত্বের প্রমাণ আছে। কিন্তু তালিকাটিতে অঙ্গের উল্লেখ নেই। আবার মিথিলাতে এই সময় কর্ণাটবংশীয়েরা রাজত্ব করছিলেন। সেখানে বল্লালের অধিকার প্রসারিত হবার সম্ভাবনা কম। বর্তমান পদ্মা ও ভাগীরথীর সঙ্গম-অঞ্চলে পদ্মার দক্ষিণে ও ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত ক্ষুদ্র জনপদের নাম বাঘড়ী। কিন্তু সেন-আমলে জনপদটি অনেকটা বিস্তৃত হয়েছিল কিনা, তা বলা কঠিন।

বাংলাদেশের কুলজী বা কুলপঞ্জী অনুসারে বল্লালসেন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। পালযুগে কৌলীন্যের উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারণ অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। তার উপর বল্লালের অবশ্যই কোনও হাত ছিল না। কিন্তু তাঁর পক্ষে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা এবং দান প্রভৃতি গুণের ভিত্তিতে

কতকগুলি ব্যক্তি বা পরিবারকে 'কুলীন' বলে মর্যাদা দেওয়া অসম্ভব মনে করা যায় না। কারণ সেকালে রাজাকে সমাজের কর্তা বলে স্বীকার করা হত। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, বল্লাল ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের লেখবিলীতে সমাজে সুনিয়ন্ত্রিত কৌলীন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই ইংগিত পাওয়া যায় না। তাই প্রচলিত কোনও সামাজিক ব্যবস্থা কুলপঞ্জীতে সেনবংশীয় রাজা বল্লালের উপর আরোপিত হওয়া অসম্ভব নয়। এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচিত বৈদ্যকুল-পঞ্জীর সাক্ষ্য বিশেষ মূল্যবান্। এমনভাবেই একটি সংবৎকে 'বলালী (বল্লালী) সন' বলা হয়েছে যদিও বল্লাল কোনও সাল প্রচার করেন নি। এ সম্পর্কে ৫ম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বল্লালসেন আপনাকে পরমেশ্বর পরমমাহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজা-ধিরাজ বলেছেন এবং বিক্রমপুর থেকে শাসন দান করেছেন। রাজমাতা বিলাসদেবীর সূর্যগ্রহণ-উপলক্ষে গঙ্গাস্নানকালে হেমাশ্ব-মহাদানের দক্ষিণা স্বরূপ বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত উত্তররাঢ়া-মণ্ডলের স্বল্পদক্ষিণ-বীথীর অধীন বাল্লহিট্‌ঠাগ্রাম ভারদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ওবাসুদেব শর্মাকে নিষ্কর দান করা হয়। বৃষভশঙ্কর-নলের মাপে গ্রামটির ভূমি-পরিমাণ ছিল ৭ পাটক ৯ দ্রোণ ১ আঢ়ক ৪০ উন্মান ৩ কাক, এবং গ্রামটির রাজস্ব ছিল বার্ষিক ৫০০ কপর্দক-পুরাণ (কড়িতে গণিত রৌপ্যমুদ্রা)। 'ওবাসুদেব' নামটি 'হরেকৃষ্ণ'-এর মত ইস্টদেবতার সম্বোধন-মূলক নাম। 'বৃষভশঙ্কর' ছিল বিজয়সেনের উপাধি। তিনি একটি বিশেষ-দৈর্ঘ্যের নল চালু করেছিলেন মনে হয়।

সেনবংশের পতনের বহুকাল পরে (অথবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে) রচিত 'বল্লালচরিত'-এ বল্লালসেন নামক রাজার সম্পর্কে কতকগুলি কিংবদন্তী স্থান পেয়েছে। কিন্তু সেগুলি সেনরাজ বল্লালের ইতিহাসে স্থান পেতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দুটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করছি।

মহাস্থানে অবস্থিত শৈবমঠের মহন্ত ধর্মগিরি সেনরাজ-পুরোহিতকে অপমান করায় বল্লাল শিষ্যগণসহ মহন্তকে রাজ্য থেকে বহিস্কৃত করেন। প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করার জন্য ধর্মগিরি ম্লেচ্ছাধিপতি বায়াদুম্ব-এর শরণ নিলেন। তাঁর পরামর্শে বায়াদুম্ব বিক্রমপুর আক্রমণ করেন। ম্লেচ্ছরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার সময়ে বল্লাল দুটি কবুতর সঙ্গে নিলেন। তিনি মহিষীগণকে ও পরিজনদের বললেন যে, যুদ্ধে তাঁর পরাজয় হলে মৃত্যুবরণের পূর্বে তিনি পাখীদুটিকে ছেড়ে দেবেন। সে-দুটিকে দেখলেই যেন মহিষীরা আত্মসম্মান-রক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে

প্রাণবিসর্জন দেন। যুদ্ধে বল্লাল ম্লেচ্ছসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু কোনওক্রমে পায়রাদুটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে উড়ে চলে গেল। তাদের দেখে রাজমহিষীগণ ও পরিজনেরা রাজার পরাজয় অনুমান করে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন। বল্লাল যথাসম্ভব শীঘ্র রাজধানী রামপালে প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন, সব শেষ। তখন শোকে-দুঃখে তিনিও অগ্নিতে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করলেন। এ কাহিনীতে বোধ হয় বল্লালের রাজধানীকে বিক্রমপুর এবং রামপাল বলা হয়েছে। যাহোক, বল্লালের সময় ম্লেচ্ছ বা মুসলমান আক্রমণ নিতান্তই কাল্পনিক।

রাজা বল্লালসেন উদন্তপুরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সঙ্কোটবাসী বল্লভানন্দ নামক ধনী সুবর্ণবণিকের নিকট থেকে এককোটি নিস্ক (স্বর্ণ-মুদ্রা) ধার করেন। কিন্তু মণিপুর (বা ফণিপুর) নামক স্থানের যুদ্ধে বারবার পরাজিত হয়ে তিনি বিরাট এক সেনাদল গঠনের অভিপ্রায়ে বল্লভানন্দের নিকট আরও ঋণগ্রহণের প্রস্তাব করেন। তিনি বণিককে জানালেন যে, কীকট(মগধ)-দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর ষড়ঙ্গ-বাহিনী সজ্জিত করা প্রয়োজন ; সুতরাং বল্লভানন্দ যেন তাঁকে অবিলম্বে দেড়কোটি সুবর্ণ পাঠান। উত্তরে বণিক জানালেন যে, তিনি হরিকেলী-প্রদেশের রাজস্বের বিনিময়ে দেড়কোটি সুবর্ণ ঋণ দিতে প্রস্তুত। রাজা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বণিক সম্প্রদায়ের ধনরত্ন জোরকরে গ্রহণ করলেন এবং বণিকদের নানা রকমের দুর্দশা ঘটালেন। এর পর রাজবাড়ির এক নিমন্ত্রণে সৎ-শূদ্র এবং বৈশ্যদের অর্থাৎ বণিকদের পৃথক পৃথক স্থানে খাদ্য-পরিবেশনের ব্যবস্থা না করায় বণিকেরা ভোজনে অসম্মত হল। এ ছাড়াও রাজা শুনলেন যে, বণিকসমাজের নেতা বল্লভ পালবংশীয়দের সংগে যোগ দিয়েছেন এবং মগধরাজ তাঁর জামাতা বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছেন। শুনে বল্লাল রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং সুবর্ণবণিকদের শূদ্র ঘোষণা করে প্রচার করলেন যে, অতঃপর ব্রাহ্মণেরা তাদের পৌরোহিত্য, শিক্ষাদান ও দানগ্রহণ করলে সমাজে পতিত হবে। এর প্রতিশোধে বণিকেরা তিন-চারগুণ দাম বাড়িয়ে দাসগুণকে কিনে নিলেন ; ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষে ভৃত্যসংগ্রহ দুর্ঘট হয়ে উঠল। তখন বল্লাল কৈবর্ত (মৎস্যজীবী) সম্প্রদায়কে গৃহভৃত্যের কার্য করার উপযোগী ঘোষণা করলেন। তিনি কৈবর্তসমাজের নেতা মহেশকে মহামাণ্ডলিকের উপাধি ও সম্মান দিলেন। সেইরূপ মালাকার, কুম্ভকার এবং কর্মকারকে সৎ-শূদ্র পর্যায়ে উন্নীত করা হল। রাজা ঘোষণা করলেন যে, সুবর্ণবণিকদের উপবীত

ধারণে অধিকার থাকবে না। ফলে বণিকেরা বল্লালের অধিকার ছেড়ে অন্যান্য দেশে চলে যেতে লাগল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-সমাজে সদাচারের অবনতি দেখে রাজা ঐ সম্প্রদায়দুটির ব্যক্তিগণকে সংস্কারকার্য দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে বাধ্য করলেন। বণিকের বৃত্তি-জীবী ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণত্ব থেকে বঞ্চিত হল।

অনেক ক্ষেত্রে এই সকল কিংবদন্তীর বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে বোধ হয় না। দ্বিতীয় কাহিনীটির মূলে রয়েছে সামাজিক মর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ।

'অদ্ভুতসাগর'-এ বলা হয়েছে যে, ১০৯০ (কিংবা ১০৮৯) শকাব্দে অর্থাৎ ১১৬৮-৬৯ (বা ১১৬৭-৬৮) খ্রীস্টাব্দে বল্লাল কর্তৃক গ্রন্থখানির রচনা আরম্ভ হয়; কিন্তু গ্রন্থের রচনাসমাপ্তির পূর্বেই রাজ্যের এবং গ্রন্থসমাপনের ভার পুত্র লক্ষ্মণসেনের উপর ন্যস্ত করে তিনি ভার্যাসহ গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করেন। অনেকে শ্লোকটির ভুলব্যাখ্যার ভিত্তিতে বলেছেন যে, বল্লাল গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে অর্থাৎ ত্রিবেণীতে আত্মবিসর্জন পূর্বক স্বর্গারোহণ করেন। যা হোক, এ থেকে বোধ হয়, বৃদ্ধবয়সে বল্লালসেন পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেছিলেন। কেহ কেহ বল্লালের 'নির্জরপুর' (অর্থাৎ স্বর্গের রাজধানী অমরাবতী) গমনের স্বাভাবিক অর্থ যে মৃত্যুবরণ, তা বুঝতে পারেন নি। উপরে পৃষ্ঠা ২৭-২৮ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মণসেন (আ ১১৭৯-১২০৬ খ্রী)

বল্লালের মৃত্যুর পর তাঁর চালুক্যবংশীয়া মহিষী রামদেবীর গর্ভজাত পুত্র লক্ষ্মণসেন রাজা হন। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' অনুসারে ১১২৭ শকাব্দে তাঁর রাজত্বের ২৭শ বর্ষ ছিল। সুতরাং তিনি ১২০১ শকাব্দ বা ১১৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দে রাজ্য লাভ করেন। তিনি যে তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ মিনহাজউদ্দীনের 'তবকাত-ই-নাসিরী'তে লক্ষ্মণসেন সম্পর্কে যে প্রশংসাবাণী আছে, কোনও মুসলমান ঐতিহাসিককে কোনও হিন্দু রাজার প্রতি এতটা শ্রদ্ধাশীল দেখা যায় নি। তিনি লিখেছেন যে, রায় লখমনীয়া (রাজা লক্ষ্মণসেন) একজন খুব বড় রাজা ছিলেন এবং দেশের অন্যান্য রাজগণ তাঁকে খলিফার ন্যায় সম্মান দেখাতেন। আরও বলা হয়েছে যে, তিনি আশী বৎসরকাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য এই যে, তিনি কখনও কারও প্রতি অন্যায় করতেন না। লক্ষ্মণসেন নাকি 'লক্ষ-দাতা' সুলতান কুতুবউদ্দীনের মত দানবীর ছিলেন। যে কেউ প্রার্থনা করলে তাকে তিনি কখনও ফেরাতেন না এবং কখনও একলক্ষ কড়ির কম দান করতেন না। তুর্কী মুসলমানের হাতে লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের বছর চল্লিশ পরে মিনহাজউদ্দীন সেনরাজের সম্পর্কে যে কাহিনী শুনেছিলেন, তার মধ্যে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি আছে। যেমন ধরুন, লক্ষ্মণসেন তখন আশী বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন না; বোধহয়, তাঁর বয়স তখন আশী বৎসর হয়েছিল। তুর্কী আক্রমণ ১২০০ খ্রীস্টাব্দের কিয়ৎকাল পরের ঘটনা; সুতরাং সিংহাসনলাভের সময়, লক্ষ্মণের বয়স ষাটের কাছাকাছি ছিল। যাই হোক, হিন্দু-রাজা লক্ষ্মণসেনের গুণকীর্তন করে তাঁর গুণমুগ্ধ মুসলমান মিনহাজউদ্দীন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন, যেন তিনি সেই মৃত সেনরাজের গুণবত্তাহেতু তাঁর অমুসলমানত্বের অপরাধ মার্জনা করেন। সেই ধর্মান্ধতার যুগে এমন ব্যাপার বিরল। লক্ষ্মণসেন একজন অসাধারণ দানবীর ছিলেন, তার একটি প্রমাণ এই যে, চারজন সেনবংশীয় রাজার প্রদত্ত তেরখানি তাম্রশাসনের মধ্যে লক্ষ্মণসেনই আটখানির দাতা। ভূমিদান রাজার নিজের অথবা অন্যের যারই হোক, রাজ্যের

রাজস্বের দিক থেকে রাজ-স্বার্থের হানিকর। ভূমি এবং কড়িদানের পরিমাণ দেখে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালকে বাংলার ইতিহাসের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলতে হবে।

লক্ষ্মণসেন পিতা ও পিতামহের অনুকরণে তাঁদের উপাধির অনুরূপ 'অরিরাজমদনশঙ্কর' উপাধি ধারণ করেন। সম্রাটের উপাধির সঙ্গে তিনি 'গৌড়েশ্বর' সংযুক্ত করেছিলেন। এর কারণ হয়তো এই যে, বিহারের অনেকাংশে লক্ষ্মণসেনের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল এবং সেখানকার পালবংশীয় গৌড়েশ্বর তাঁর সামন্তে পরিণত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তাঁর সময়েই সেনেরা কাশীরাজ অর্থাৎ গাহড়বালবংশীয় নরপতিকে পরাজিত করার এবং গাহড়বালরাজ্যের অন্তর্গত বারাণসী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ উত্থিত করার দাবি করেছে। ঐ সঙ্গে কলিঙ্গ জয় করে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে কৃষ্ণ এবং বলরামের আবাসস্থলে (অর্থাৎ পুরীতে) জয়স্তম্ভ উত্থাপনেরও দাবি দেখা যায়। অবশ্যই এসকল পূর্ব-ভারতে তুর্কী আক্রমণের পূর্ববর্তী। মদনপাড়া তাম্রশাসনে পরবর্তী কালের সংশোধন-চেষ্টা থেকে মনে হয়, জয়স্তম্ভের দাবি লক্ষ্মণের রাজত্বকালীন তৎপুত্র বিশ্বরূপের কৃতিত্ব। আবার সম্ভবতঃ গাহড়বালরাজ গয়া-অঞ্চল থেকে সেনপ্রভুত্ব উচ্ছেদ করার পরও সেখানকার প্রজাগণ দলিলপত্রে লক্ষ্মণ-সেনের অতীত-রাজত্বের বৎসরে তারিখ দিতে অভ্যস্ত ছিল। এ থেকে সেন-গাহড়বাল দ্বন্দ্ব এবং বিহারে সেন-অধিকার প্রসারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ক্রমশঃ গয়া-অঞ্চলে লক্ষ্মণের অতীত-রাজ্যসংবৎসর একটি সংবতে পরিণত হয় এবং মধ্যযুগ থেকে মিথিলাতে এর প্রচলন দেখা যায়। মিথিলার দলিলপত্রে এই অব্দের প্রথমবর্ষ কতিপয় বিভিন্ন বৎসর থেকে গণিত হত। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ১১০৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে অব্দটির গণনার আরম্ভ দেখা যায়। এর কারণ বোধহয় এই যে, লোকে পরে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথমবর্ষের পরিবর্তে তাঁর অজ্ঞাত জন্ম-বর্ষ থেকে এর গণনা আরম্ভ করায় গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক, এই অব্দের প্রচলন থেকে মিথিলায় লক্ষ্মণসেনের অধিকার প্রমাণিত হয় কিনা বলা কঠিন। কারণ মুসলমানী আক্রমণের সময় গয়া-অঞ্চল থেকে যে সব লোক মিথিলায় পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে এই সংবতের ব্যবহার সেখানে যেতে পারে।

লক্ষ্মণসেনের পিতা ও পিতামহ শিবের উপাসক ছিলেন ; কিন্তু তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারের ভক্ত ছিলেন। তাই

তাঁকে শাসনাবলীতে পরমবৈষ্ণব কিংবা পরমনারসিংহ বলা হয়েছে।[১] 'গীত-গোবিন্দ'-রচয়িতা রাধাকৃষ্ণভক্ত কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভায় সমাদৃত ছিলেন। কথিত আছে, জয়দেব বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে (বর্তমান কেন্দুলীতে) বাস করতেন। লক্ষ্মণসেন আরও অনেক কবি ও পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হলায়ুধ, শ্রীধরদাস, ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর এবং গোবর্ধন উল্লেখযোগ্য। 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' প্রণেতা হলায়ুধ প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধিকারী ছিলেন। শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ১১২৭ শকাব্দের ২০শে ফাল্গুন (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে) লক্ষ্মণের রাজত্বের সপ্তবিংশ (রস = ৬ + একবিংশ = ২১ = ২৭) বৎসরে সঙ্কলিত হয়। পিতার ন্যায় লক্ষ্মণসেনও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বল্লালের 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেছিলেন বলে কথিত আছে।

লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে তাঁকে পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব (অথবা পরমনার-সিংহ) পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বলা হয়েছে। তাঁর আনুলিয়া শাসনদ্বারা পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত ব্যাঘ্রতটীতে যে ভূমিখণ্ড কৌশিকগোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রঘুদেবকে নিষ্কর দান করা হয়, তার পরিমাণ ছিল ১ পাটক ৯ দ্রোণ ১ আঢ়াবাপ ৩৭ উন্মান ১ কাকিণিকা এবং বার্ষিক আয় ১০০ কপর্দক-পুরাণ। বৃষভশঙ্কর নল দিয়ে ভূমি মাপা হয়। সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণদত্ত এই শাসনব্যাপারে দূতের কাজ করেছিলেন।

গোবিন্দপুর-শাসন অনুসারে প্রদত্তগ্রামের নাম বিড্ডার-শাসন এবং সেটি বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিম-খাটিকার (খাড়ীর) বেতড্ড-চতুরকে (হাওড়া জেলার বেতড় অঞ্চলে) অবস্থিত ছিল। গ্রামটি লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেক সময়ে উৎসর্গিত হয় এবং নিষ্কর দান পান বাৎস্যগোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ ব্যাসদেব। স্থানীয় ৫৬ হাত নলের মাপে ভূমি-পরিমাণ ছিল ৬০ দ্রোণ ১৭ উন্মান এবং প্রতি দ্রোণে ১৫ পুরাণ হিসাবে গ্রামটির আয় ছিল ৯০০ পুরাণ। এটিরও দূত ছিলেন নারায়ণদত্ত। তর্পনদীঘি শাসনানুসারে প্রদত্ত গ্রামের নাম বেলহিষ্টী। সেটি পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তপাতী বরেন্দ্রীতে অবস্থিত ছিল এবং তার ভূমি-পরিমাণ ছিল স্থানীয় নলের মাপে ১২০ আঢ়াবাপ ৫ উন্মান। নিষ্কর দান পেয়েছিলেন 'হেমাশ্বরথ'-মহাদানের আচার্য ভারদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ ঈশ্বর। দূত ছিলেন নারায়ণদত্ত। ফস্ফগ্রাম থেকে মাধাইনগর শাসনানুসারে প্রদত্ত স্থানের নাম বরেন্দ্রীর কান্তাপুর-আবৃত্তির অন্তর্গত রাবণ-

শতাব্দীর শেষ দিকে আমীর সবুক্তগীন বর্তমান পাকিস্থানের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল অধিকার করেন। একাদশ শতাব্দীর সূচনায় তাঁর পুত্র সুলতান মহমুদ পঞ্জাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সেনরাজগণের সময়ে মহমুদের বংশধরগণ লাহোরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের আমলে ঘুরে অধিষ্ঠিত তুর্কীরা প্রবল হয়ে পঞ্জাব অধিকার করে এবং মুহম্মদ ঘুরী তিরোরীর দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রী) দিল্লী-আজমেরের চৌহানবংশীয় রাজপুত রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের রাজ্য গ্রাস করেন। বারাণসী ও কান্যকুব্জের গাহড়বাল রাজ্যও তাঁর পদানত হল (১১৯৩ খ্রী)। এই সময় তুর্কী সেনাদলের মুহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার (অর্থাৎ বখ্‌তিয়ারের পুত্র মুহম্মদ ; ই=ইবন্) নামক জনৈক ভাগ্যান্বেষী সেনানায়ক প্রথমে বিহার এবং পরে বঙ্গদেশের দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরঅঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খলজী। মুহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের এই বিজয়ের বিবরণ দিয়েছেন মৌলানা মিনহাজ উদ্দীন তাঁর 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে। মিনহাজউদ্দীন দিল্লীর সুলতানদের অধীনে নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৬৪০ হিজরী অব্দে (১২৪২-৪৩ খ্রী) লখনৌতী (লক্ষ্মণাবতী) বা গৌড়ে এসে দুই বৎসর সেখানে অবস্থান করেন। তখনই তাঁর বিবরণের উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল ; কিন্তু গ্রন্থখানি ৬৫৮ হিজরী সালে (১২৬০-৬১ খ্রী) লিখিত হয়। দুঃখের বিষয়, এই উপাদানে কিংবা উপাদান-সংগ্রহে কিছু ত্রুটি ছিল, যার ফলে বিহার, বাংলা এবং আসামে মুহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ কোথাও কোথাও বোঝা যায় না এবং কোথাও বা আজগুবি রূপকথার মত শোনায়। বিহারের অন্তর্গত বিহারশরীফে অবস্থিত উদ্দণ্ডপুর বৌদ্ধবিহার ধ্বংস (আ ১১৯৩ খ্রী) ঐ অঞ্চলের যুদ্ধবিগ্রহের একমাত্র ঘটনা। কিন্তু কোন রাজা তখন ঐ জনপদের অধিপতি ছিলেন, তা বলা হয় নি। আবার তার কত পরে লক্ষ্মণসেনের তৎকালীন বাসস্থান নোদীয়া (নওদীয়া বা নবদ্বীপ) অধিকৃত হয়, তাও লেখা নেই। এদিকে বলা হয়েছে যে, যে শুভলগ্নে জন্মালে লক্ষ্মণসেন আশী বৎসর রাজত্ব করবেন বলে জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার দু-ঘন্টা পূর্বেই তাঁর জননীর প্রসবব্যথা আরম্ভ হলে নাকি মহিষীর পা উপরে বেঁধে তাঁকে ঝুলিয়ে রেখে প্রসব বিলম্বিত করা হয়েছিল! যা হোক, মিনহাজউদ্দীনের লিখিত নোদীয়া-বিজয়ের কাহিনীটি এইরূপ।—

মুহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিহারবিজয় সম্পূর্ণ হবার পর তাঁর বিষয়

লক্ষ্মণসেন ও তাঁর প্রজাদের কর্ণগোচর হল। জ্যোতিষীরা, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ও মন্ত্রীরা রাজাকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পরামর্শ দিলেন; কারণ শাস্ত্রানুসারে নাকি দেশটি শীঘ্রই তুর্কীদের করতলগত হবার কথা। অনুসন্ধানে জানা গেল, শাস্ত্রে তুর্কী বিজেতার যে বর্ণনা আছে মুহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের চেহারার সঙ্গে তার মিল আছে। এর পর ব্রাহ্মণ ও ধনাঢ্য বণিকেরা অনেকে বঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি দেশে অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলে পালিয়ে গেল; কিন্তু লক্ষ্মণসেন দেশত্যাগ করলেন না। এক বৎসর পর মুহম্মদ একদল সেনা সজ্জিত করে বিহার থেকে বেরুলেন এবং এমনভাবে নোদীয়া শহরের দ্বারে উপস্থিত হলেন যে মাত্র অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী তাঁর সংগে আসতে সমর্থ হল, বাকী সেনাদল পরে এসে তাঁকে ধরেছিল। নগরদ্বারে পেঁছে মুহম্মদ কাকেও আঘাত না করে এমন ধীরভাবে অগ্রসর হলেন যে, স্থানীয় লোকেরা ভাবল যেন একদল বণিক বিক্রয়ের জন্য অশ্ব নিয়ে এসেছে। যতক্ষণ না মুহম্মদ লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদদ্বারে পেঁছে বিধর্মীদের আক্রমণ করলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বুঝতে পারেনি যে, স্বয়ং মুহম্মদ উপস্থিত। সেনরাজ তখন আহার করছিলেন। এমন সময় শহর থেকে আক্রমণ-জনিত কোলাহল উত্থিত হল। মুহম্মদ তখন দ্বারপথে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করলেন। ব্যাপার বুঝে সেনরাজ খালিপায়ে প্রাসাদের পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে পালিয়ে গেলেন। তখন মুহম্মদের সমস্ত সেনাদল এসে পেঁছে গিয়েছে। নগর ও চতুঃপার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকৃত হল এবং মুহম্মদ নোদীয়াতে বাস করতে লাগলেন। রাজা লক্ষ্মণসেন নৌকায় 'সঙ্কনাত' ('সমতট' নামের অশুদ্ধরূপ) ও বঙ্গ অভিমুখে প্রস্থান করলেন। সেখানে কিছুকাল পরে তাঁর রাজত্বের অবসান ঘটল। সেদেশ 'এখন পর্যন্ত' (অর্থাৎ বোধ হয় মিনহাজউদ্দীনের লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে অবস্থানকাল বা পুস্তকরচনা পর্যন্ত) লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ রাজত্ব করছিলেন। মুহম্মদ কর্তৃক অধিকৃত হবার পর তিনি নোদীয়া শহরটিকে ধ্বংসের মুখে ফেলে লখনৌতী (লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়) শহরে বাস করতে গেলেন।

এই বর্ণনার ত্রুটি এই যে, লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ-রক্ষার ব্যবস্থার কথা নেই, অথচ চোর-ডাকাত, বিদ্রোহী প্রভৃতির হাত থেকেও অন্ততঃ রাজা ও নগরবাসীর ধন-প্রাণ রক্ষার কোনও ব্যবস্থা না থাকা কল্পনা করা যায় না। রাজার দেহরক্ষী, প্রাসাদরক্ষী ও নগররক্ষী সেনাদের সঙ্গেও মুহম্মদসহ উনিশজন তুর্কী সেনার কোনও যুদ্ধ হল না, এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

একথা মনে হতে পারে যে, মূল তুর্কী সেনাদল নোদীয়ায় পৌঁছার পরই উনবিংশ অশ্বারোহী দ্বারা রাজপ্রাসাদ আক্রান্ত হয়। কিন্তু সেন রাজকর্মচারীদের অজ্ঞাতসারে একটা বিরাট সেনাদলের পক্ষে বিহারের সীমান্ত থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছা কি করে সম্ভব হল ? তুর্কী আক্রমণের ভয়ে নগরবাসীরা অনেকে পলায়ন করে, অথচ যাঁদের উপর নগর-রক্ষার দায়িত্ব ছিল, তাঁরা নিশ্চিন্ত রইলেন—এ কেমন কথা ? কলহণপণ্ডিত বলে গেছেন যে, প্রজাগর (রাত্রির পাহারা), চরন্যাস, শস্ত্রাভ্যাস প্রভৃতি তুর্কী সেনার বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সেনাদলে তেমন দেখা যেত না। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের শাসনব্যবস্থা যদি এতই ত্রুটিপূর্ণ হত, তবে তিনি এবং তাঁর বংশধরেরা পরে যখন বিক্রমপুর থেকে পূর্ব-বাংলা শাসন করছিলেন, তখন তুর্কীরা অবিলম্বে ঐ অঞ্চল অধিকার করতে পারল না কেন ? যাহোক, কেবলমাত্র সেনরাজের উচ্চ কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই এমন অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটতে পারে। রাজার জ্যোতিষী, মন্ত্রী প্রভৃতি তাঁকে দেশ ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তার যে কারণ দেখিয়েছিলেন, তা থেকে মনে হয়, তাঁদের আনুগত্য শত্রুর কাছে বিক্রীত ছিল। কারণ দেশের শাস্ত্রে প্রকৃতপক্ষে তুর্কী আক্রমণ এবং তুর্কী সেনাপতির আকৃতি সম্পর্কিত কোনই কথা নেই। মিনহাজউদ্দীনের কথা সত্য হলে, ঐ বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক অবশ্যই জাল করা হয়েছিল। কিন্তু মূলে কোনও বড় রকমের চক্রান্ত না থাকলে এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা সম্ভব হয় না। কিন্তু সে সম্পর্কে মিনহাজউদ্দীন একেবারেই নীরব। তিনি স্বীকার করেছেন যে, মুহম্মদ-ই-বখতিয়ারের বিহার ও বাংলা বিজয়ের কাহিনী তিনি লোকমুখে শুনেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি কোনও সরকারী দলিলপত্র পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন নি। 'ফুতু-হুস্‌সলাতীন্'-এর গ্রন্থকার এই ঘটনার কিছুটা অন্যরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর সময়ে মুহম্মদ-সম্পর্কিত গালগল্প আরও কিছু পল্লবিত হয়েছিল।

তুর্কীসেনা কর্তৃক নোদীয়াবিজয়ের তারিখ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা একমত নন। 'সেকশুভোদয়া' ও তিব্বতী পগ্‌-সম্‌-জোন্‌-জঙ্গ্‌ অনুসারে ঘটনাটি ১১৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১২০২-০৩ খ্রীস্টাব্দে ঘটেছিল। এখন আমরা গৌড়বিজয়ের তারিখ জানি। আসলে লক্ষ্মণ-সেনের প্রথম রাজধানী ছিল বিক্রমপুর এবং দ্বিতীয় রাজধানী লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়। প্রাচীন পরিত্যক্ত-রাজধানী নবদ্বীপে তিনি তীর্থবাস করছিলেন বোধহয়। সেখানে মুহম্মদ তাঁকে সহজে পরাজিত করেন, কিন্তু বন্দী করতে গিয়ে

নিরাশ হন। লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে চলে গেলেন। মুহম্মদ ততদূর যেতে সাহসী হন নি। তিনি শীঘ্রই লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে মুহম্মদ ঘুরীর নামে টঙ্ক (স্বর্ণমুদ্রা) প্রচার করলেন। তাতে 'গৌড়-বিজয়'-এর তারিখ দেখা যায় হিজরী ৬০১ সালের ১৯শে রমজান (১০ই মে, ১২০৫ খ্রীস্টাব্দ)।

মিনহাজউদ্দীন বলেছেন যে, লক্ষ্মণসেন বঙ্গ-সমতট অঞ্চলে চলে যাবার কিছুকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়। কথাটা সত্য বটে। ভাওয়াল তাম্রশাসনের তারিখ (২৭শ বর্ষ) থেকে বোধ হয় এটাই তাঁর রাজত্বের শেষ অভিলেখ। 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' অনুসারে ১১২৭ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি জীবিত ছিলেন।

১১১৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১১৯৬ খ্রীস্টাব্দে মহাসামন্তাধিপতি মহারাজাধিরাজ ডোম্মণপাল বর্তমান ২৪-পরগণায় পূর্বখাটিকা বা খাড়ীতে বার্মহিথা গ্রাম দান করেছিলেন। তিনি লক্ষ্মণসেনের রাজ্যে জনৈক উচ্চশ্রেণীর শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর দান গ্রহণ করেন তাঁর মিত্র বাধূলসগোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ রাণক উপাধিধারী বাসুদেব।

Scanned with CamScanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী সেনরাজগণ

লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁর মহিষী অহ্বনদেবীর গর্ভজাত পুত্র বিশ্বরূপসেন সিংহাসন লাভ করেন। তিনি প্রপিতামহ বিজয়ের ন্যায় 'অরিরাজবৃষভশঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। মদনপাড়া শাসনে 'অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর' উপাধির 'নিঃশঙ্ক' কথার 'নিঃশ' অক্ষর দুটি ঘসে তুলে সেখানে 'বৃষভ' পুনরুৎকীর্ণ করায় এবং এই ভ্রান্তপাঠ 'অরিরাজবৃষভঙ্কশঙ্কর' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাসনে অনুকৃত হওয়ায় সাধারণতঃ বিশ্বরূপের উপাধি 'অরিরাজবৃষভাঙ্কশঙ্কর' ধরা হয়; কিন্তু 'বৃষভ(ভা)ঙ্ক' যেন তেমন ভাল অর্থ বহন করে না। মদনপাড়া শাসনের তারিখ বিশ্বরূপের রাজত্বের চতুর্দশ বর্ষ। সুতরাং তিনি আনুমানিক ১২০৬-২৫ খ্রীস্টাব্দে রাজত্ব করেছিলেন ধরা যায়।

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া তাম্রশাসন একটি অদ্ভুত দলিল। মূলে এটি বিশ্বরূপের পুত্র রাজা সূর্যসেনের দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হয়েছিল; কিন্তু বিশ্বরূপের রাজত্বের চতুর্দশ রাজ্যবৎসরে দলিলের কতকগুলি অংশের অক্ষর ঘসে তুলে নূতন অক্ষর খোদাই করা হয়। মূল শাসনের কাব্যাংশে দশম শ্লোকে বিশ্বেশ্বরের জন্মের উল্লেখ এবং দ্বাদশ শ্লোকে তৎকর্তৃক পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপনের দাবি দেখা যায়। দাবিটি অবশ্যই তাঁর পিতার আমলের। ত্রয়োদশ শ্লোকে বিশ্বরূপের মহিষী অর্থাৎ সূর্যসেনের জননীর নাম ঘসে তুলে লক্ষ্মণসেনের মহিষী অর্থাৎ বিশ্বরূপসেনের মাতার নাম 'অহ্বনদেবী' খোদাই করা হয়েছে। চতুর্দশ শ্লোকে সূর্যসেনের নামের 'সূর্য্য' অক্ষর দুটি ঘসে তুলে সেই অল্প পরিসরে কোনও রকমে চার অক্ষরের 'বিশ্বরূপ' খোদাই করা দেখা যায়। আবার দানাংশের রাজবর্ণনায় বল্লালের প্রপৌত্র, লক্ষ্মণের পৌত্র এবং বিশ্বরূপের পুত্র সূর্য—এই নামগুলি ঘসে তুলে বিজয়ের প্রপৌত্র, বল্লালের পৌত্র এবং লক্ষ্মণের পুত্র বিশ্বরূপ করা হয়েছে। এই রাজগণের উপাধিগুলির বেলাতেও অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর, অরিরাজমদনশঙ্কর এবং অরিরাজবৃষভশঙ্করের মধ্যবর্তী 'নিঃশঙ্ক', 'মদন' এবং 'বৃষভ' শব্দগুলি ঘসে তুলে 'বৃষভ', 'নিঃশঙ্ক' এবং 'মদন' করার চেষ্টা হয়েছে। দলিলের তারিখ সম্পর্কে মূলে ছিল 'দ্বিতীয়াব্দীয়'। তন্মধ্যে 'দ্বিতী' অক্ষর দুটি ঘসে তুলে 'চতুর্দশ'

উৎকীর্ণ করা হয়। ফলে পাঠ দাঁড়িয়েছে 'চতুর্দশয়াব্দীয়'। সংশোধনে এইরূপ কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়। একটা বিশেষ ত্রুটি এই যে, লক্ষ্মণের নাম 'বিশ্বরূপ'-এ পরিবর্তিত করার পর বিশ্বরূপের উপাধি 'পরমসৌর' পালটে 'পরমবৈষ্ণব' বা 'পরমনারসিংহ' করতে ভুল হয়ে গেছে। মদনপাড়া লেখের উত্তরকালীন পরিবর্তন যে কোনও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পরীক্ষা করে দেখলেই সমস্ত বিষয়টা বুঝতে পারবেন। সেজন্য প্রত্নলিপিবিদ্যার জ্ঞান না হলেও চলবে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, বিশ্বরূপসেনের রাজত্বকালে কিছু-দিনের জন্য তিনি রাজ্যশাসনে অক্ষম হন। তখন তাঁর পুত্র সূর্যসেনকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। বিশ্বরূপের এই সাময়িক অক্ষমতার কারণ দুরারোগ্য ব্যাধি, শত্রু-হস্তে বন্দিত্ব প্রভৃতি কিছু হতে পারে। যাহোক, তাঁর দুর্দিনের অবসানে সূর্যসেন পিতাকে সিংহাসন ছেড়ে দেন। আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্বরূপের পরবর্তী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ শাসনের কাব্যাংশ মদনপাড়া শাসন থেকে অনুকৃত হতে পারে। এর প্রকৃত কারণ অনিশ্চিত। রাজা যদি এই কাব্যাংশ নূতন করে লেখাতেন, তবে বিশ্বরূপের রাজত্বকালীন কোনও কোনও বিষয় স্পষ্ট হত।

বিশ্বরূপের ইদিলপুর তাম্রশাসনের অবস্থা মদনপাড়া শাসনের অনুরূপ। ইদিলপুর শাসনও মূলতঃ সূর্যসেনের প্রদত্ত এবং পরে 'সূর্য্য' স্থলে 'বিশ্বরূপ' খোদাই করা হয়েছে। দুটি অক্ষরের পরিসরে চারটি অক্ষর লেখায় অক্ষরগুলি স্পষ্ট হয় নি। তাই কেউ কেউ 'বিশ্বরূপ'-স্থানে ভ্রমক্রমে 'কেশব' নাম পাঠ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কেশব নামে সেনবংশের কোনও রাজার অস্তিত্বের কিছুমাত্র প্রমাণ নেই। ইদিলপুর তাম্রশাসনটি বহুদিন পূর্বে হারিয়ে গিয়েছে। তার প্রকাশিত ছাপ সন্তোষজনক না হলেও পরবর্তী কালের পরিবর্তন স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, শাসনের কাব্যাংশে পরিবর্তন ঘটানোর ফলে বিশ্বরূপের কৃতিত্ব লক্ষ্মণসেনে আরোপিত হয়েছে। ঘটনাটি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে ঘটেছিল বলে এতে পরিবর্তনকারীরা কোনও ত্রুটি দেখতে পান নি। এইরূপ আর একটি বিষয় হল সপ্তদশ শ্লোকে বর্ণিত সূর্যসেনের কৃতিত্ব গর্গ-যবনদের পরাজয় বিশ্বরূপসেনের নামে চলে যাওয়া। এ ঘটনাটিও বিশ্বরূপের রাজত্বকালীন বলে মনে হয়। 'গর্গযবন' অর্থ গর্গবংশীয় যবন, অর্থাৎ গর্গঋষির বংশজাত পৌরাণিক কালযবন। প্রাচীন যবন বা গ্রীকেরা গৌরবর্ণ ছিল ; কিন্তু এখানে কৃষ্ণ বা অশ্বেতবর্ণ যবন বলতে অবশ্যই মুসলমান বোঝানো

হয়েছে। গৌড়ে অধিষ্ঠিত তুর্কী মুসলমানদের সঙ্গে বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত সেনরাজগণের যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল, তাতে সন্দেহের কারণ নেই।

মদনপাড়া শাসনে যে দেখা যায় পূর্বপ্রদত্ত একটি শাসন পরবর্তী কালে পরিবর্তিত করা হয়েছিল, তার কারণ শাসনাংশের পরিবর্তন থেকে বোঝা যায়। পরিবর্তিত শাসনানুসারে বিক্রমপুর-ভাগের অন্তর্গত বার্ষিক-রাজস্ব ৬২৭ পুরাণ (বা চূর্ণী) আয়-সম্পন্ন পিঞ্জোকাষ্ঠী বা পিঞ্জো(কা*)ঠীয় গ্রাম (ফরিদপুর জেলার মদনপাড়ার নিকটবর্তী পিঞ্জাড়ি) বনমালীর পুত্র, গর্ভেশ্বরের পৌত্র এবং পরাশরের প্রপৌত্র বিশ্বরূপদেবশর্মাকে দান করা হয়। পূর্বে ৫০০ পুরাণ রাজস্ব-আয়সম্পন্ন গ্রামাংশের সঙ্গে ১৩২ পুরাণ রাজস্ব-আয়সম্পন্ন অপর একখণ্ড ভূমি যোগ করে ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু পরে দেখা যায়, পদাতি-শাপামার্কের নামাঙ্কিত এই দ্বিতীয় ভূখণ্ড কন্দর্পশঙ্কর নামক আশ্রমের সম্পত্তি। তাই এই ভূমি বাদ দিয়ে তৎপরিবর্তে রাজার জনৈক পোষ্যের জায়গীরের অন্তর্গত ১২৭ পুরাণ বার্ষিক-রাজস্বসম্পন্ন অন্য একখণ্ড ভূমি দেওয়া হল। এই ভূমিখণ্ড কন্দর্পশঙ্করাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত নারণ্ডপগ্রামে অবস্থিত ছিল।

সূর্যসেনের ইদিলপুর শাসন ফস্ফগ্রাম থেকে তৃতীয় রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত। দানভূমি ছিল বিক্রমপুর-ভাগে অবস্থিত এবং দানগ্রহীতা ছিলেন মদনপাড়া শাসন-গ্রহীতার ভ্রাতা বৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদেবশর্মা। শাসনটি হারিয়ে গিয়েছে বলে এটি পরীক্ষা করা যায় নি। বিশ্বরূপের মধ্যপাড়া শাসনের ভূমিখণ্ডসমূহ ১৩শ ও ১৪শ রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হয়। এতে ১৪শ বৎসরের উত্থানদ্বাদশী-তিথি অর্থাৎ কার্তিকমাসের উল্লেখ আছে। দানগ্রহীতা ছিলেন পণ্ডিত হলায়ুধ। অনেকগুলি দানের মধ্যে একটি রাজমাতার চন্দ্রগ্রহণ-দর্শন উপলক্ষ্যে দেওয়া এবং তিনটি কুমার সূর্যসেন, কুমার পুরুষোত্তমসেন এবং সান্ধিবিগ্রহিক নাঞ্চী-সিংহের প্রদত্ত এবং তাঁদের জায়গীরমধ্যে অবস্থিত ছিল। প্রদত্ত স্থানগুলি বঙ্গের নাব্য ও বিক্রমপুর-অঞ্চল এবং চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল।

বিশ্বরূপের পর সেনরাজগণ কতকাল বিক্রমপুরে রাজত্ব করেছিলেন, তা নিশ্চিত জানা যায় না। মিনহাজউদ্দীনের সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, অন্ততঃ ১২৪৫ (কিংবা ১২৬০) খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়পাদে সমতটে দেববংশীয় সামন্তগণ প্রবল হতে থাকেন। এই বংশের পরাক্রান্ত নরপতি দামোদর ১২৩০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন; কিন্তু তাঁর শাসনগুলি বিক্রমপুর থেকে প্রদত্ত হয় নি। তাঁর পুত্র দশরথ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেনশাসনের অবসান ঘটিয়ে বিক্রমপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গ-সমতট অঞ্চলের রাজবংশাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্মা রাজবংশ

একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিক্রমপুরে চন্দ্রবংশের রাজত্ব শেষ হয়, এবং দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিজয়সেন বিক্রমপুর অধিকার করেন। এই এক শতাব্দী মধ্যে ঐ নগরে বর্মা রাজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বর্মা রাজগণ আপনাদিগকে পৌরাণিক যদুবংশজাত ও সিংহপুর থেকে আগত বলে দাবি করতেন। তাঁরা ভারতের কোন্ অঞ্চল হতে বাংলায় এসেছিলেন, তা বলা কঠিন। তবে বংশের প্রথম রাজা বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা কলচুরি কর্ণের কন্যা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন এবং শ্বশুরের অন্যতম সেনাপতি রূপে এদেশে এসে থাকতে পারেন। কর্ণের রেওয়া শিলালেখে জাত নামক সামন্তের উল্লেখ আছে। জাতবর্মা তৃতীয় বিগ্রহপালের ভায়রাভাই ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁর অধীনে অঙ্গদেশের শাসনকর্তা হয়েছিলেন। ভোজবর্মার বেলাবো তাম্রশাসনে বলা আছে যে, জাতবর্মা বেন-পুত্র পৃথুর গৌরব ম্লান করে, কর্ণ-কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করে, অঙ্গদেশে অধিকার বিস্তার করে, কামরূপের গর্ব খর্ব করে এবং দিব্য ও গোবর্ধন নামক নরপতিদ্বয়কে পর্যুদস্ত করে নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এই দিব্য অবশ্যই উত্তরবাংলায় কৈবর্ত-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দিব্য বা দিব্বোক; বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যু হলে তিনি উত্তরবাংলায় রাজ্যস্থাপনের সুযোগ পান। জাতবর্মা সম্ভবতঃ পালসেনার অন্যতম সেনাপতিরূপে কৈবর্তরাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিকভাবে ১০৫৫-৭৩ খ্রীস্টাব্দ নির্দেশ করা যেতে পারে। কারণ তাঁর পুত্র ১০৭৩ খ্রীস্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন বলে জানা যায়। তিনি হয়তো পূর্ববিহারে এবং চন্দ্রোত্তর আমলের পূর্ববাংলায় পালরাজের সামন্ত ছিলেন।

জাতবর্মার পুত্র হরিবর্মার সামন্তসার তাম্রশাসন বিক্রমপুর থেকে প্রদত্ত হয়।

তাম্রশাসনটির অনেকাংশের লেখা অস্পষ্ট। হরিবর্মার রাজত্বকালে অনুলিখিত দুখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে একখানি ১৯শ রাজ্যবর্ষে অনুলিখিত এবং অন্যখানির তারিখ ৩৯তম (কোনও মতে ৩২শ) রাজ্যবর্ষ। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক হরিবর্মার রাজত্বের ৪৬তম বৎসর অতীত হবারও উল্লেখ আছে এবং সেই বৎসরের বর্ণনা থেকে গণনা করে দেখা যায় যে, ১১১৯ খ্রীস্টাব্দে হরিবর্মার রাজত্বের ৪৬তম বর্ষ শেষ হয়েছিল। সুতরাং তিনি ১০৭৩ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেছিলেন। অতএব আনুমানিকভাবে হরিবর্মার রাজত্বকাল ১০৭৩-১১২৭ খ্রীস্টাব্দ মধ্যে নির্দেশ করা যেতে পারে।

পূর্ববাংলায় হরিবর্মার রাজ্য ছিল: রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। বিক্রমপুর চন্দ্রবংশের হাত থেকে অধিকৃত হতে পারে। কিন্তু ঠিক কখন, অর্থাৎ জাতবর্মার কি হরিবর্মার সময়ে নগরটি বর্মাদের হস্তগত হয়, তা ঠিক বলা যায় না। কামরূপ রাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বোধ হয় জাতবর্মার সময়ে পূর্ববাংলায় বর্মাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু কৈবর্তরাজ ভীমের রাজ্য আক্রমণ কালে রামপালের (আ ১০৭২-১১২৬ খ্রী) সেনাদল গঙ্গার দক্ষিণকূল থেকে উত্তরকূলে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে 'রামচরিত'-এ উল্লিখিত আছে। তাতে মনে হয়, পূর্বাভিমুখী গঙ্গার দক্ষিণে এবং বাংলার দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে রামপালের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বোধ হয়, এই জন্যই 'শব্দপ্রদীপ'-রচয়িতা রামপালকে বঙ্গেশ্বর বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে, তাঁর পিতা বঙ্গেশ্বর রামপালের সভায় এবং প্রপিতামহ গোবিন্দচন্দ্রের সভায় রাজবৈদ্য ছিলেন। আবার 'রামচরিত'-এ কৈবর্তরাজ ভীমের মিত্র হরির উল্লেখ আছে। তিনি হরিবর্মা হতে পারেন। হরির সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি ভীমের বন্দী হবার পর ছত্রভঙ্গ কৈবর্ত সেনাদলকে পালসৈন্যের বিরুদ্ধে চালিত করেন। কিন্তু রামপালের পুত্র বহু অর্থব্যয় করে ভীম-পক্ষীয়দের সঙ্গে হরির বিরোধের সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। পরিশেষে হরি রামপালের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। রামপালের রাজত্বের পরবর্তী কালের বর্ণনাতেও 'রামচরিত'-এ বলা আছে যে, পূর্বাঞ্চলের জনৈক বর্মা নরপতি নিজের স্বার্থে পালসম্রাটকে প্রসাদিত করেছিলেন। এই বর্মা রাজা বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হরিবর্মা ব্যতীত আর কেউ বলে বোধ হয় না। এথেকে মনে হয় যে, কৈবর্ত ও পাল-রাজগণের সংঘর্ষের সুযোগে কৈবর্তপক্ষে যোগ দিয়ে হরিবর্মা পূর্ববাংলায় স্বাধীন

রাজত্বের সুযোগ পান। বোধ হয় এই জন্যই কৈবর্তযুদ্ধের প্রাক্কালে রামপালকে পূর্ববাংলা অধিকার করতে হয়েছিল। পরে রামপাল হরিবর্মার সঙ্গে মিত্রতা করে তাঁকে বিক্রমপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কেউ কেউ বর্মাদের প্রসঙ্গে গাঙ্গেয়দেব কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের দাবির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐ ধরনের দাবির ঐতিহাসিকতা আমরা নিঃসন্দিগ্ধ মনে করি না।

ভোজবর্মার বেলাবো শাসনে হরিবর্মার উত্তরাধিকারী হিসাবে সামলবর্মার উল্লেখ নেই। কিন্তু ভোজের পিতা সামলবর্মার খণ্ডিত বজ্রযোগিনী শাসনের প্রশস্তি-অংশে হরিবর্মার নাম দেখা যায়। সামলবর্মা হয়তো হরির পুত্রকে উৎখাত করে সিংহাসন লাভ করেছিলেন, তাই তাঁকে ভ্রাতার নাম না করে জাতবর্মার 'পাদানুধ্যাত' (অর্থাৎ উত্তরাধিকারী) বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

হরিবর্মার মন্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ভবদেবভট্ট। তিনি বালবলভী নামক স্থানের কোনও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন এবং গুরুর নিকট থেকে 'বালবলভীভুজঙ্গ' (অর্থাৎ বালবলভীর বিশিষ্ট নায়ক বা ছাত্র) উপাধি লাভ করেন। ভবদেব রাঢ়দেশের সিদ্ধলগ্রামবাসী ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর একখানি শিলাপ্রশস্তি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছিল; কিন্তু সোসাইটির কর্তৃপক্ষ উড়িষ্যা থেকে সংগৃহীত কোনও শিলালেখের পরিবর্তে ভুলবশতঃ ভবদেবের প্রশস্তিটিকে ভুবনেশ্বরে প্রেরণ করেন এবং সেখানে এটি অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির-প্রাকারে গ্রথিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, শিলাপ্রশস্তিটি ঢাকা থেকে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাহলে ভবদেব-নির্মিত যে মন্দিরে প্রশস্তিটি মূলতঃ গ্রথিত ছিল, সেটি তাঁর প্রভু হরিবর্মার রাজধানী বিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল, মনে করতে হবে। এই প্রশস্তি থেকে ভবদেবের বংশ এবং পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও তাঁর মত বঙ্গেশ্বরের মন্ত্রী (সান্ধিবিগ্রহী) ছিলেন। এই বঙ্গেশ্বর কে তা জানা যায় না। ভবদেব বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত কতকগুলি গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, ভবদেব-প্রশস্তির ১৬শ শ্লোকে হরিবর্মার পর তাঁর পুত্রের সিংহাসন লাভের উল্লেখ আছে বলে মনে করা যায়। তাঁর নাম জানা যায় নি। এই অজ্ঞাতনামা বর্মা নরপতির (আ ১১২৭ খ্রী) পর হরিবর্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সামলবর্মা (আ ১১২৭-৩৭ খ্রী) সিংহাসন লাভ করেন। বৈদিক ব্রাহ্মণদের কুলপঞ্জী অনুসারে সামলবর্মার রাজত্বকালে (কোনও মতে হরিবর্মার

রাজত্বকালে) বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। কতিপয় গ্রন্থ অনুসারে তাঁদের বাংলায় আগমনের তারিখ ১০০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১০৭৯ খ্রীস্টাব্দ। এ তারিখটি অবশ্য শুদ্ধ না হতে পারে।

সামলবর্মার পরে তাঁর পট্টমহিষী মালব্যদেবীর গর্ভজাত পুত্র ভোজবর্মা (আ ১১৩৭-৪৫ খ্রী) রাজা হন। এই বংশের সীলমোহরে বিষ্ণুচক্র অঙ্কিত থাকত। পরমবৈষ্ণব ভোজবর্মার বেলাবো তাম্রশাসন বিক্রমপুর থেকে প্রদত্ত। প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্র-ভুক্তির অন্তর্গত কৌশাম্বী-অষ্টগচ্ছ-খণ্ডলে অবস্থিত ছিল। এই সময়ে পূর্ববাংলাকে পৌণ্ড্র-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ধরা হত। তাই কৌশাম্বীকে রাজশাহী জেলার কুসুম্বা স্থির করা নিষ্প্রয়োজন। বর্মা বংশীয় রাজারা অনেক সময় পালবংশের লঘুমিত্র ছিলেন বলে মনে হয়। ভোজবর্মার পরে বিজয়সেন বিক্রমপুর অধিকার করেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমতট ও বঙ্গের দেববংশ

এই বংশের পাঁচখানি তাম্রশাসন থেকে আমরা নিম্নলিখিত বংশক্রম জানতে পারি :—(১) পুরুষোত্তম, (2) তৎপুত্র মধুসূদন বা মধুমথন, (৩) তৎপুত্র বাসুদেব (আ? ১২১৫-৩০ খ্রী), (৪) তৎপুত্র দামোদর (আ ১২৩০-৫৫ খ্রী) এবং (৫) তৎপুত্র দশরথ (আ ১২৫৫-৯০ খ্রী)। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন সেনরাজগণের সামন্ত রূপে কোনও ক্ষুদ্র ভূখণ্ড শাসন করতেন। চতুর্থ রাজা দামোদর পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি ১১৫৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১২৩০-৩১ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন এবং ১২৪৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর তৃতীয় তাম্রশাসন দান করেন। তৎকর্তৃক প্রদত্ত ভূমির অবস্থান থেকে বলা যায়, দামোদরের রাজ্য বর্তমান কুমিল্লা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন এবং সেনবংশীয় প্রভুদের অনুকরণে 'অরিরাজচানুরমাধব' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কোনও কাজে নাকি গৌড়ে এক মহোৎসব উপস্থিত হয়। এই সময় লক্ষ্মণসেনের উত্তরাধিকারীরা সম্ভবতঃ নিজদিগকে 'গৌড়েশ্বর' বলে যাচ্ছিলেন, যদিও গৌড়নগর তখন তুর্কী মুসলমানের অধিকৃত ছিল। সুতরাং দাবিটির ভৌগোলিক তাৎপর্য বোঝা কঠিন। যাই হোক, দামোদর স্বাধীন রাজার উপাধি গ্রহণ করেন নি এবং বিক্রমপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন নি। সুতরাং তিনি বিক্রমপুরের নামে-মাত্র বশীভূত-মিত্র ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর রাজত্বকালে অন্ততঃ পক্ষে ১২৪৫ (বা ১২৬০) খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সেনবংশীয়েরা রাজত্ব করছিলেন, এরূপ কথা 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে বলা হয়েছে। দামোদরের রাজত্বকাল আনুমানিকভাবে ১২৩০-৫৫ খ্রীস্টাব্দ ধরা যেতে পারে।

রাজা দামোদরের পূর্বপুরুষদের আমলে ময়নামতী পাহাড়ের নিকটবর্তী পট্টিকেরাতে একটি শৈব রাজবংশ রাজত্ব করত। সেই বংশ দামোদর কর্তৃক উৎখাত হয়েছিল বলে মনে হয়।

দামোদরের পুত্র দশরথ স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তিনি সেনবংশের রাজধানী বিক্রমপুর থেকে তাম্রশাসন দান করেছেন এবং আপনাকে পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ এবং 'অরিরাজদনুজমাধব' ও দেববংশীয় বলে উল্লেখ

করেছেন। বাংলা কুলপঞ্জীতে তাঁকে দনুজমাধব বা দনৌজামাধব এবং মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন্ বারানীর গ্রন্থে দনুজরায় বলা হয়েছে। আনুমানিক ১২৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি দিল্লীর দাসবংশীয় সুলতান্ ঘিয়াসুদ্দীন্ বল্‌বনের সঙ্গে চুক্তি করেন যে, তাঁর রাজ্য দিয়ে তিনি বাংলার বিদ্রোহী শাসক তুগ্রিলখাঁকে পলায়ন করতে দেবেন না। এ থেকে বোঝা যায়, দশরথ অনুমান ১২৫৫-৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বারানী দনুজরায়কে সোনারগাঁয়ের রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। দশরথের রাজধানী সোনারগাঁও প্রাচীন বিক্রমপুরনগরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে বিক্রমপুর পরগণা অবস্থিত; কিন্তু বিক্রমপুর নামের একটি গ্রাম পদ্মা-নদীর গর্ভে বিলীন হয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে। সোনারগাঁও মুন্সীগঞ্জের নিকটে ধলেশ্বরী নদীর অপরতীরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই ধলেশ্বরী কোন্ পথে প্রবাহিত হত, তা বোঝা যায় না। পদ্মানদী তখন অনেকটা পশ্চিম দিক্ দিয়ে সাগরে পড়ত।

সেনরাজের দোষে আমন্ত্রিত মুসলমানশত্রু রাজ্যে পদ্মার পূর্বকূল আক্রমণ করলে দশরথ প্রজাদের রক্ষা করেছিলেন, পাকামোড়া শাসনে এই রকমের একটা দাবি আছে মনে হয়। শাসনটি পান রাজমহিষী কন্দর্পদেবীর কাছ থেকে পরাশরগোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ রমাপতি। সেনরাজ সম্পর্কিত ঘটনাটি ১২৬০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী হতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
পট্টিকেরার রাজবংশ

ময়নামতী পাহাড়ের নিকটবর্তী পট্টিকেরক (পট্টিকের, পট্টিকেরা) নামক নগরে চন্দ্রবংশীয় লড়হচন্দ্র (আ ১০০০-২০ খ্রী) লড়হমাধবের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ঐ সময়েই ১০১৫ খ্রীস্টাব্দে অনুলিখিত এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা'র একখানি পাণ্ডুলিপিতে ষোড়শ-বাহু-বিশিষ্টা একটি বৌদ্ধ দেবীমূর্তি'র পরিচয়ে বলা আছে 'পট্টিকেরে চুন্দা-বরভবনে চুন্দা'। এ থেকে বোঝা যায় যে, ঐ মূর্তি পট্টিকেরনগরে অবস্থিত চুন্দামন্দিরে পূজিতা চুন্দাদেবী। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চন্দ্রবংশের পতনের পর পট্টিকেরা নগরীকে কেন্দ্র করে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মদেশীয় ঐতিহাসিক কাহিনীতে অনোরথ (১০৪০-৭৭ খ্রী), ক্যানজিৎথ (১০৮৬-১১১২ খ্রী) এবং অলৌঙ্গ সিথু (১১১২-৬৭ খ্রী) নামক রাজগণের বিবরণে তাঁদের রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত পতিকক্কর বা পতেইক্কর (অর্থাৎ পট্টিকের) রাজ্যের উল্লেখ আছে। রাজ্যটি ময়নামতী পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত ছিল।

এই রাজ্যের একজন মাত্র নরপতির রাজত্বকালীন একখানি তাম্রশাসন ময়নামতী পাহাড়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল। শাসনটি রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব নামক রাজার ১৭শ রাজ্যবর্ষে ১১৪১ শকে অর্থাৎ ১২২০ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত হয়। সুতরাং হরিকালের রাজত্বকাল ১২০৪-৩০ খ্রীস্টাব্দ মধ্যে নির্দেশ করা যায়। তাম্রশাসন অনুসারে হরিকালের প্রধানমন্ত্রী ধড়িএব পট্টিকেরানগরীতে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন।' ময়নামতী ও কুমিল্লার নিকটবর্তী বর্তমান পাইটকারা বা পাটিকারা পরগনা অবশ্যই পট্টিকেরারাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কখনও কখনও শাসনাদিতে ঐ অঞ্চলে 'দেব' স্থলে 'এব' নামান্ত দেখা যায়।

হরিকাল রণবঙ্কমল্লের শাসনের পরেই বোধ হয় ঐ অঞ্চলে বীরধরদেব (আ ১২৩০-৫০ খ্রী) রাজত্ব করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁর পঞ্চদশ রাজ্যবর্ষে উৎকীর্ণ ময়নামতী শাসন অনুসারে পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির সমতট-মণ্ডলান্তর্গত বাতগঙ্গা-বিষয়ের কোনও স্থান লড়হমাধব নামক বাসুদেবকে দান করেছিলেন। অতঃপর দেববংশীয় দামোদর কর্তৃক পট্টিকেররাজ্য ধ্বংস হয়েছিল বলে বোধ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীহট্টের রাজবংশ

শ্রীহট্ট শহরের প্রায় ২০ মাইল দূরবর্তী ভাটেরাগ্রামে প্রাপ্ত দুখানি তাম্রশাসন থেকে একটি রাজবংশের কথা জানা যায়। শাসন দুটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ। প্রথম শাসনটি 'রিপুরাজগোপীগোবিন্দ' উপাধিধারী কেশব-দেব কর্তৃক প্রদত্ত। শাসনের তারিখ রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাঠ করেছিলেন 'পাণ্ডব-কুলাধিপালাব্দ-সং ৪০২৮' এবং ঐ যুধিষ্ঠিরাব্দ নাকি = ১২৪৫ খ্রী; কিন্তু এই পাঠ ও ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, যদিও প্রত্নলিপিবিদ্যানুসারে লেখটি ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগের হতে পারে। আশ্চর্যের বিষয়, কিশোরীমোহন গুপ্ত তারিখটি পাঠ করেছেন ৪১৫১ বা ১০৪৯ খ্রীস্টাব্দ। এইরূপ তারিখের ধারণা অবশ্যই ভ্রান্ত। দ্বিতীয় তাম্রশাসনটি কেশবের পুত্র ঈশানের ১৭শ রাজ্যসংবৎসরে প্রদত্ত।

এই রাজগণের বংশক্রম নিম্নরূপ—(১) খরবাণ নবগীর্বাণ, (২) তৎপুত্র গোকুল, (৩) তৎপুত্র নারায়ণ, (৪) তৎপুত্র কেশব (আ ১২২০-৩০ খ্রী) এবং তৎপুত্র ঈশান (আ ১২৩০-৫০ খ্রী)। কিংবদন্তী অনুসারে, ১২৫৭ খ্রীস্টাব্দে ফকীর শাহ্ জলাল্ রাজা গৌরগোবিন্দ বা গোবিন্দসিংহকে দমন করে শ্রীহট্টে মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজা গৌরগোবিন্দ উল্লিখিত কেশবের বংশধর হাওয়া অসম্ভব নয়।

গত শতাব্দীতে আসামের তেজপুর শহরে ১১০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১১৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। শাসনের দাতা বল্লভদেব নামক জনৈক চন্দ্রবংশীয় রাজা। তিনি উদয়কর নিঃশঙ্কসিংহের পুত্র, রায়ারি-দেব ত্রৈলোক্যসিংহের পৌত্র এবং ভাস্করের প্রপৌত্র ছিলেন। রায়ারিকে বঙ্গরাজের হস্তিসেনা-বিজেতা বলা হয়েছে। বল্লভ দ্বাদশ শতকের শেষপাদে রাজত্ব করছিলেন; তাই তাঁর পিতামহ ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহাসনে আসীন ছিলেন বলে মনে করা যায়। সুতরাং তিনি ও তাঁর পুত্র পালবংশীয় মদনপালের (আ ১১৪০-৬১ খ্রী) সমসাময়িক। মদনপালের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেবের রাজঘাট অভিলেখে বলা হয়েছে যে, তিনি রায়ারিবংশীয় নরপতি

(সম্ভবতঃ রায়ারির পুত্র) ও কলিঙ্গপতির আক্রমণে গৌড় কিংবা গৌড়-বরেন্দ্র রাজ্য ধ্বংসমুখে গেলে তার পতন রোধ করেছিলেন।

এই রাজবংশ শ্রীহট্ট-অঞ্চলের অধিবাসী হতে পারে। কারণ কামরূপের রাজবংশ হলে রাজগণ আপনাদিগকে নরক-ভগদত্তের বংশধর বলে দাবি করতেন মনে হয়। দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে এই রাজারা অন্ততঃ সাময়িকভাবে কামরূপ-অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন ; কারণ শাসনে উল্লিখিত দুটি গ্রামের কোঞ্চী (আধুনিক 'কুচি') নামান্ত থেকে সেগুলি কামরূপ কিংবা তার নিকটে অবস্থিত ছিল বলে বোধহয়। যাই হোক, এই প্রাচীন চন্দ্রবংশীয়দের সঙ্গে পরবর্তী চন্দ্রবংশের ঈশানদেব প্রভৃতির কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা, তা বলা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঢেক্করীর নাগ-ঘোষ বংশ

দিনাজপুর জেলার রামগঞ্জে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন 'পরাক্রমমল্ল' উপাধিধারী ঈশ্বরঘোষ (আ ১০৪০-৮০ খ্রী) ঢেক্করী থেকে জটোদা নদীতে স্নান করে প্রদান করেছিলেন। শাসনটি তাঁর ৩৫শ রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত। কিন্তু তিনি সামন্তসুলভ 'মহামাণ্ডলিক' উপাধি ভোগ করতেন এবং সম্ভবতঃ পালবংশের দুর্দিনে বরেন্দ্রে কৈবর্ত-অধিকার কালে শাসনটি দান করেছিলেন। তাঁর রাজ্য বর্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চলে, উত্তরবাংলার জলপাইগুড়ি-কোচবিহার অঞ্চলে অথবা আসামের কামরূপ-গোয়ালপাড়া অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে অনুমিত হয়েছে। দানগ্রাম ছিল পিয়োল্ল-মণ্ডলস্থিত গাল্লিটিপ্যক-বিষয়ান্তর্গত দিগঘা-সোদিকা এবং গ্রহীতা ছিলেন ভার্গব-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ভট্ট-নিবোক শর্মা।

ঈশ্বরঘোষ ধবলঘোষের পুত্র, বালঘোষের পৌত্র এবং ধূর্তঘোষের প্রপৌত্র ছিলেন। এই ঘোষ-বংশটিকে নাগান্বয় বলা হয়েছে। কিন্তু অনেকেই 'নাগান্বয়' কথাটি শুদ্ধরূপে পাঠ করতে পারেন নি।

চতুর্থ অধ্যায়

বিহারের কয়েকটি রাজবংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পীঠীর সিন্দ-ছিক্কোর ও সেন-আচার্য বংশ

'পীঠী'র অর্থ পীঠ বা পীঠিকা। পীঠীপতি রাজগণের শাসনকেন্দ্র ছিল ভগবান বুদ্ধের তপস্যার পীঠ বা বজ্রাসন দ্বারা বিশেষীকৃত বোধগয়া। উত্তর-কালীন পালরাজগণের আমলে প্রথমে গয়া ও পরে বোধগয়া বা বৌদ্ধগয়াতে দুটি রাজবংশ রাজত্ব করত। সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত'-এ 'পীঠীপতি'র অর্থ করা হয়েছে 'মগধরাজ'।

বোধগয়ার রাজবংশটি কর্ণাটদেশের সিন্দ-কুলের ছিক্কোরশাখা-সম্ভূত। এই বংশের পীঠীপতি দেবরক্ষিত পালবংশীয় রামপালের (১০৭২-১১২৬ খ্রী) মাতুল কর্ণাটদেশীয় মথন বা মহণের কন্যাকে বিবাহ করেন। দেবরক্ষিতের কন্যা কুমারদেবী (আসলে দ্রাবিড়ভাষার 'কুমরদেবী') গাহড়বালবংশীয় নরপতি গোবিন্দচন্দ্রের (আ ১১১৪-৫৫ খ্রী) মহিষী ছিলেন। দেবরক্ষিতের পরবর্তী পীঠীপতি ভীমযশা রামপালের সামন্তরূপে বরেন্দ্রীর কৈবর্তরাজ ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। 'সিন্দ' নামটিকে কখনও বা সংস্কৃত করে 'সিদ্ধ' বলা হত। উড়িষ্যার ভৌম-কর বংশীয়া কোনও রাজ্ঞীকে 'সিন্দগোরী' অর্থাৎ সিন্দবংশের মেয়ে বলা হয়েছে।

পরে পীঠীপতিত্ব এই রাজগণের গুরুবংশের হস্তগত হয় বলে মনে করা যায়। কারণ পরবর্তী পীঠীপতিগণ 'আচার্য' উপাধিকারী বৌদ্ধসাধু ছিলেন। আধুনিক কালের বোধগয়ার শৈব মহন্ত এই বৌদ্ধ আচার্যদের উত্তরপুরুষ।

মদনপালের (আ ১১৪৩-৬১ খ্রী) সময়ের একটি শিলালেখে মুঙ্গের জেলার কিউল-অঞ্চলে তাঁর সামন্ত পীঠীপতি আচার্য দেবসেনের প্রভুত্ব স্বীকৃত হত। তিব্বতীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ধর্মস্বামী ভারতে এসে দু-বৎসর (১২৩৪-৩৬ খ্রী) বিহারে ছিলেন। গয়ার রাজা পীঠীপতি বুদ্ধসেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। গয়া-অঞ্চলে পীঠীপতি আচার্য বুদ্ধসেনের অভিলেখ পাওয়া গিয়েছে। তাতে

দেখা যায়, কামদেশের (কুমায়ুনের) রাজা অশোকচল্ল বা অশোকবল্ল তাঁর সময়ে বোধগয়াতে বাস করছিলেন। বুদ্ধ-নির্বাণাব্দের ১৮১৩ বর্ষের একটি গয়া অভিলেখে এই রাজার উল্লেখ আছে। বোধগয়াতে সিংহলীয় বৌদ্ধদের প্রাধান্য থেকে এই অব্দকে সিংহলীয় বুদ্ধ-নির্বাণসংবৎ বলে বুঝতে হবে—৫৪৪ খ্রীস্টাব্দে যার আরম্ভ। সুতরাং অভিলেখটির তারিখ ১২৭০ খ্রীস্টাব্দ। আবার বোধগয়ায় প্রাপ্ত অশোকবল্লের অপর দুটি অভিলেখের তারিখ লক্ষ্মণসেনের অতীত-রাজ্য-সংবৎসর ৫১ এবং ৭৪। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ আনুমানিক ১১৭৯ খ্রীস্টাব্দ; সুতরাং ঐ দুটি তারিখ আ ১২৩০ এবং ১২৫৩ খ্রীস্টাব্দ। এতে দেখা যায়, অল্প-বয়সে রাজ্য হারিয়ে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত অশোকবল্ল সুদীর্ঘকাল (অন্ততঃ ১২৩০-৭০ খ্রী) গয়াতে বাস করেছিলেন। পীঠীপতি আচার্য বুদ্ধসেনের পুত্র (অর্থাৎ শিষ্য) এবং উত্তরাধিকারী পীঠীপতি আচার্য জয়সেনের জানীবিঘা অভিলেখের তারিখ লক্ষ্মণসেনের অতীত-রাজ্যসংবৎসর ৮৩ অর্থাৎ ১২৬২ খ্রী। এথেকে আনুমানিক-ভাবে বুদ্ধসেন ও জয়সেনের পীঠীপতিত্ব যথাক্রমে ১২১৫-৪০ খ্রী এবং ১২৪০-৬৫ খ্রী নির্দেশ করা যেতে পারে।

—দেখা যাচ্ছে, বিহারে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত স্থানীয় রাজগণের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। সিংহনাগাবাসী ভদন্ত জয়-সেনকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জম্ভলমূর্তিতে মহারাজ পূর্ণবিক্রমের নাম আছে। ঐ মূর্তিতে উৎকীর্ণ অভিলেখের তারিখ বোধ হয় গৌড়রাজের নূতন সংবতের (সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ-সংবতের) ৭০ বর্ষ (১২৪৯ খ্রী)। মূর্তিটি বিহারেই কোথাও পাওয়া গিয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গয়া ও জয়পুরের রাজবংশ

ব্রাহ্মণবংশীয় শূদ্রকের বংশজাত বিশ্বরূপ বা বিশ্বাদিত্য তৃতীয় বিগ্রহপালের (আ ১০৪৩-৭০ খ্রী) সামন্ত হিসাবে গয়ায় রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র যক্ষপালের একটিমাত্র অভিলেখ পাওয়া গিয়েছে, তাতে পালসম্রাটের নাম উল্লিখিত হয় নি। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তিনি অবশ্যই ক্ষুদ্র স্থানীয় নরপতিমাত্র। তাছাড়া তৃতীয় বিগ্রহপালের ১৯শ বর্ষের কুর্কীহার মূর্তিলেখদ্বয় এবং ২৪শ বর্ষের নৌলাগড় লেখ এবং রামপালের তৃতীয় বর্ষের বিহার মূর্তিলেখ থেকে বোঝা যায় যে, বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর বাংলায় যে বিপ্লবের ফলে দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন, তাতে বিহারের উপর পালেদের প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নি।

তাছাড়া, গয়ার ব্রাহ্মণরাজারা পালসম্রাটের সামন্ত পীঠীপতি উপাধিধারী মগধরাজাদের অধীন ছিলেন, তাতে সন্দেহ হতে পারে না। সুতরাং যক্ষপালের অভিলেখে পালবংশীয় প্রভুর অনুল্লেখ থেকে এই ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের জন্য বিহারে পালপ্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা নিতান্তই অযৌক্তিক।

বিহারের দারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত পঞ্চোভগ্রামে দ্বাদশ শতকের অক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে মধ্যযুগের প্রথম ভাগের গুপ্তবংশীয় কয়েকজন নরপতির নাম জানা যায়—১. যজ্ঞেশ-(জয়), ২. তৎপুত্র দামোদর(চামুণ্ড), ৩. তৎপুত্র ভিগদেবগুপ্ত, ৪. তৎপুত্র রাজাদিত্যগুপ্ত, এবং ৫. তাঁর পৌত্র(?) সংগ্রামগুপ্ত। জয়পুর থেকে সংগ্রামগুপ্তের তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। সংগ্রামের পিতা ছিলেন রাজপুত্র কৃষ্ণগুপ্ত।

শাসনটির দাতা সংগ্রামগুপ্ত প্রকৃতপক্ষে জনৈক 'মহামাণ্ডলিক' অর্থাৎ কোনও স্বাধীন নরপতির সামন্ত ছিলেন। কিন্তু সামন্তরাজোচিত মহামাণ্ডলিক উপাধির সঙ্গে তিনি স্বাধীন নরপতিসুলভ পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর উপাধিও ব্যবহার করেছেন। এ থেকে মনে হয়, এঁরা হয়তো শেষদিকের কোনও দুর্বল পালরাজের স্বাধীনতা-প্রয়াসী সামন্ত ছিলেন। এই বংশের রাজগণ আপনা-

দিগকে পরমমাহেশ্বর ও বৃষধ্বজ বলতেন। তাঁদের বংশকে সোমান্বয় বা চন্দ্রবংশ এবং রাজগণকে অর্জুনের বংশধর বলা হয়েছে। এই অর্জুন হৈহয়কুলের কার্তবীর্য অর্জুন বলে মনে হয়। কলচুরিরাজগণ কার্তবীর্য অর্জুনের বংশধরত্ব দাবি করতেন। এ গুপ্তেরা কোনও প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের সঙ্গে সম্পর্ক কল্পনা করেন নি। কিন্তু তাঁদের প্রসঙ্গে তীর-ভুক্তির অষ্টমশতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজা রামগুপ্ত ও তৎপুত্র জীবগুপ্তের কথা আমাদের স্বভাবতঃই মনে পড়ে।

সংগ্রামগুপ্তের রাজধানী জয়পুর কোথায় ছিল, তা ঠিক জানা যায় না। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, স্থানটি মুঙ্গের জেলার কিউল-লক্ষ্মীসরায়ের নিকটবর্তী জয়নগর হতে পারে। তাম্রশাসনটির দ্বারা জনৈক কোলাঞ্চদেশীয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হয়েছিল। বিহারের মধ্যযুগীয় সমাজজীবনে কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের মর্যাদার বিষয় আমরা কৌলীন্যের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

পরিশিষ্ট

চন্দ্র ও পাল-বংশীয় রাজগণের ধর্মমত

১

দক্ষিণপূর্ব বাংলার চন্দ্রবংশ এবং বাংলা ও বিহারের পালবংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। এই দুই রাজবংশের সীলমোহরে প্রাচীন মৃগদাবে (অর্থাৎ বর্তমান সারনাথে) ভগবান্ বুদ্ধের ধর্মচক্র-প্রবর্তন বা সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচারের দ্যোতক দুটি মৃগের মধ্যবর্তী চক্রচিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায়। আবার রাজাদের সাধারণতঃ 'পরমসৌগত' অর্থাৎ সুগত বা বুদ্ধের পরমভক্ত বলা হয়েছে। তাঁদের শাসনগুলিও সাধারণতঃ ভগবান্ বুদ্ধভট্টারককে উদ্দেশ করে প্রদত্ত হত।

কিন্তু চন্দ্রবংশের লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র নামক শেষ নরপতিদ্বয় বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। ঐ দুজনের মধ্যে লড়হচন্দ্র বৈষ্ণব এবং গোবিন্দচন্দ্র শৈব ছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে বিষ্ণুভট্টারক এবং শিবভট্টারককে উদ্দেশ করে শাসন দান করতেন। অবশ্য গতানুগতিকভাবে শাসনে তাঁদের 'পরমসৌগত' বলা হয়েছে; কিন্তু লড়হচন্দ্র স্বনাম-অনুসারে লড়হমাধবসংজ্ঞক বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তদুদ্দেশে ভূমিদান করেন এবং গোবিন্দচন্দ্র তদীয় উপাস্য নটেশ্বর নামক নটরাজ শিবের উদ্দেশে শাসনদান করেছিলেন। আবার লড়হচন্দ্র বারাণসী ও প্রয়াগতীর্থে গিয়ে পিতৃপুরুষের তর্পন করেছিলেন। এ দুটিই হিন্দুতীর্থ। এতদুপলক্ষ্যে তিনি বারাণসীর বৌদ্ধতীর্থ মৃগদাবের নাম উল্লেখ করেন নি। এই নৃপদ্বয়ের শাসনের প্রশস্তি-অংশে অনেক হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ ও পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিত আছে; কিন্তু বৌদ্ধ দেবদেবীর উল্লেখ এবং কাহিনীর ইঙ্গিত নেই বললেই চলে।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধ সাধু বিপুলশ্রীমিত্র তাঁর নালন্দা শিলালেখে তাঁর গুরুবংশীয় উর্ধ্বতন চতুর্থপুরুষের মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে বঙ্গাল সৈন্য কর্তৃক সোমপুরে গৃহদাহের কথা বলেছেন। ঘটনাটি তাঁর শতবর্ষ পূর্বের হতে পারে। তবে এটা সোমপুরবিহারের উপর চন্দ্র কি বর্মা সেনার আক্রমণ, তা বলা যায় না। অবৌদ্ধ বর্মাদের আক্রমণই বেশী সম্ভব।

পালবংশীয় রাজগণের মধ্যে নারায়ণপাল, তাঁর বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রথম মহীপাল এবং মহীপাল-পুত্র নয়পাল বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লক্ষ্য করেছেন যে, পালেরা বর্ণাশ্রমে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং হিন্দুদেবতা ও ব্রাহ্মণদের ভূমিদানে দ্বিধা করতেন না। রাজমহিষীকে 'মহাভারত' পাঠ করে শোনাবার দক্ষিণাস্বরূপ জনৈক ব্রাহ্মণ মদনপালের কাছ থেকে ভূমিদান লাভ করেছিলেন। তাই পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন যে, পাল-আমলে পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। অবশ্য দেবতা-ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের যুক্তিটি মূল্যবান নয়; কারণ রাজশাসনে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুণ্যার্থী ব্যক্তিরা দেবতা-ব্রাহ্মণের উদ্দেশে নিষ্কর ভূমিদানের জন্য রাজকোষে যথোপযুক্ত অর্থ জমা দিয়ে শাসন করিয়ে নিত। শাসনদাতা রাজা পেতেন রাজস্বের বিনিময়ে কিছু অর্থ এবং আসল পুণ্য-প্রত্যাশীদের ভূমিদান-পুণ্যের এক-ষষ্ঠাংশ। রাজমহিষীদের ধর্ম তাঁদের স্বামীর ধর্ম হতে ভিন্ন থাকা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বিষয় নয়। গাহড়বাল-বংশীয় হিন্দুরাজা গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী কুম(মা)রদেবী বৌদ্ধ ছিলেন।

নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসন শতবর্ষ পূর্বে আবিষ্কৃত হয়। শাসনটিতে রাজাকে 'পরমসৌগত' বলা হয় নি এবং তিনি বুদ্ধের পরিবর্তে শিব-ভট্টারককে উদ্দেশ করে তীর-ভুক্তির অন্তঃপাতী কক্ষ-বিষয়ের মুকুতিকাগ্রাম দান করেছিলেন। শাসনে বলা হলেছে যে, নারায়ণপাল কলশপোতগ্রামে এক বিশাল সহস্রায়তন মন্দির নির্মাণপূর্বক তন্মধ্যে ভগবান্ শিবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ঐ দেবতা ও মন্দিরের পরিচালক পাশুপত আচার্য-পরিষদের উদ্দেশে গ্রামটি দান করেছিলেন। প্রদত্ত গ্রামের আয় থেকে দেবতার পূজা ইত্যাদি, দেবমন্দিরাদির সংস্কারকার্য এবং শৈব সাধুদের ভোজন, ঔষধপত্র প্রভৃতির ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ভাগলপুর তাম্রশাসন থেকে মনে হয়, নারায়ণপাল শৈবধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। সম্প্রতি বাণগড়ে আবিষ্কৃত মূর্তিশিবের প্রশস্তি প্রথম মহীপাল ও নয়পালের ধর্মমতের উপর আলোকপাত করেছে। ঐই প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, দশম শতাব্দীতে গোলগী বা গোলকী নামক একটি শৈবমঠ ছিল। তাতে দুর্বাসা সম্প্রদায়ের আচার্য ছিলেন বিদ্যাশিব; তাঁর শিষ্য ধর্মশিব এবং ধর্মশিবের শিষ্য ইন্দ্রশিব। এই ইন্দ্রশিব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রথম মহীপাল একটি সুবিশাল মঠ তাঁকে দান করেছিলেন। এই মঠটিতে ছিল শিবাধ্যুষিত

ভবানীর মন্দির এবং ৫টি সম্ভবতঃ বাণগড়ে নির্মিত হয়েছিল। এতে মহীপালের শৈব ও শাক্ত ধর্মানুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর তাম্রশাসনগুলিতে তাঁকে পরমসৌগত এবং বুদ্ধ-ভট্টারকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলা হয়েছে। তবে সেগুলি তাঁর অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী দীর্ঘ রাজত্বের প্রথম দিকে প্রদত্ত হয়েছিল। সুতরাং তিনি শেষজীবনে শৈব-শাক্ত ধর্মে আকৃষ্ট হতে পারেন। ১০২৬ খ্রীস্টাব্দের সারনাথ মূর্তিলেখ অনুসারে মহীপাল বারাণসীর কঠোরপন্থী পাশুপত গুরব (শৈবাচার্য বা পুরোহিত) বামরাশির একজন ভক্ত ছিলেন।

ইন্দ্রশিবের শিষ্য ছিলেন সর্বশিব। তাঁর সম্বন্ধে প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, রাজা নয়পাল তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। আবার বৃদ্ধ বয়সে সর্বশিব গৌড়রাজের গুরু-গিরির দায়িত্ব নিজের ভ্রাতা ও শিষ্য মূর্তিশিবের উপর ন্যস্ত করে স্বয়ং তপস্যার্থ বন-গমন করেন। সুতরাং নয়পাল প্রথমে সর্বশিবের শিষ্য এবং পরে মূর্তিশিবের শিষ্যস্থানীয় হয়েছিলেন। পরিশেষে অভিলেখটিতে বলা হয়েছে যে, সর্বশিবের শিষ্য এবং মূর্তিশিবের সুহৃদ রূপশিব নামক শৈবাচার্য মূর্তিশিবের মূর্তিনির্মাণ ও প্রশস্তিটি রচনা করিয়েছিলেন। এদুটি অবশ্যই মন্দিরে স্থান পেয়েছিল।

উপরের আলোচনা পাঠ করে কারও মনে হতে পারে, আদি-মধ্য যুগের ভারতবর্ষে ধর্মবিষয়ক উদারতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সেজন্য একই ব্যক্তিকে অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন-ধর্মাবলম্বী রূপে বর্ণনা করা সম্ভব হত। বাংলার সেন-বংশের ইতিহাস আলোচনায় কেউ কেউ এই ধরণের মতবাদ ব্যক্তও করেছেন। তবে সেটা অবশ্যই ভ্রান্ত ধারণা। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই বংশের একাধিক নরপতিকে একই সঙ্গে বিভিন্ন দেবতার ভক্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, পুষ্যভূতি বংশে প্রভাকরবর্ধন ছিলেন পরমাদিত্য-ভক্ত; কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন পরমসৌগত এবং কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্ধন পরমমাহেশ্বর ছিলেন। গুর্জর-প্রতিহার বংশে দেবশক্তি ভক্ত ছিলেন বিষ্ণুর; তৎপুত্র বৎসরাজ মহেশ্বরের; তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট ভগবতীর; তদীয় পুত্র রামভদ্র সূর্যের এবং তৎপুত্র প্রথম ভোজ ভগবতীর। সেনবংশে বিজয়সেন ও বল্লাল ছিলেন

বাণগড় প্রশস্তি থেকে জানা গেল যে, খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে অনুগ্রপন্থী শৈবাচার্যগণের অসমান্য প্রভাব ছিল। নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে (বিশেষতঃ বর্তমান মধ্যপ্রদেশে) শৈবসাধনার ক্ষেত্রে মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের শৈবাচার্যগণ অসীম-প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁরা কাপালিক, কালামুখ প্রভৃতি পাশুপত সম্প্রদায় অপেক্ষা অনুগ্রপন্থী ছিলেন। তাঁদের নামান্তে 'শিব' বা 'শম্ভু' শব্দ ব্যবহৃত হত; উগ্রপন্থীদের মত তাঁদের 'রাশি', 'শক্তি' বা 'জীয়' নামান্ত হত না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-রাঢ়ের পূর্বগ্রামবাসী শৈবাচার্য বিশ্বেশ্বরশম্ভু বা বিশ্বেশ্বরশিব কাকতীয় গণপতি (১১৯৯-১২৬১ খ্রী) এবং অন্যান্য অনেক রাজার দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং গণপতির দাক্ষিণ্যে বর্তমান আন্ধ্রপ্রদেশের গুণ্টুর জেলায় কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ-তীরবর্তী মল্কাপুরম্ গ্রামে বিস্তৃত ভূখণ্ড লাভ করে বিশ্বেশ্বর-গোলকী নামক বিশাল শৈবমঠ স্থাপন করেছিলেন। এই মঠে নানাশাস্ত্র পড়াবার বিদ্যালয় এবং প্রসূতিশালা, আরোগ্যশালা প্রমুখ অগণিত প্রতিষ্ঠানে বহু ছাত্র, শিক্ষক, বৈদ্য, কর্মচারী প্রভৃতি প্রতিপালিত হত। কিন্তু শৈবসাধু বিশ্বেশ্বর জন্মভূমির সংগে সম্পর্ক রেখেছিলেন। তিনি তার স্বগ্রামের কতকগুলি শ্রীবৎস-গোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণকে তাঁর মঠের নিকট ৩০০ পুট্টিকা (প্রায় ২৪০০ একর) ভূমিতে বসিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা মঠের সম্পত্তির ও অন্যান্য আয়ব্যয়ের হিসাব রাখতেন এবং সে কার্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ আরও ১৫০ পুট্টি জমি ভোগ করতেন। কোনও ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে যদি তাঁর স্ত্রী হিসাব-রক্ষার দায়িত্ব নিতেন, তবে তিনি স্বামীর ন্যায় পারিশ্রমিক ভোগ করতেন।

এখানে বলা উচিত যে, বিশ্বেশ্বরশিব জবলপুর অঞ্চলের গোলকীমঠের সংগে সংযুক্ত ছিলেন; বাণগড় মঠের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। এর কারণ এই যে, তাঁর সময়ের পূর্বেই বাণগড় (দেওকোট) তুর্কী মুসলমানদের একটি প্রধান শাসনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তখন সেখানে গোলগী (গোলকী) মঠের অস্তিত্ব ছিল কিনা, তা জানা যায় না।

২

পালযুগে কৌলীন্য-প্রথার উৎপত্তি

বাংলাদেশের কুলজী, কুলপঞ্জী বা কুলপাঞ্জিকা সংজ্ঞক গ্রন্থাবলীর কাহিনীতে কৌলীন্যের উৎপত্তির সঙ্গে দুজন প্রাচীন নরপতির নাম যুক্ত দেখা যায়। এই নরপতিদ্বয়—আদিশূর ও বল্লালসেন। অনুরূপ ভাবে মিথিলা বা উত্তর-বিহারের কিংবদন্তী অনুসারে সে দেশের কর্ণাটবংশীয় অন্তিম রাজা হরিসিংহ বা হরসিংহ সেখানে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করেছিলেন।

বাংলাদেশে কৌলীন্য মূলতঃ এবং প্রধানতঃ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজকে প্রভাবিত করে। এই সমাজদুটির নাম দক্ষিণপশ্চিম বাংলার রাঢ়দেশ এবং উত্তরবাংলার বরেন্দ্রদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। ধীরে ধীরে কৌলীন্যপ্রথার প্রভাব বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সামাজিক ব্যবস্থায় বিস্তৃত হয়েছিল। মিথিলার কৌলীন্য প্রথার ইতিহাসও অনুরূপ। মধ্যযুগে মিথিলা এবং বাংলার সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে একটা যোগসূত্র ছিল, তার প্রমাণ আছে। বাঙালী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের গাঙ্গুলী (গঙ্গোপাধ্যায়) গাঞি মৈথিল ব্রাহ্মণদের গঙ্গৌলী মূলগ্রামের সহিত অভিন্ন। 'গাঞি' শব্দ সংস্কৃত 'গ্রামী' (অর্থাৎ গ্রামবাসী বা গ্রামভোক্তা) শব্দের বিকার। এটা পরিবারবিশেষের মূল-বাসস্থানের দ্যোতক।

কৌলীন্য প্রথার প্রভাব বাংলার সমাজব্যবস্থায়—বিশেষতঃ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর কুফল আজ বাঙালীর অতীত সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেও এর প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি এবং আজও যে গ্রামাঞ্চলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় এবং বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র কিঞ্চিৎ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী, এটা কৌলীন্য প্রথারই চিহ্নাবশেষ।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রদের কৌলীন্যপ্রথা মোটামুটি একরূপ। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা কুলীন, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সাধ্যশ্রোত্রিয় এবং কষ্ট বা কাষ্ঠ-

শ্রোত্রিয়—এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। নিয়ম ছিল যে, কুলীনের পুত্র কুলীন, সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয় বংশে বিবাহ করতে পারবে; সিদ্ধশ্রোত্রিয়ের পুত্র সিদ্ধ ও সাধ্যশ্রোত্রিয় কুলের কন্যা বিবাহ করবে; কিন্তু সাধ্য ও কষ্ট শ্রোত্রিয় আপন শ্রেণীর বাইরে বিবাহ করতে পারবে না। স্ত্রীলোকের বেলায় ব্যবস্থা ছিল এর বিপরীত। সাধ্যশ্রোত্রিয় কন্যার বিবাহ সাধ্য ও সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় এবং কুলীন বংশে হতে পারত: সিদ্ধশ্রোত্রিয়ের দুহিতা সিদ্ধশ্রোত্রিয় ও কুলীন শ্রেণীতে বিবাহিত হত; কিন্তু কুলীন ও কাষ্ঠশ্রোত্রিয় কন্যার বিবাহ নিজ-নিজ শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ ছিল। এর অন্যথা হলে সমাজে নিন্দিত কিংবা পতিত হতে হত। এই কুব্যবস্থার ফলে মেয়েদের বিবাহ কঠিন হল এবং কুলীন সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত হল। কুলীন ব্রাহ্মণেরা অনেকে শতাধিক বিবাহ করতেন এবং বৎসরে একবার করে বিভিন্ন শ্বশুরগৃহে পদার্পণপূর্বক যথাসম্ভব অর্থ আদায় করতেন; ঐ অর্থেই তাঁদের অনেকের জীবিকানির্বাহ হত। ঊনবিংশতাব্দীর প্রথম ভাগে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বজ্রযোগিনী গ্রামবাসী কৃষ্ণসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নীসংখ্যা ছিল ২৮৪টি। ঐ শতাব্দীর শেষভাগের দুজন কুলীন ব্রাহ্মণের বিবরণে জানা যায় যে, তাঁদের মধ্যে একজনের পত্নীসংখ্যা ছিল ৬০ এবং অপর জন শতাধিক হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণদ্বয়ের একটি করে খাতা ছিল, তাতে তাঁরা কোন্ কোন্ গ্রামে কার কন্যা বিবাহ করেছিলেন, তা লেখা ছিল। প্রতি বৎসর শীতকালে তাঁরা ঐ খাতা নিয়ে প্রত্যেক স্ত্রীকে দর্শন দিতেন এবং শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা অনুসারে অর্থ আদায় করতেন। আবার অনেক কুলীন স্বামী কদাচিৎ বিভিন্ন স্ত্রীকে দর্শন দিতেন। এসবের ফলে সমাজে নানা রকমের দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। কথিত আছে যে, জনৈক কুলীন নিজ শ্বশুরের নাম-সাদৃশ্যবশতঃ ভুল করে জামাতারূপে এক ব্রাহ্মণের গৃহে উঠেছিলেন এবং কয়েকদিন পরে ঐ ব্রাহ্মণের প্রকৃত জামাতার আবির্ভাবে ভুলটি ধরা পড়ে। এইরকম কেলেঙ্কারীর কাহিনী অগণিত। এ জাতীয় একটি কাহিনীর ভিত্তিতেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

কুলজীর কাহিনী অনুসারে বঙ্গদেশে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাব হেতু আদিশূর নামক রাজা যজ্ঞ-সম্পাদনের জন্য বর্তমান উত্তরপ্রদেশের কান্যকুব্জ কিংবা কোলাঞ্চ থেকে ৫ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করেছিলেন। বলা হয়েছে

যে, এই পঞ্চব্রাহ্মণই বর্তমান রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ এবং তাঁদের পাদুকা ও ছত্র-বাহী ৫ জন কায়স্থজাতীয় ভৃত্যের ৪ জনের বংশধরগণই পরে কুলীন কায়স্থ রূপে পরিগণিত হন। বাংলাদেশের স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা সপ্তশতী বা সাতশতী নামে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য পরে তাঁরা সকলেই বোধহয় আপনাদিগকে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বলে পরিচয় দিয়ে ঐ-ঐ সমাজে মিশে যেতে সমর্থ হয়েছেন।

আদিশূর কর্তৃক রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রদের আদিপুরুষগণের বাংলাদেশে আনয়নের কাহিনী ঐতিহাসিকসমাজে গৃহীত হয় নি। তার কারণ এই যে, বিভিন্ন কুলজীগ্রন্থে তাঁর বংশপরিচয় এক নয়। কোথাও বা তাঁকে বলা হয়েছে বল্লালসেনের মাতামহ ; আবার কোথাও দেখা যায়, তিনি বল্লালের জনৈক বহু প্রাচীন পূর্বপুরুষ। কোথাও তিনি বাংলা ও উড়িষ্যার রাজা ; আবার কোথাও অঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, কামরূপ, সৌরাষ্ট্র, মগধ এবং গুর্জরদেশও তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত। কোথাও দেখি, আদিশূর কান্যকুব্জরাজের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং সহজভাবেই শ্বশুরের রাজ্য থেকে ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্ভব হয়। আবার কোথাও দেখি, তিনি এর জন্য কান্যকুব্জপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। কোনও বিবরণে তাঁর রাজধানী ছিল গৌড়, কিন্তু অন্যত্র আছে বিক্রমপুর। যে অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণদের আনা হয়েছিল, বিভিন্ন কুলজীতে তার ছটি ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখা যায়। একটি বিবরণে কান্যকুব্জরাজের পরিবর্তে কাশীরাজের কথা বলা হয়েছে। আদিশূর নাকি তাঁর কাছে কর দাবি করেন এবং তদুত্তরে কাশীরাজ আদিশূরের রাজ্যে পণ্ডিতব্রাহ্মণ ও বৈদিক-যাগযজ্ঞের অভাবের উল্লেখ করে ব্যঙ্গ করেন। ফলে আদিশূর কাশী-রাজ্য জয় করে সেখান থেকে ৫ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেছিলেন। বিভিন্ন কুলজীতে আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের তারিখ ৬৫৪, ৬৭৫, ৮০৪, ৮৫৪, ৮৬৪, ৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪ এবং ৯৯৯ শক-বৎসর দেখা যায়। ৫ জন ব্রাহ্মণের নামেরও তিনটি বিভিন্ন তালিকা দেওয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে আরও কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে আদিশূর নামক কোনও নরপতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কিন্তু নবম শতাব্দীর মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্র তদীয় সমসাময়িক জনৈক আদিশূর নামক রাজার উল্লেখ করেছেন। এই আদিশূর সম্ভবতঃ পালরাজা-দের সামন্তরূপে বিহার ও বাংলার উত্তরাঞ্চলের কিয়দংশ শাসন করতেন।

পালেরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলেই হয়তো ব্রাহ্মণ লেখকের রচনায় এঁকে কিছু প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আবার এই আদিশূরের কোনও কীর্তির জন্য তাঁর নাম পূর্বভারতে পণ্ডিতব্রাহ্মণ-আনয়নের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এই অনুমানে কিছুমাত্র সত্য থাকলেও মৈথিলী কৌলীন্যপ্রথার কাছে বাংলার ঋণ স্বীকার করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আদিশূরের কাহিনীতে শকাব্দের উল্লেখ থেকে বোধ হয় যে, কাহিনীটি সেন-আমলে বাংলাদেশে শকাব্দের ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে কল্পিত হয়েছিল। তৃতীয়তঃ, চোলরাজ তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের (আ ১১৭৮-১২১৬ খ্রী) সময়ের একখানি শিলালেখ পাঠে মনে হয় যে, কাহিনীটি মূলতঃ দক্ষিণভারত থেকে সেনরাজগণের সময়ে বাংলাদেশে আনীত হয়েছিল। সেনেরা কর্ণাটদেশ থেকে এসে বাংলায় উপনিবিষ্ট হন। বিদেশে স্বদেশীয় রাজবংশের প্রসাদলোভী অনেকে সে সময় দক্ষিণভারত থেকে বাংলায় এসে বাসস্থাপন করেছিল বলে বোঝা যায়। অবশ্য বাংলায় দক্ষিণভারতীয়দের উপনিবেশ-স্থাপন পাল-আমলেই আরম্ভ হয়। পালরাজগণের মধ্যে অনেকে দক্ষিণী রাজবংশের কন্যা বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের প্রসাদভোজীদের মধ্যে কর্ণাট এবং চোলজাতির উল্লেখ আছে। সুতরাং আদি-মধ্য যুগে একটি দক্ষিণ-ভারতীয় কিংবদন্তীর বাংলায় প্রবেশ খুব সম্ভব বলে মনে হয়। ৩য় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

উপরে যে চোল শিলালেখের উল্লেখ করেছি, তাতে বলা হয়েছে যে, অরিন্দম নামক একজন প্রাচীন চোল নরপতি অন্তর্বেদি (গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্তী কান্যকুব্জ অঞ্চল) থেকে অনেক পণ্ডিতব্রাহ্মণ আনিয়ে চোলদেশে স্থাপন করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁদের পাদুকা ও ছত্র-বাহী যে ভৃত্যগণ দক্ষিণে গিয়েছিল, তারা বর্তমান তিরুচিরাপল্লী জেলায় পাঁচটি গ্রাম লাভ করে এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। অরিন্দম এবং আদিশূরের কাহিনীতে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। আমাদের সন্দেহ এই যে, সেন-আমলে অরিন্দমের কাহিনী বাংলায় প্রবেশ করে কয়েক শতাব্দী পরে কুলজীতে আদিশূরের কাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যে সকল কুলজীগ্রন্থে আদিশূরের কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলি চোলরাজের অভিলেখটির কয়েক শতাব্দী পরবর্তী।

আদিশূর কর্তৃক যে পাঁচজন পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ বাংলায় আনীত হয়েছিলেন বলে কথিত আছে, কুলজীগ্রন্থে তাঁদের নামের নিম্নলিখিত তিনটি

স্বতন্ত্র তালিকা পাওয়া যায়।—(১) শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ, ভারদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথি বা তিথিমেধা, কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগ, বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধি এবং সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি। (২) শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ, বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড়, ভারদ্বাজগোত্রীয় দক্ষ এবং সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ। (৩) শাণ্ডিল্যগোত্রীয় নারায়ণ, বাৎস্যগোত্রীর ধরাধর, কাশ্যপ-গোত্রীয় সুষেণ, ভারদ্বাজগোত্রীয় গৌতম এবং সাবর্ণগোত্রীয় পরাশর। এ ছাড়াও বৈষম্য আছে। যেমন বেদগর্ভকে কোথাও বা বাৎস্যগোত্রীয় বলা হয়েছে। যা হোক, কুলজীর কিংবদন্তী অনুসারে ঐ পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বংশধরগণ সেনবংশীয় বল্লালের নিকট কৌলীন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ৫৬টি গাঞি-মধ্যে বল্লাল ১৯ ব্যক্তিকে কৌলীন্য দেন; আর বারেন্দ্রদের ১০০ গাঞি-মধ্যে ৮ জন কুলীন, ৮ জন সৎ-শ্রোত্রিয় ও ৮৪ জন কষ্ট-শ্রোত্রিয় বলে নির্দিষ্ট হন। বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণসেন নাকি কুলীনের সংখ্যা বাড়িয়ে ২১ করেছিলেন এবং ১৪ জন গৌণকুলীনের সৃষ্টি করেছিলেন। আবার পরবর্তীকালে রাজা দনৌজামাধব রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলীন, সাধ্য-শ্রোত্রিয়, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সুসিদ্ধশ্রোত্রিয় এবং অরি বা কষ্ট-শ্রোত্রিয়—এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বল্লালের নিয়মে বোধ হয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এবং কুলীন ও অকুলীনে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না; কিন্তু দনৌজামাধবের নিয়মে অরি বা কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করলে কুলীনের কুলভঙ্গ হত। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সমাজে উদয়ন ভাদুড়ী পরিবর্ত-মর্যাদা স্থাপন করেন। তাঁর ব্যবস্থিত আটটি পঠী-বিভাগের ফলে বিবাহ-ব্যবস্থা আরও কঠোর হয়। তাঁর নিয়মে কুলভ্রষ্ট কাপ ব্রাহ্মণের জল স্পর্শ করলেও কুলীনের কুলভঙ্গ হত। রাজা কংস-নারায়ণ শ্রোত্রিয়দের সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট-ভেদে শ্রেণীবদ্ধ করলেন। তাঁর নিয়মে কাপ-কন্যার সঙ্গে কুলীন-পুত্রের বিবাহ হলে কোনও কোনও অবস্থায় কুলীনের কুলভঙ্গ হত না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় সমাজে মেলবন্ধন করে পালটী ঘরে বিবাহের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করেন। এই ব্যবস্থা উদয়নের পরিবর্ত-মর্যাদা ও পঠীবিভাগের অনুরূপ। এর ফলে কুলীনগণ বহুবিবাহের প্রশ্রয় পেতেন এবং অনেক কুলীন-কন্যার বিবাহই হত না। সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য এতে বিশেষভাবে কলুষিত হয়।

বল্লাল কর্তৃক কৌলীন্য-সৃষ্টির কাহিনী ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করেন নি। কারণ সেনযুগের সাহিত্য ও তাম্রশাসনাদি থেকে এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

আবার বৈদ্যজাতির কুলজীগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ঐ সমাজে বিদ্যা, অর্থ, সদাচার প্রভৃতি গুণের জন্য লোকে কৌলীন্য-মর্যাদা লাভ করত এবং সমাজপতি, কুলপঞ্জীকার এবং ঘটকগণই সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করতেন। অধিকন্তু রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রভাবেই বৈদ্যসমাজে কৌলীন্যের উদ্ভব হয়েছিল, সন্দেহ নেই। যা হোক, ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত ভরতমল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' সংজ্ঞক বৈদ্য-কুলজীগ্রন্থে বল্লালের নামোল্লেখ না করে বলা হয়েছে যে, যে-সকল মহানুভব ব্যক্তির আচারাদি গুণ আছে, তাঁরাই কুলীন; কুল পারলৌকিক বস্তু নয়; ধন থেকে কৌলীন্যের উৎপত্তি বলে কথা আছে, কিন্তু সেসব ধনী সদাচারী হওয়া চাই। আবার ১৬৫৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'কবিকণ্ঠহার' বা 'সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা' গ্রন্থে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, প্রাচীনদের মতে কৌলীন্যের কারণ হচ্ছে—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা এবং দান, এই নটি গুণ; কিন্তু আধুনিকগণ বলছেন, পূর্বকালে বৈদ্যবংশীয় বল্লাল কৌলীন্যের প্রবর্তন করেছিলেন। সুতরাং বল্লালসেন কর্তৃক বৈদ্যসমাজে কৌলীন্য-প্রবর্তনের কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন-নয়। আবার বল্লালকে বৈদ্যগণ বৈদ্য এবং কায়স্থেরা কায়স্থ বলে দাবি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেনরাজগণ কর্ণাটদেশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা কর্ণাটক্ষত্রিয় ছিলেন। বিজয়সেন বাংলার শূরবংশে বিবাহ করেছিলেন।

সম্প্রতি পালবংশীয় তৃতীয় বিগ্রহপালের বনগাঁও তাম্রশাসন থেকে কৌলীন্যের উৎপত্তি এবং কুলজীসাহিত্যের উদ্ভবের কারণ জানা গিয়েছে। বনগাঁও প্রাচীন মিথিলা বা তীর-ভুক্তির অর্থাৎ উত্তরবিহারের সাহারসা জেলার অন্তর্গত। বনগাঁও তাম্রশাসন দ্বারা রাজা বিগ্রহপাল তীর-ভুক্তি নামক প্রদেশের হোদ্রেয় সংজ্ঞক বিষয় বা জেলার অন্তর্গত বসুকাবর্তগ্রামের একাংশ নিষ্কর দান করেন। দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের নাম ঘাণ্টুকশর্মা। তিনি তখন উত্তরবিহারের কোনও গ্রামে বাস করছিলেন; কিন্তু তাঁর পরিবারের আদি-বাসস্থান ছিল কোলাঞ্চ। তিনি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ও ছান্দোগ্য-শাখাধ্যায়ী এবং মীমাংসা, ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল তুঙ্গ এবং পিতামহের নাম যোগস্বামী।

বনগাঁও শাসনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ক্রোড়পত্র। তা থেকে জানা যায় যে, বসুকাবর্ত গ্রামটি বিগ্রহপালের ঘণ্টীশ নামক জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ কর্মচারীর জায়গীরের অন্তর্গত ছিল এবং তিনিই কোলাঞ্চ-ব্রাহ্মণ ঘাণ্টুক-

শর্মাকে নিষ্কর ভূমিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এর জন্য অবশ্যই তাঁকে রাজকোষে যথোপযুক্ত অর্থ জমা দিতে হয়েছিল। জনৈক কোলাঞ্চ-ব্রাহ্মণের প্রতি একজন মৈথিল ব্রাহ্মণের এই অতিভক্তির কারণ কি? ঐ ক্রোড়পত্র থেকেই সে কারণ বোঝা যায়। ঘণ্টীশের বৃদ্ধপিতামহীর পিতামহ ছিলেন একজন ক্রোড়াঞ্চ (কোলাঞ্চ) ব্রাহ্মণ এবং তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত এই কোলাঞ্চ-রক্তের বিষয় তিনি সগর্বে ঘোষণা করেছেন। এ থেকে বুঝতে পারি, স্থানীয় মৈথিল ব্রাহ্মণেরা কোলাঞ্চ-ব্রাহ্মণদের সহিত সম্পর্কের কতটা মর্যাদা দিতেন। আরও বোঝা যায় যে, ঘণ্টীশ অবশ্যই স্বীয় পরিবারে ঘাণ্টুকশর্মার বিবাহের ব্যবস্থা করে কাছাকাছি তাঁর স্থায়িভাবে বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। পশ্চিমী পণ্ডিতব্রাহ্মণদের সঙ্গে সম্পর্কসৃষ্টির প্রতি স্থানীয় ব্রাহ্মণদের এই লোভই কৌলীন্য-প্রথার উৎপত্তির কারণ।

ঘণ্টীশ দাবি করেছেন যে, তাঁর পিতার নাম তুঙ্গ; তৎপিতা যোগেশ্বর তাঁর পিতা বিবদ; তাঁর মাতা ইন্দ্ধহলা; তাঁর পিতা গোহণক; তাঁর পিতা কাচ্ছ যিনি ক্রোড়াঞ্চ (কোলাঞ্চ) থেকে মিথিলায় এসেছিলেন। দেখা যাচ্ছে যে, স্থানীয় জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ আপনাকে বহু দূরবর্তী পূর্বপুরুষ জনৈক কোলাঞ্চ-ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষ বলে উল্লেখ করছেন। দীর্ঘকাল পরে এই ধরনের দাবি প্রমাণ করতে লিখিত দলিলের সাক্ষ্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় ছিল। এই চাহিদা মেটাবার জন্যই কুলজীগ্রন্থের উদ্ভব।

মধ্যযুগের ভারতীয় রাজগণ যে সকল ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন বলে জানা যায়, তাঁদের অনেকের পরিবারের আদিবাস ছিল কোলাঞ্চ (ক্রোড়াঞ্চ, ক্রোড়ঞ্জি ইত্যাদি), শ্রাবস্তি, মুক্তাবস্তু, তর্কারি প্রভৃতি আধুনিক উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত গ্রামসমূহ। এর মধ্যে শ্রাবস্তি, মুক্তাবস্তু ও তর্কারি বর্তমান গোণ্ডা ও বহরাইচ জেলাদুটির সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এবং কোলাঞ্চ কান্যকুব্জ-অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়। এই ব্রাহ্মণেরা বহুসংখ্যায় বাংলায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। দশম-একাদশ শতাব্দীর লেখমালা থেকে জানা যায় যে, উত্তরবাংলার হিলি-বালুরঘাট অঞ্চলের প্রাচীন পাহুনিয়োজন নামটি পরিবর্তিত হয়ে শ্রাবস্তি নাম হয় এবং ঐ অঞ্চলের আর একটি স্থানের নাম হয় তর্কারি। উত্তরপ্রদেশের শ্রাবস্তি ও তর্কারি-বাসী ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ বলেই অবশ্য উত্তরবাংলার স্থানবিশেষের নাম শ্রাবস্তি ও তর্কারি হয়েছিল। এইরূপ নামকরণের একটা সুপরিচিত উদাহরণ মাদ্রাজের দক্ষিণ-

আর্কট্ জেলার পাটলিপুত্রম্ (বর্তমান কাড্ডালোর)৮। প্রাচীন মগধ রাষ্ট্রের রাজধানী পাটলিপুত্রের (বর্তমান পাটনার) ভট্ট-ব্রাহ্মণেরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন বলেই দক্ষিণভারতের ঐ স্থানটির নাম হয়েছিল পাটলিপুত্রম্।

শেষ করার পূর্বে আর একটিমাত্র কথা বলছি। হিন্দু-আমলে রাজাই ছিলেন সমাজের কর্তা। সুতরাং যে কোনও রাজার পক্ষে রাজ্যমধ্যে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। সেনরাজাদের পূর্বেই মিথিলা ও বাংলার ব্রাহ্মণসমাজ অবশ্যই কৌলীন্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বল্লালসেনের কোনও অবদান ছিল কি ছিল না, তা স্থির করার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব আছে।

৩

পাল-সেন যুগে দক্ষিণী অম্বষ্ঠজাতির পূর্বভারতে আগমন

খ্রীস্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চেনাব-সিন্ধুর সঙ্গমস্থানের উত্তরাস্থিত পাকিস্থান-পঞ্জাবের মন্টগোমেরী অঞ্চলবাসী মালবজাতির প্রতিবেশী অম্বষ্ঠেরা গ্রীকসম্রাট আলেকজান্দার কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। প্রাচীন ইউরোপীয় লেখকেরা এই জাতিকে Abastanoi, Sambastai বা Ambastai নামে অভিহিত করেছেন। এর সংস্কৃত রূপ অম্বষ্ঠ বা আম্বষ্ঠ। অম্বষ্ঠদেশে গণশাসন প্রচলিত ছিল। সে দেশের সেনাদলে ৬০,০০০ পদাতি, ৬,০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০০ রথ ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।২১) জনৈক অম্বষ্ঠ নরপতির উল্লেখ আছে। মহাভারতে (২।৫২।১৪-১৫) শিবি, ক্ষুদ্রক, মালব প্রভৃতি পঞ্জাববাসী জাতির সঙ্গে অম্বষ্ঠদের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণে এ জাতিকে আনব-ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ যযাতি-পুত্র অনুর বংশধর ম্লেচ্ছবং ক্ষত্রিয়) এবং শিবিদের জ্ঞাতি বলা হয়েছে। 'বার্হস্পত্য-অর্থশাস্ত্র'-এ কাশ্মীর, হূণ, অম্বষ্ঠ এবং সিন্ধু একত্র উল্লিখিত দেখা যায়। 'অম্বট্‌ঠসুত্ত' সংজ্ঞক পালিগ্রন্থে জনৈক অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায়, অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত চিকিৎসাজীবী বর্ণসঙ্কর জাতি। আবার একখানি জাতকে দেখা গিয়েছে, অম্বষ্ঠজাতি কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকা অর্জন করত। তাই ঐতিহাসিকগণ স্থির করেছেন যে, প্রাচীন কালে অম্বষ্ঠজাতি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ছিল; কিন্তু পরে তাঁরা পৌরোহিত্য, কৃষিকার্য, চিকিৎসা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে। উত্তরকালে অম্বষ্ঠগণকে বিহার ও বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বিহারের অম্বষ্ঠ-কায়স্থ এবং বাংলার অম্বষ্ঠ-বৈদ্যদের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন পঞ্জাববাসী অম্বষ্ঠেরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়ে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করেছিল, এ সিদ্ধান্ত সমীচীন। কারণ খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর একখানি মন্দসোর শিলালেখে দেখা যায়, একদল তন্তুবায় লাটদেশ

(দক্ষিণ গুজরাত) থেকে পশ্চিমমালবে উপনিবেশ স্থাপনের পর বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করে কেউ বা তন্তুবায়ই রয়ে গেল, আবার কেউ ধনুর্ধর, কথক, ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা, দৈবজ্ঞ, সৈনিক প্রভৃতি নানা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে লাগল। 'সূতসংহিতা' অনুসারে অম্বষ্ঠেরা মাহিষ্য এবং 'মাহিষ্য'-এর মূল অর্থ মহিষ-দেশবাসী। ভারতের মধ্য ও দক্ষিণ-অঞ্চলে বিভিন্ন মহিষদেশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

প্রাচীন অম্বষ্ঠগণের বিভিন্ন-ব্যবসায়-জীবী বংশধর আরও কয়েকটি জাতি পাওয়া যায়। ভাগবত পুরাণ (১০।৪৩।৪ থেকে) পাঠ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, স্থানবিশেষে (বোধহয় মথুরা অঞ্চলে) উপনিবিষ্ট অম্বষ্ঠেরা হস্তিচালক অর্থাৎ মাহুতের বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। আবার দক্ষিণভারতের তামিল ও মলয়ালমভাষী অঞ্চলের যে অম্বষ্ঠেরা আজ বৈদ্য ও পণ্ডিত নামে পরিচিত এবং ক্ষৌরকর্ম, চিকিৎসা, পৌরোহিত্য ও গীতবাদ্য-জীবী, তারাও প্রাচীন অম্বষ্ঠ-জাতির বংশধর। কারণ খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে Ptolemy তাঁর ভূগোলে (৭।১।৬৬) Ambastai বা অম্বষ্ঠদিগকে ঐ অঞ্চলের অধিবাসী বলেছেন। এই গ্রন্থানুসারে Ambastai ও Bettigoi নামক জাতিদুটি কাছাকাছি বাস করত। এর Bettigoi জাতির নাম অবশ্যই Bettigo পর্বতের (অর্থাৎ মলয়-পর্বত বা কেরলদেশের পর্বত) নাম থেকে উদ্ভূত। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর চালুক্য ও পাণ্ড্য লেখমালায় যে বৈদ্যজাতীয় উচ্চরাজকর্মচারীর উল্লেখ আছে, তাঁরা এই বৈদ্য-অম্বষ্ঠ-পণ্ডিত জাতি-সম্ভূত বলে মনে হয়। সেকালের ভারতে (বিশেষতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে—যেখানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সংখ্যা নগণ্য) উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারী এবং রাষ্ট্রশাসকেরা অনেকেই উচ্চবর্ণের ছিলেন না। তামিল নাড়ুর ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের মধ্যে অম্বষ্ঠ-বৈদ্য-পণ্ডিতের সামাজিক মর্যাদা কম নয়। সেদেশে ব্রাহ্মণ ও অন্ত্যজ ব্যতীত অন্যান্য জাতিগুলি প্রাধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—'বামহস্ত' (প্রধানতঃ কারুজীবী) এবং 'দক্ষিণহস্ত'। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা নিয়ে রেষারেষির কথা ১২শ-১৩শ শতাব্দীর চোলসম্রাটদের লেখমালায় উল্লিখিত আছে। অম্বষ্ঠ-বৈদ্য-পণ্ডিত 'বামহস্ত'-সম্প্রদায়ের রথকারগণের অর্থাৎ স্বর্ণকার, কর্মকার, তট্টকার, স্থপতি, সূত্রধর প্রভৃতি জাতির সমবর্গীয়। চোল-আমলের লেখাবলীতে দেখা যায়, রথকারেরা নিজেদের 'ব্রহ্মবৈশ্য' (অর্থাৎ অম্বষ্ঠের ন্যায় ব্রাহ্মণের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান) বলে দাবি করত। অবশ্য বর্তমানকালে আন্ধ্রপ্রদেশের রথকারেরা

আপনাদের বিশ্বকর্মার সন্তান 'বিশ্বব্রাহ্মণ' বলে প্রচার করে এবং খাঁটি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা দাবি করে। এই রথকারেরা অনেকে কৃষ্ণ-যজুর্বেদ ও অন্যান্য বৈদিকগ্রন্থ পাঠ করে এবং আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্রানুসারে স্বজাতীয় কিংবা ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা বিবাহাদি সম্পাদন করায়। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজদ্বারে সামাজিক শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে তারা বেদাদি শাস্ত্র উদ্ধৃত করে 'রথকারাধিকারম্' সংজ্ঞক গ্রন্থ সঙ্কলন করেছিল। অম্বষ্ঠ-বৈদ্য-পণ্ডিতদের সামাজিক মর্যাদার প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে তারা তামিল নাড়ুতে ১১ দিন এবং কেরলে ১৬ দিন অশৌচ পালন করত।

মধ্যযুগে রচিত বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের (১।১০।১২৩ থেকে) একটি কাহিনীতে গোদাবরীনদীর নিকটবর্তী কোনও অঞ্চলের সঙ্গে অম্বষ্ঠ জাতির সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জনৈক ব্রাহ্মণের পত্নীর গর্ভে অশ্বিনীকুমার নামক দেবতার ঔরসে অম্বষ্ঠের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণী তপস্যার বলে গোদাবরীনদীতে পরিণত হন। অশ্বিনীকুমার তাঁর পুত্র অম্বষ্ঠকে চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্গণনা ইত্যাদি শিক্ষা দিলেন। কিন্তু লোকের ভাগ্যগণনা করে অর্থগ্রহণ করত বলে অম্বষ্ঠ বেদ-বহিষ্কৃত কুব্রাহ্মণ বলে নিন্দিত হয়। উড়িষ্যার গঞ্জাম ও নিকটবর্তী তেলুগুভাষী অঞ্চলে বৈদ্য ও পণ্ডিত নামে পরিচিত এক নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণজাতি আছে। তাদের বৃত্তি জ্যোতির্গণনা ও চিকিৎসা। জ্যোতিষজীবী হিসাবে তারা উত্তরভারতের আচার্য বা গ্রহবিপ্র নামক নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণজাতির মত। ভাগ্যগণনার জন্য তারা মাটিতে খড়ি দিয়ে দাগ কাটে বলে গঞ্জামে তাদের নাম খড়িকার। এই নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণজাতীয় বৈদ্য-পণ্ডিতেরা বর্তমানে নিজেদের অম্বষ্ঠ না বলে ব্রাহ্মণ বলে বটে ; কিন্তু তাদের উদ্দেশ করেই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-জীবী অম্বষ্ঠ নামক নিম্নজাতীয় ব্রাহ্মণের কাহিনী কল্পিত হয়েছিল, তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। কারণ এই বৈদ্য-পণ্ডিতেরা তামিল নাড়ু ও কেরলের বৈদ্য-পণ্ডিত-অম্বষ্ঠগণের সমগোত্র। দক্ষিণ থেকে এসে তারা গঞ্জাম-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়েছিল বলে বোধ হয়।

উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গ ও সূর্যবংশী গজপতি নৃপগণ এবং আরও কতিপয় রাজবংশ কন্নড ও তেলুগু-ভাষী অঞ্চল থেকে আগত। আবার তামিল নাড়ুর চোল-রাজগণের সঙ্গে গঙ্গদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবের কথা সুপরিচিত। সেই সূত্রে দক্ষিণের বহু সাধুসন্ন্যাসী, রাজনীতিবিদ ও যুদ্ধ-ব্যবসায়ী উড়িষ্যাবাসী হয়েছিল বলে জানা যায়। এই ভাবে বৈদ্য-পণ্ডিত বা অম্বষ্ঠজাতি এবং অন্যান্য দক্ষিণী

সম্প্রদায়ের উড়িষ্যায় বসতিস্থাপনে আশ্চর্যান্বিত হবার কারণ নেই। আবার এদেরই একদল পাল-সেন আমলে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল মনে করার কারণ আছে।

বাংলাদেশের চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা মধ্যযুগে বৈদ্যসংজ্ঞক সুসংহত সামাজিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। পাল-সেন আমলের পূর্বে এদেশে বৈদ্যজাতির অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে দক্ষিণভারতে বৈদ্যজাতীয় উচ্চ রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেখানে বৈদ্য-অম্বষ্ঠ-পণ্ডিত জাতি বর্তমান আছে; উড়িষ্যাতেও বৈদ্য-পণ্ডিত জাতি আছে। কিন্তু এই দুটি বৈদ্যজাতি কেবল মাত্র চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নয়; চিকিৎসা তাদের অন্যতম ব্যবসায়। আবার উড়িষ্যায় এরা নিজেদের অম্বষ্ঠ বলে না। অতএব এই জাতির সকল সম্প্রদায়ই অম্বষ্ঠত্ব-দাবির উপর জোর দিত না। বাংলাদেশেও সব সময় বৈদ্যদের অম্বষ্ঠত্বের দাবির উপর সমান জোর পড়ে নি। ষোড়শ শতাব্দীতে 'সুর্জনচরিত'-রচয়িতা চন্দ্রশেখর আপনাকে গৌড়ীয় এবং অম্বষ্ঠ বংশজাত বলেছেন; আবার তাঁকেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ (আদি। ১০) চন্দ্রশেখর-বৈদ্য বলা হয়েছে। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই বাংলার বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ বলে পরিচিত ছিল। এক শতাব্দী পরে ১৬৫৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'কবিকণ্ঠহার' বা 'সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা'তে বৈদ্যদের অম্বষ্ঠ বলা হয় নি; কিন্তু ২২ বৎসর পরে ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে লিখিত ভরতমল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা'য় বৈদ্যজাতির অম্বষ্ঠত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের ধারণা, দক্ষিণভারতীয় অম্বষ্ঠ-বৈদ্য-পণ্ডিতেরা আদি-মধ্য যুগে বাংলায় উপনিবিষ্ট হওয়ার ফলে তাদের সঙ্গে বিভিন্ন-সম্প্রদায়-ভুক্ত স্থানীয় চিকিৎসকদের সংমিশ্রণ ঘটায় এদেশের বৈদ্যসমাজ গড়ে উঠেছে। বাংলার বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি বৃত্তি-কেন্দ্রিক জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন-জাতির রক্ত-মিশ্রণ ঘটেছে, তার কিছু প্রমাণ আছে।

যেমন ভারতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাগ্যান্বেষী মুসলমানগণ এদেশে এসে ভারতীয় সুলতান প্রভৃতির পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করত, তেমনই বাংলায় দক্ষিণভারতীয় সেনবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন শ্রেণীর দক্ষিণভারত-বাসীর এদেশে উপনিবেশ স্থাপন সহজেই অনুমান করা যায়। আবার পাল-রাজসভাতেও দক্ষিণীদের সমাদর ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে সম্রাট ধর্মপাল কর্ণাটদেশের রাষ্ট্রকূটবংশের কন্যা

বিবাহ করেছিলেন। তাঁর পুত্র দেবপালের সময়েই পাল-সেনাদলে কর্ণাটসৈন্যের স্থান হয়। পরবর্তীকালে চোলসৈন্যও পাল-সেনাদলে স্থান পেয়েছিল। পাল-সম্রাটদের অনেকেই কর্ণাট-রাজকন্যা বিবাহ করেন এবং সেই সূত্রে দক্ষিণভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে রামপালের রাজত্বকালে তাঁর কর্ণাটদেশীয় আত্মীয়গণ বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন এবং তাঁদের সাহায্যেই পালসম্রাট কৈবর্তরাজ ভীমকে উৎখাত করে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। উপরে আদিশূর-কাহিনীর প্রসঙ্গে আমরা এই বিষয়টির উল্লেখ করেছি।

পূর্ব ও, দক্ষিণ-ভারতে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহকে সমাজনেতা ব্রাহ্মণেরা শূদ্র বলে গণনা করতেন। কিন্তু উভয়ত্রই তারা উচ্চ সামাজিক মর্যাদা দাবি করে। বাংলা দেশের বৈদ্যগণকে পূর্বে শূদ্র বলা হত এবং শূদ্ররূপে গণিত কায়স্থদের সঙ্গে তাদের বিবাহসম্বন্ধ ঘটত। 'চন্দ্রপ্রভা'র 'অতিদিষ্টং হি বৈদ্যস্য শূদ্রত্বম্' ইত্যাদি এবং 'ডোমনঃ পাল-জামাতা বৈদ্যঃ পালো ন বিদ্যতে' ইত্যাদি তার প্রমাণ। বাংলাদেশের পূর্ব-সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আজও বৈদ্য-কায়স্থের বিবাহচিহ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। কিন্তু 'চন্দ্রপ্রভা'য় বৈদ্যদের বৈশ্যত্ব প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা রাজবল্লভের নেতৃত্বে বৈদ্যগণ বৈশ্যত্ব দাবি করে এবং 'গুপ্ত' নামান্ত গ্রহণ ও উপবীত ধারণ করতে থাকে। দক্ষিণভারতে এই ধরনের দাবি আদি-মধ্য যুগেই আরম্ভ হয়েছিল; কিন্তু বাংলাদেশে বৈদ্যগণই এ ব্যাপারে অগ্রণী। এর কারণ এটা হতে পারে যে, বৈদ্যদের রক্ত এবং সংস্কৃতিতে কিছু দক্ষিণী সংস্রব আছে। আধুনিককালে তারা ব্রাহ্মণত্বের দাবিতে শর্মা নামান্ত গ্রহণে ইচ্ছুক। দক্ষিণভারতীয় রথকারদের মত বাঙালী বৈদ্যগণও নিজেদের সত্যকার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা দাবি করতে চায়। বলা হচ্ছে যে বৈদ্য অর্থ 'বেদজ্ঞ'। কথাটা ঠিক; কিন্তু এই 'বেদজ্ঞ'-এর অর্থ 'আয়ুর্বেদজ্ঞ' এবং 'বেদে' বা 'বেদিয়া' শব্দেরও ঐ একই বুৎপত্তি। যাহোক, এদেশে এখন সকলেই এই রকম উচ্চ সামাজিক মর্যাদা দাবি করছে—কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়, সাহারা বৈশ্য, গোয়ালারা যাদব-ক্ষত্রিয়, আগুরিরা উগ্র-ক্ষত্রিয়, বাগদীরা ব্যাগ্র-ক্ষত্রিয়, চণ্ডালেরা নমঃ-শূদ্র বা নমো-ব্রাহ্মণ, নাপিতেরা নাই বা সাবিত্রী-ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ দাবিগুলিতে ঐতিহাসিকতা কিছু নেই; তবে দু-একটিতে ইতিহাসের গোঁজামিল দেবার ব্যর্থ প্রয়াস আছে।

বাংলাদেশে দক্ষিণীদের উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কে যে দু-একটি কথার

উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আদি-মধ্য যুগের চোল লেখাবলীতে অরিন্দম কর্তৃক গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অন্তর্বেদিদেশ থেকে ছত্র-পাদুকাবাহী শূদ্রভৃত্য সহ ব্রাহ্মণদের স্বরাজ্যে উপনিবিষ্ট করার কাহিনীটির উত্তর-মধ্য যুগীয় বাংলার কুলপঞ্জীতে বর্ণিত রাজা আদিশূর কর্তৃক ঐ একই কো-লাঞ্চ-কান্যকুব্জ অঞ্চল থেকে শূদ্রভৃত্য সহ ব্রাহ্মণদের এনে বঙ্গদেশে স্থাপনের কাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কথা, তামিল নাড়ু অঞ্চলের জনপ্রিয় দেবতা নটরাজের আদি-মধ্য যুগের বাংলায় আগমন এবং কুমিল্লা অঞ্চলে কতকগুলি নর্তেশ্বর-নট্টেশ্বর মূর্তি আবিষ্কার ও চন্দ্রবংশের লেখে দেবতাটির বিশেষ উল্লেখ।

পূর্বভারতে তিব্বতীয়দের অভিযান

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাংশে Srong-tsan নামক উপজাতীয় নায়ক তিব্বতে এক শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে, তাঁর সেনাদলে একলক্ষ সৈন্য ছিল এবং তিনি মধ্যদেশে অর্থাৎ উত্তরভারতের মধ্যাঞ্চলে (বিহারের অংশ সহ উত্তরপ্রদেশে) অধিকার বিস্তার করেছিলেন। এই দাবির কতখানি সত্য, তা বলা যায় না। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেছেন যে, বাংলা ও আসামে যে সন বা সাল প্রচলিত আছে, সেই 'সন্' শব্দটি ঐ তিব্বতীয় রাজার নামের শেষাংশ (tsan) থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এই ধারণা অবশ্যই ভ্রান্ত ; কারণ ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে এই অব্দের কোনও ব্যবহার দলিলপত্রে পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে দেখলে বাংলা সন ৫৯৩-৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে গণিত হয়েছিল মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ১৬শ শতাব্দীতে মুঘলসম্রাট্ আকবর্ কর্তৃক মুসলমানদের চান্দ্র হিজরী সনকে তাঁর প্রথম রাজ্যবর্ষ অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরী বৎসর থেকে সৌরবৎসর গণনা করে প্রচারিত ফসলী সনের রকমফের, তাতে সন্দেহ নেই। 'সন্' শব্দটি আরবী ; এর অর্থ বৎসর বা অব্দ।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে Srong-tsan এর পর তাঁর মহাপরাক্রান্ত পুত্র Srong-tsan Gam-po (Srong-btsan-sgom-po, ৬২০-৫০ খ্রী) সমগ্র তিব্বতের উপর তাঁর আধিপত্য সুদৃঢ় করেন। তিনি নেপালের রাজকন্যা এবং চীনসম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এই দুই বৌদ্ধ মহিষীর প্রভাবে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। লোকে তাঁকে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির অবতার মনে করত। তিনিই ভারতীয় অক্ষরে তিব্বতীয় ভাষা লেখার ব্যবস্থা করেন। এখন পর্যন্ত এই বর্ণমালার ব্যবহার তিব্বতদেশে প্রচলিত আছে। তিনি ভারতীয় পণ্ডিতদের তিব্বতে আমন্ত্রণ করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করান।

Srong-tsan Gam-po-র সময়ে উত্তরভারতের পরাক্রান্ত নরপতি হর্ষবর্ধন (৬০৬-৪৭ খ্রী) কনৌজে রাজত্ব করতেন। এই তিব্বতরাজ সম্পর্কে

বলা আছে যে, তিনি নেপাল ও আসাম জয় করেন এবং অর্ধেক জম্বুদ্বীপের (ভারতবর্ষের) অধিপতি হন। চীন দেশের সহিত হর্ষের দূতবিনিময় হয়েছিল। চীনা ইতিহাস অনুসারে হর্ষের মৃত্যুর পর তাঁর জনৈক অমাত্য তাঁর সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর নাম চীনা অক্ষরে 'তি-ন-ফু-তি ও-লো-ন-শুএন' দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ভাষায় নামটি 'তীরভুক্তি অর্জুন (বা অরুণাশ্ব)'। তিনি সম্ভবতঃ হর্ষের সামন্তরূপে তীর-ভুক্তি বা উত্তরবিহার শাসন করতেন। বলা হয়েছে যে, হর্ষের নিকট প্রেরিত চীনসম্রাটের দূত Wang-hiuen-ts'e দ্বিতীয়বার যখন ভারতে উপস্থিত হন, তখন হর্ষ মৃত এবং তাঁর সিংহাসন অর্জুন বা অরুণাশ্বের কবলিত। নূতন রাজা চীনা দূতকে আক্রমণ করে তাঁর লোকজনকে হত্যা করলেন। তখন চীনরাজদূত পালিয়ে গিয়ে নেপালরাজের কাছ থেকে ৭০০০ এবং তিব্বতরাজের কাছ থেকে ১২০০ সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি এবার অর্জুন বা অরুণাশ্বের রাজধানী ধ্বংস করেন ও তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করে চীনদেশে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। ৫৮০টি ভারতীয় নগর চীনদূতের আধিপত্য স্বীকার করে এবং পূর্বভারতের কামরূপরাজ ভাস্করবর্মাও তাঁকে জিনিসপত্র উপহার দেন। এই সকল ঘটনা ৬৪৭-৪৮ খ্রীস্টাব্দে ঘটেছিল এবং Wang-hiuen-ts'e-র যুদ্ধবিগ্রহ সম্ভবতঃ উত্তরবিহারে গণ্ডক নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। যাই হোক, এই সূত্রে উত্তরবিহারে তিব্বতীয়গণের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। তখন থেকে দীর্ঘকাল নেপালে তিব্বতের অধিকার স্বীকৃত হত।

Srong-tsan Gam-po-র পর তাঁর পৌত্র Kili-pa-pu (৬৫০-৭৯ খ্রী) তিব্বতের সম্রাট হন। তিনি ৬৭০ খ্রীস্টাব্দে চীনসম্রাটকে পরাজিত করেন এবং কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করেন। দক্ষিণ দিকে মধ্যদেশ পর্যন্ত তাঁর অধিকার প্রসারিত হয়েছিল। ৭০২ খ্রীস্টাব্দে নেপাল ও মধ্যদেশ বিদ্রোহী হয়। নেপালে তিব্বতীয় অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু মধ্যদেশ পুনরধিকারের চেষ্টা সফল হয় নি। মধ্যদেশের রাজা I-cha-fon-mo (কনৌজরাজ যশোবর্মা, আ ৭২৫-৫৩ খ্রী) চীন-সম্রাটের নিকট দূত পাঠিয়ে তিব্বতীয় ও আরবদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেন। কাশ্মীররাজ Mu-to-pi (ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় ৭২৪-৬১ খ্রী) চীন-সম্রাটের নিকট, দূত প্রেরণ করেন এবং জানান যে, তিনি মধ্যদেশের রাজার সহযোগে তিব্বত থেকে ভারতে প্রবেশের পাঁচটি রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং কয়েকবার যুদ্ধে

তিব্বতীয়গণকে পরাজিত করেছেন। যশোবর্মা ও ললিতাদিত্য বাংলা ও বিহারে অভিযান করেন, এবং এই সময়েই অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় পালবংশের অভ্যুদয় হয়।

Chronicles of Ladakh অনুসারে তিব্বতরাজ Khri-srong-lde-btsan (৭৫৫-৯৭ খ্রী) পূর্বে চীনদেশ থেকে দক্ষিণে ভারতবর্ষ পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেছিলেন। নবম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে লিখিত একখানি তিব্বতীয় গ্রন্থে আছে যে, তাঁর পুত্র Mu-tig Btsan-po (৮০৪-১৫ খ্রী) জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষের অনেকাংশ অধিকার করেন এবং রাজা ধর্মপাল ও Drahu-dpun তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। তিব্বতরাজ Ral-pa-chan (আ ৮১৭-৩৬ খ্রী) দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন। তিব্বতীয়েরা গুর্জর-প্রতিহারগণের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে পাল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে বলে আমরা অনুমান করেছি।

৫

প্রথম শূরপালের দ্বাদশ রাজ্যবর্ষে উৎকীর্ণ মূর্তিলেখ

বর্তমান পুস্তকখানি যখন ছাপা হচ্ছিল, তখন ১৯৮২ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে আমি Dr. Mrs. Susan L. Huntington (Associate Professor, Department of History of Art, The Ohio State University, Columbus, U. S. A.) মহাশয়ার কাছ থেকে একখানি চিঠি এবং লেখসংবলিত একটি পিত্তলনির্মিত বিষ্ণুমূর্তির ফোটোগ্রাফ পাই। তাঁর পালযুগের শিল্পকলাবিষয়ক একখানি পুস্তকের অংশবিশেষ আমাকে ইতিপূর্বে দেখে দিতে হয়েছিল। সেই বইখানি এ সময় ছাপা হচ্ছিল। নবাবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্তি-লেখটির পাঠ এবং অনুবাদ ঐ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছায় তিনি আমার সাহায্যপ্রার্থী হন।

বিষ্ণুমূর্তি-লেখটির তারিখ রাজা শূরপালের ১২শ রাজ্যসংবৎসর। ইনি অবশ্যই দেবপাল-পুত্র প্রথম শূরপাল। ইতিপূর্বে তাঁর সর্বাধিক রাজ্যবর্ষ জানা ছিল ৫ম বৎসর। তাই আমি তাঁর রাজ্যকাল আট বৎসর অনুমান করে 'আ ৮৫০-৫৮ খ্রী' লিখেছিলাম। উপরে পৃষ্ঠা ১২ দ্রষ্টব্য। এখন যখন দেখা গেল, প্রথম শূরপালের রাজত্বের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ১২ বৎসরের মত, তখন অন্যান্য রাজাদের আনুমানিক রাজ্যকাল থেকে কিছু কিছু কেটে নিয়ে নিম্নলিখিত কালপঞ্জী দাঁড় করাতে হল—ধর্মপাল, আ ৭৭৫-৮১০ খ্রী ('আ ৭৭৮-৮১২ খ্রী' স্থলে; '৮১৩' এখানে মুদ্রণপ্রমাদ); দেবপাল, আ ৮১০-৪৭ খ্রী ('আ ৮১২-৫০' স্থলে); প্রথম শূরপাল, আ ৮৪৭-৬০ খ্রী ('আ ৮৫০-৫৮ খ্রী' স্থলে); প্রথম বিগ্রহপাল, আ ৮৬০-৬১ খ্রী ('আ ৮৫৮-৬০ খ্রী' স্থলে) এবং নারায়ণপাল আ ৮৬১-৯১৭ খ্রী ('আ ৮৬০-৯১৭ খ্রী' স্থলে)। পৃষ্ঠা ৪২ দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুমূর্তির পৃষ্ঠভাগে বামদিকের উপর দিক থেকে অভিলেখটি আরম্ভ করা হয়েছে। পঙ্‌ক্তিটি নীচের দিকে ঘুরে মূর্তির ডানদিক, সামনের দিক এবং বামদিক শেষ করে ওর অবশিষ্টাংশ বামদিকের নীচে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ও পশ্চাদ্দিকের নীচে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি হিসাবে উৎকীর্ণ করে শেষ করা হয়েছে। লেখা এবং খোদাই, এই দুটি কাজই ত্রুটিপূর্ণ দেখা যায়।

অভিলেখের পাঠ

মূর্তির পশ্চাদ্দিকের বামভাগে—দেয়ধর্ম্মোয় শ্রীশূরপাল-রাজ্যে
পশ্চাদ্দিকে নীচে—[পঙ্‌ক্তি ১] স[ম্ব]ৎ ১২ পীশদাপণক-
বামদিকে নীচে—মহাবিহারে ঠী-
সম্মুখদিকে নীচে—সব্যা চম্ম'কার-তিয়াষচস
ডানদিকে নীচে—[পঙ্‌ক্তি ১] কপিলাকত-
[পঙ্‌ক্তি ২] স্য প[ুত্র]-মন[ু]-
পশ্চাদ্দিকে নীচে—[পঙ্‌ক্তি ২] কেন কা[রি]চতং

সংশোধিত পাঠ

দেয়ধর্ম্মো'য়ং শ্রীশূরপাল-রাজ্যে সংবৎ ১২ শ্রীমদাপণক-মহাবিহারে ঠীসব্যাঃ চম্ম'কার-তিয়াষচস্য। কপিলাকতস্য পুত্রেণ মনুকেন কারিতম্।

বঙ্গানুবাদ

এই ধর্মদানটি শ্রীশূরপালের রাজ্যের ১২শ বৎসরে শ্রীমদ্ আপণক-মহা বিহারে ঠীসবীবাসী চর্মকার তিয়াষচের দেওয়া।

[মূর্তিটি] কপিলাকতের পুত্র মনুকের দ্বারা নির্মিত। 'তিয়াষচ' স্থলে 'তিয়াষক' উদ্দিষ্ট ছিল কিনা, বলা যায় না।

'আপণক' বা আপনক' নামক মহাবিহারের উল্লেখ কয়েকটি মূর্তিলেখ এবং একখানি পুথিতে পাওয়া যায়। রামপালের ১৮শ রাজ্যবর্ষে আপনক মহা-বিহারে অনুলিখিত 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকাতে আছে—"দেয়ধর্মো'য়ং প্রবর-মহাযান-যায়িনঃ মলয়দেশ-বিনির্গত-শাক্যভিক্ষু-স্থবির-পূর্ণচন্দ্রস্য (।*) অস্য শিষ্য-স্থবির-ত্রৈলোক্যচন্দ্রস্য (।*) যদত্র পুণ্যং তদ্ভবত্বাচার্যোপাধ্যায়-মাতাপিতৃ-পূর্বংগমং কৃত্বা সকল-সত্বরাশেরনুত্তর-জ্ঞানাবাপ্তয় ইতি॥ মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্‌রামপালদেব-রাজ্য-সম্বৎ ॥ ১৮ ॥ শ্রীমদাপনক-মহা-বিহারাবস্থিত-বমতানক(?)-জয়কুমারেণ লিখিত ইতি।" সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, পৃষ্ঠা ৪৩ দ্রষ্টব্য। বিহারটি পূর্বভারতেই অবস্থিত ছিল; কিন্তু ঠিক কোথায়, তা এখনও আমাদের অজ্ঞাত।

কিছুকাল আগেও বাংলা-অঞ্চলের চর্মকারগণ অনেকে মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করে এবং দেবদেবীর পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বাদ্যাদি বাজিয়ে জীবিকার্জন করত এবং তাদের মধ্যে সম্পন্ন গৃহস্থের অভাব ছিল না। বোধ হয় এখনও নেই।

৬

বলালী (বল্লালী) সনের একটি মূর্তিলেখ

১২০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময় থেকে অর্থাৎ যেন বঙ্গের অন্তর্গত রাঢ় ও বরেন্দ্রের বিস্তৃত অঞ্চলে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার স্মারক হিসাবেই দেশের পূর্বদক্ষিণ ভাগে একটি সংবতের প্রচলন হয়। তাকে দুটি সংবৎ মনে করা হয়েছে। কিন্তু এ সংবৎগুলি পরবর্তী কালের কল্পনা। এর মধ্যে একটির নাম বলালী বা বল্লালী সন এবং অন্যটির নাম পরগণাতি সন। এই সন দুটি ঢাকা এবং নোয়াখালি অঞ্চলের দলিলপত্রে ব্যবহৃত দেখা গিয়েছে। অনেকে বলেছেন যে, বলালী সনের গণনা আরম্ভ হয় ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে এবং পরগণাতি সনের গণনার আরম্ভ ১২০২-০৩ খ্রীস্টাব্দে। এ সম্পর্কে যতীন্দ্র মোহন রায় প্রণীত 'ঢাকার ইতিহাস' (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৩) এবং Indian Antiquary (Vol. LII, pp. 314ff.) পত্রিকায় নলিনীকান্ত ভট্টশালীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। আবার দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলের অনেকগুলি পুথি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ১২০১-০২ খ্রীস্টাব্দে এই সনের আরম্ভ ; কিন্তু আগের ত্রিপুরা বা বর্তমান কুমিল্লা জেলার সরাইল পরগণায় প্রাপ্ত দলিলসমূহ থেকে এর আরম্ভ পাওয়া যায় ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে। সুতরাং একই সালের গণনা বিভিন্ন-স্থানে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ছিল বলে বোঝা যায়। এতে আমাদের ফসলী সন ও তার বিকারগুলির এবং মিথিলাতে প্রচলিত লক্ষ্মণ-সংবতের বিভিন্ন বৎসরে আরম্ভের কথা মনে পড়ে।

আবার সালটির আরও অন্য স্থানীয় নাম ছিল। একখানি পুথিতে এই সালের নাম দেখা যায় 'পরগনে ভুলুয়া সন'। ভুলুয়া পরগনা নোয়াখালি জেলায় অবস্থিত। এই সালগুলির ব্যবহার মধ্যযুগের শেষভাগে দেখা যায় ; কিন্তু একখানি পুথিতে পরগণাতিসন ৩২৭ এবং শকাব্দ ১৪৫১ (১৫২৯ খ্রীস্টাব্দ) দুটি তারিখ একত্র থাকায় বোঝা যায়, আকবরের সময়ে ফসলী বা বঙ্গাব্দের প্রচলনের পূর্বেই এর ব্যবহার আরম্ভ হয়। এই পুথি থেকে ১২০২ খ্রীস্টাব্দে সনটির আরম্ভ সমর্থিত হয়। 'পরগনাতি' নামে 'আতি' সংজ্ঞক কোনও পরগনা বোঝাচ্ছে কিনা, তা বলা কঠিন।

পূর্বে এই স্থানীয় সালের ব্যবহার কেবল দলিলপত্রে দেখা গিয়েছিল, কোনও অভিলেখে পাওয়া যায় নি। কিন্তু সম্প্রতি একটি মূর্তিলেখে আমি এটি লক্ষ্য করেছি। মূর্তিটি চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোনও ব্রহ্মদেশপ্রবাসী বুদ্ধভক্ত তদ্দেশীয় একটি বৌদ্ধমন্দিরে দান করেছিলেন। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্রহ্মদেশীয় পুরাতত্ত্ব-বিভাগের পাগান কেন্দ্রের কর্মচারী U. Bokay মহাশয় আমাকে dolomite পাথরে নির্মিত একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি (৬½ ইঞ্চি উচ্চ ও ৪ ইঞ্চি চওড়া) এবং তৎপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ অভিলেখের চিত্র পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানালেন যে, মান্দালয়ের নিকটবর্তী সাগাইঙ্ শহরের তা-গুআংগ্ অঞ্চলে খারু-ওয়ে পাহাড়ে অবস্থিত থিৎ-সরু(বা থরু)-চেতি নামক পাগোদার ধ্বংসা-বশেষ-মধ্যে ওটি আবিষ্কৃত হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে পাগানের রাজা Kyan-zit-thar-এর সময়ে ঐ চৈত্য নির্মিত হয়। কিন্তু বারবার ভূমিকম্পের ফলে সেটি ধ্বংস হয়ে যায়। মূর্তিটি অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে চৈত্যের গর্ভে (relic-chamber-এ) পাওয়া গিয়েছিল।

এই ধরণের মূর্তির তারিখ দশম বা একাদশ শতকের পরবর্তী নয়। কিন্তু অভিলেখটি পরীক্ষা করে বোঝা গেল যে, সেটির তারিখ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে। সুতরাং সে সময় পূর্বেকার বিধ্বস্ত মন্দির নূতন করে নির্মিত হয়েছিল এবং তখন কোনও পুণ্যলোভী বুদ্ধভক্ত প্রাচীন মূর্তিটি কিনে এবং অভিলেখ খোদাই করিয়ে চৈত্যগর্ভে স্থাপনের জন্য ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলেন।

অভিলেখের অক্ষর বাংলা এবং সময় মধ্যযুগের অন্তিমভাগ। তারিখের বৎসর দেওয়া হয়েছে—'স। ৭৯৭'। যিনি অভিলেখটি লিখেছিলেন, তিনি প্রাচীন রচনারীতি অবগত ছিলেন না বা অনুসরণ করেন নি। তাই 'পরমসৌগত' স্থানে 'পরমবৌদ্ধ' এবং 'দেয়ধর্ম' স্থানে 'পুণ্য' লিখেছেন। যা হোক, যিনি বুদ্ধ-মূর্তিটি দান করেছিলেন, তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৌদ্ধ ছিলেন মনে করা যায়। তাই তারিখের বৎসরটি অবশ্যই উপরে আলোচিত বল্লালী সন। এই তারিখের উপযুক্ত অপর কোনও সাল আর দেখা যায় না। ফলে ঐ সংবৎ ৪৯৭ + ১১৯৯ = ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দ বা ৪৯৭ + ১২০২ = ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দ।

অভিলেখের পাঠ

১. পরমবৌদ্ধ-অন্তঃপুরপ্রতীহার-ঠক্কুর-শ্রীমূর্তিধর-
২. পুত্র-শ্রীব্রহ্মধরস্য পুণ্যমিদং স। ৪৯৭ মাঘ-দি ১ (॥*)

মন্তব্য—'পরমবৌদ্ধ' মূর্তিটির দাতা ব্রহ্মধরের বিশেষণ ধরে নিয়ে 'পরম-বৌদ্ধস্য' পাঠ ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির শেষে স্থানাভাবে 'দি' অক্ষরের 'ই'-মাত্রা অক্ষরটির মাথার উপরে দেওয়া হয়েছে। স্থানাভাব বশতঃ '১' অংকটি 'দি' অক্ষরটির নীচে উৎকীর্ণ দেখা যায়।

বঙ্গানুবাদ

এটি [পাগানের রাজার] অন্তঃপুরের দ্বারাধ্যক্ষ ঠাকুর শ্রীমূর্তিধরের পুত্র পরমবৌদ্ধ শ্রীব্রহ্মধরের পুণ্য [দান-কার্য]। সংবৎ ৪৯৭ মাঘ-দিন ১।

সংযোজন—বল্লালী বা পরগনাতি সন বৌদ্ধদের দ্বারা প্রচারিত হতে পারে। কারণ 'শেকশুভোদয়া' ও 'পগ্-সম্-জোন্-জঙ্গ্' অনুসারে মুসলমান অধিকারের তারিখ ১১২৪ শকাব্দ। উপরে আলোচিত যে পুথিতে এই সনের ৩২৭ বর্ষ =১৪৫১ শকাব্দ বলা হয়েছে, তাতেও ঐ ১১২৪ শকাব্দে সনটির ১ম বৎসর পাওয়া যায়। মুসলমান বিজেতারা যে বিহারাদি ধ্বংস ও ভিক্ষুদের হত্যা সাধন করে বৌদ্ধদিগের মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল, তার প্রমাণ আছে।

কতিপয় রাজকুলের বংশলতিকা

(১) পালবংশ

দয়িতবিষ্ণু
|
বপ্যট
|
১. ১ম গোপাল, আ ৭৫০-৭৫ খ্রী = দেদ্দদেবী
|
- ২. ধর্মপাল, আ ৭৭৫-৮১০ খ্রী = রন্নাদেবী
  - যুবরাজ ত্রিভুবনপাল (যুবরাজ হারবর্ষ)
  - ৩. দেবপাল, আ ৮১০-৪৭ খ্রী = মাহটাদেবী
    - রাজ্যপাল
    - ৪. ১ম শূরপাল, আ ৮৪৭-৬০ খ্রী
- বাক্‌পাল
  - জয়পাল
    - ৫. ১ম বিগ্রহপাল, আ ৮৬০-৬১ খ্রী = লজ্জাদেবী
      |
      ৬. নারায়ণপাল, আ ৮৬১-৯১৭ খ্রী
      |
      ৭. রাজ্যপাল, আ ৯১৭-৫২ খ্রী = ভাগ্যদেবী
      |
      ৮. ২য় গোপাল, আ ৯৫২-৭২ খ্রী
      |
      ৯. ২য় বিগ্রহপাল, আ ৯৭২-৭৭ খ্রী
      |
      ১০. ১ম মহীপাল, আ ৯৭৭-১০২৭ খ্রী
      |
      ১১. নয়পাল, আ ১০২৭-৪৩ খ্রী
      |
      ১২. ৩য় বিগ্রহপাল, আ ১০৪৩-৭০ খ্রী = যৌবনশ্রী
      |

প্রহসিতরাজ　১৩. ২য় মহীপাল
আ ১০৭০-৭১ খ্রী

১৪. ২য় শূরপাল,
আ ১০৭১-৭২ খ্রী

১৫. রামপাল,
আ ১০৭২-
১১২৬ খ্রী

১৬. কুমারপাল,
আ ১১২৬-২৮ খ্রী

১৭. ৩য় গোপাল,
আ ১১২৮-৪৩ খ্রী

বিত্তপাল

রাজ্যপাল

১৮. মদনপাল
আ ১১৪৩-৬১ খ্রী
=চিত্রমতিকা
⋮
১৯. গোবিন্দপাল
আ ১১৬১-৬৫ খ্রী
⋮
২০. পলপাল
আ ১১৬৫-১২০০ খ্রী

(২) চন্দ্রবংশ

১. পূর্ণচন্দ্র, আ ৮৬৫-৮৫ খ্রী
|
২. সুবর্ণচন্দ্র, আ ৮৮৫-৯০৫ খ্রী
|
৩. ত্রৈলোক্যচন্দ্র, আ ৯০৫-২৫ খ্রী=কাঞ্চনা বা কাঞ্চিকা
|
৪. শ্রীচন্দ্র, আ ৯২৫-৭৫ খ্রী
|
৫. কল্যাণচন্দ্র, আ ৯৭৫-১০০০ খ্রী
|
৬. লড়হচন্দ্র, আ ১০০০-২০ খ্রী
|
৭. গোবিন্দচন্দ্র, আ ১০২০-৫৫ খ্রী

(৩) কম্বোজবংশ

(ক) কুঞ্জরঘটাবর্ষ, আ ৯১৫-২৫ খ্রী

(খ) ১. রাজ্যপাল, আ ৯৮০-১০০৫ খ্রী = ভাগ্যদেবী

২. নারায়ণপাল, আ ১০০৫-৩০ খ্রী

৩. নয়পাল, আ ১০৩০-৫৫ খ্রী

(৪) সেনবংশ

বীরসেন

১. সামন্তসেন, আ ১০৬০-৮০ খ্রী

২. হেমন্তসেন, আ ১০৮০-৯৬ খ্রী = যশোদেবী

৩. অরিরাজবৃষভশঙ্কর বিজয়সেন, আ ১০৯৬-১১৫৯ খ্রী = বিলাসদেবী

৪. অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর বল্লালসেন, আ ১১৫৯-৭৯ খ্রী = রামদেবী

৫. অরিরাজমদনশঙ্কর লক্ষ্মণসেন, আ ১১৭৯-১২০৬ খ্রী = অহ্বণদেবী, শ্রিয়াদেবী, কল্যাণদেবী

৬. অরিরাজবৃষভশঙ্কর বিশ্বরূপসেন, আ ১২০৬-২৫ খ্রী

৭. অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর সূর্যসেন, আ ১২১০-১৫ খ্রী — পুরুষোত্তমসেন

(৫) বর্মা রাজবংশ

বজ্রবর্মা

১. জাতবর্মা, আ ১০৫৫-৭৩ খ্রী = বীরশ্রী

২. হরিবর্মা, আ ১০৭৩-১১২৭ খ্রী

অজ্ঞাতনামা পুত্র (?), আ ১১২৭ খ্রী (?)

৩. সামলবর্মা, আ ১১২৭-৩৭ খ্রী = মালব্যদেবী

৪. ভোজবর্মা, আ ১১৩৭-৪৫ খ্রী

(৬) সমতট অঞ্চলের দেববংশসমূহ

(ক) ১. শান্তিদেব, আ ৭২০-৩৫ খ্রী
|
২. বীরদেব, আ ৭৩৫-৫০ খ্রী
|
৩. আনন্দদেব বঙ্গালমৃগাঙ্ক, আ ৭৫০-৭৫ খ্রী
|
৪. ভবদেব অভিনবমৃগাঙ্ক, আ ৭৭৫-৮০০ খ্রী

(খ) কান্তিদেব, আ ৮০০-২৫ খ্রী

(গ) ১. পুরুষোত্তম, আ ১১৮০-১২০০ খ্রী
|
২. মধুমথন বা মধুসূদন, আ ১২০০-১৫ খ্রী
|
৩. বাসুদেব, আ ১২১৫-৩০ খ্রী
|
৪. অরিরাজচাণূরমাধব দামোদর, আ ১২৩০-৫৫ খ্রী
|
৫. অরিরাজদনুজমাধব দশরথ, আ ১২৫৫-৯০ খ্রী = কন্দর্পদেবী

(ঘ) ১. হরিকাল রণবঙ্কমল্ল, আ ১২০৪-৩০ খ্রী
⋮
২. বীরধর, আ ১২৩০-৫০ খ্রী

(৭) শ্রীহট্ট অঞ্চলের রাজবংশাবলী

(ক) ১. ভাস্কর (আ ১১০০-২৫ খ্রী)
|
২. রায়ারি ত্রৈলোক্যমল্ল (১১২৫-৫০ খ্রী) = বসুমতী
|
৩. উদয়কর্ণনিঃশঙ্কসিংহ (আ ১১৫০-৭৫ খ্রী = অহিয়বদেবী
|
৪. বল্লভ (আ ১১৭৫-১২০০ খ্রী)

(খ) ১. খরবাণ নবগীর্বাণ (আ ১১৯০-১২০০ খ্রী)
|
২. গোকুল গোল্হণ (আ ১২০০-১০ খ্রী)
|
৩. নারায়ণ (আ ১২১০-২০ খ্রী)
|
৪. কেশব রিপুরাজগোপীগোবিন্দ (আ ১২২০-৩০ খ্রী)
|
৫. ঈশান (আ ১২৩০-৫০ খ্রী)

তারিখ ও ঘটনাবলীর সারণী

খ্রীস্টাব্দ সাধারণতঃ আনুমানিক।

৭৫০—১ম গোপালের (আ ৭৫০-৭৫ খ্রী) রাজা রূপে নির্বাচন।
দেবপর্বতের আনন্দদেব বঙ্গালমৃগাঙ্কের (আ ৭৫০-৭৫ খ্রী) রাজ্যারম্ভ।

৭৭৫—গোপালের মৃত্যু ও তৎপুত্র ধর্মপালের (আ ৭৭৫-৮১০ খ্রী) সিংহাসন লাভ। ধর্মপালের পঞ্চালদেশের বিরুদ্ধে অভিযানের সূচনা।
দেবপর্বতের আনন্দদেবের মৃত্যু ও তৎপুত্র ভবদেব অভিনবমৃগাঙ্কের (আ ৭৭৫-৮০০ খ্রী) সিংহাসন লাভ।

৭৮৫—প্রতিহার বৎসরাজ (আ ৭৭৫-৮০০ খ্রী) কর্তৃক ধর্মপালের পরাজয়।

৭৮৮—রাষ্ট্রকূট ধ্রুব (আ ৭৮১-৯৪ খ্রী) কর্তৃক ধর্মপালের পরাজয়।

৭৯২—ধর্মপাল কর্তৃক পঞ্চালের ইন্দ্ররাজের পরাজয় ও কনৌজ অধিকার।

… — চক্রায়ুধকে কনৌজ প্রদান।

… — রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে সোমপুরবিহার এবং ভাগলপুর জেলার আন্টিচকে বিক্রমশীলবিহার নির্মাণ।

৮০০—ভবদেবের মৃত্যু। কান্তিদেবের (আ ৮০০-২৫ খ্রী) রাজ্যলাভ।

৮০২—রাষ্ট্রকূট ৩য় গোবিন্দ (৭৯৪-৮১৪ খ্রী) কর্তৃক প্রতিহার ২য় নাগভটের (আ ৮০০-৩৩ খ্রী) পরাজয়। গোবিন্দ মধ্যদেশ আক্রমণ করলে ধর্মপাল এবং চক্রায়ুধ কর্তৃক তাঁর কাছে নতি স্বীকার।

৮০৮—২য় নাগভট কর্তৃক কনৌজ অধিকার এবং ধর্মপালের রাজ্য আক্রমণ করে মুঙ্গের পর্যন্ত অগ্রগতি। তিব্বতরাজ Mu-tig Btsan-po (৮০৪-১৫ খ্রী) কর্তৃক ধর্মপালের পরাজয়। প্রতিহাররাজ ও তিব্বতপতির ধর্মপালের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সন্ধিবন্ধন।

৮১০—ধর্মপালের মৃত্যু ও দেবপালের সিংহাসনলাভ।

… —দেবপাল কর্তৃক যুবরাজ ত্রিভুবনপাল বা হারবর্ষের সম্ভাব্য উৎসাদন।

… —রাজত্বের প্রথম দিকেই পশ্চিমবিহার থেকে গুর্জর-প্রতিহারদের বিতাড়ন।

৮২৫—তিব্বতরাজ Ral-pa-chan (আ ৮১৭-৩৬ খ্রী)-এর গঙ্গাসাগর পর্যন্ত

অগ্রগতি। প্রতিহাররাজ ২য় নাগভটের সঙ্গে তিব্বতপতির সম্ভাব্য সন্ধিবন্ধন এবং সাহায্যের আদানপ্রদান।

৮৩৪—শৈলেন্দ্রবংশীয় যবদ্বীপাদিদেশপতি বালপুত্রদেব কর্তৃক নালন্দায় বৌদ্ধ-বিহার নির্মাণ এবং তাঁর অনুরোধে দেবপাল কর্তৃক পাটনা-গয়া অঞ্চলে সেই বিহারের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান।

৮৪০—দেবপাল কর্তৃক বারাণসী অঞ্চলে পাল অধিকার প্রতিষ্ঠা।

৮৪৭—দেবপালের মৃত্যু এবং তৎপুত্র ১ম শূরপালের সিংহাসনারোহণ।

৮৪৯—১ম শূরপালের মাতা মাহটাদেবী কর্তৃক বারাণসীতে শিব প্রতিষ্ঠা এবং রাজা শূরপাল কর্তৃক চারটি গ্রামদান—দেবতার জন্য দুটি এবং শৈবাচার্য-পর্ষদের জন্য দুটি।

৮৬০—১ম শূরপালের মৃত্যু ও দেবপালের খুল্লতাত-পুত্র ১ম বিগ্রহপালের (আ ৮৬০-৬১ খ্রী) সিংহাসন অধিকার।

৮৬১—১ম বিগ্রহপালের মৃত্যু ও তৎপুত্র নারায়ণপালের (আ ৮৬১-৯১৭ খ্রী) সিংহাসনারোহণ।

৮৮৫—গুর্জর-প্রতিহার ১ম মহেন্দ্রপাল (আ ৮৮৫-৯০৮ খ্রী) কর্তৃক দক্ষিণ-বিহার ও উত্তরবাংলা এবং নিকটবর্তী অঞ্চল অধিকার।

পূর্ণচন্দ্র-পুত্র সুবর্ণচন্দ্রের (আ ৮৮৫-৯০৫ খ্রী) রাজ্যারম্ভ।

৯০৫—সুবর্ণচন্দ্র-পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রের (আ ৯০৫-৯২৫ খ্রী) রাজ্যলাভ।

৯১০—বিহারের অনেকাংশে নারায়ণপাল কর্তৃক স্বাধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

৯১৫—কম্বোজ-বংশীয় গৌড়পতি কুঞ্জরঘটাবর্ষ (আ ৯১৫-২৫ খ্রী) কর্তৃক উত্তরবাংলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

৯১৭—নারায়ণপালের মৃত্যু এবং তৎপুত্র রাজ্যপালের (আ ৯১৭-৫২ খ্রী) রাজ্যলাভ।

৯২৫—রাজ্যপাল কর্তৃক বিহার থেকে উত্তরবাংলা পুনরধিকার। কামরূপসংঘর্ষ।

ত্রৈলোক্যচন্দ্র-পুত্র শ্রীচন্দ্রের (আ ৯২৫-৭৫ খ্রী) রাজ্যারম্ভ।

… —রাজশাহী জেলার ভাতুড়িয়ায় রাজ্যপাল কর্তৃক শিবমন্দিরে ভূমি দান।

৯৫২—রাজ্যপালের মৃত্যু এবং তাঁর পুত্র ২য় গোপালের (আ ৯৫২-৭২ খ্রী) রাজ্যলাভ। বিহারের নালন্দাতে এবং বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার মনধুকু গ্রামে গোপালের রাজত্বকালে মূর্তিপ্রতিষ্ঠা। চন্দ্রবংশীয় শ্রীচন্দ্রের সঙ্গে গোপালের সংঘর্ষ ও কুমিল্লা অঞ্চলে পাল অধিকার বিস্তার।

৯৫৭—পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি অর্থাৎ উত্তরবাংলাতে ২য় গোপাল কর্তৃক ভূমি দান।

৯৭২—২য় গোপালের পুত্র ২য় বিগ্রহপালের (আ ৯৭২-৭৭ খ্রী) রাজ্যলাভ।

৯৭৫—শ্রীচন্দ্রের মৃত্যু এবং তৎপুত্র কল্যাণচন্দ্রের (৯৭৫-১০০০ খ্রী) রাজ্যপ্রাপ্তি।

... — কল্যাণচন্দ্রের হস্তে ২য় বিগ্রহপালের পরাজয়। কামরূপের সহিত যুদ্ধ।

৯৭৭—২য় বিগ্রহপালের পুত্র ১ম মহীপালের (আ ৯৭৭-১০২৭ খ্রী) রাজ্যলাভ।

৯৭৯-৯৮০—কুমিল্লা অঞ্চলে (অর্থাৎ চন্দ্ররাজ্যের কেন্দ্রে) প্রথম মহীপালের অধিকার।

৯৮০—মেদিনীপুর অঞ্চলে কম্বোজ রাজ্যপালের (আ ৯৮০-১০০৫ খ্রী) রাজ্যারম্ভ।

১০০০—কল্যাণচন্দ্রের পুত্র লড়হচন্দ্রের (আ ১০০০-২০ খ্রী) রাজ্যলাভ।

১০০৫—কম্বোজ রাজ্যপালের মৃত্যু এবং তৎপুত্র নারায়ণপালের (আ ১০০৫-৩০ খ্রী) সিংহাসন লাভ।

১০১৯ (বিক্রমাব্দ ১০৭৬)—তীরভুক্তিতে কলচুরি গাঙ্গেয়ের (আ ১০১৫-৪১ খ্রী) অধিকার।

১০২০—লড়হচন্দ্র-পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের (আ ১০২০-৫৫ খ্রী) রাজ্যলাভ।

১০২৪ (৪৮তম বর্ষ)—তীরভুক্তিতে ১ম মহীপালের অধিকার। দক্ষিণবাংলায় চোল আক্রমণ।

১০২৬ (বিক্রমাব্দ ১০৮৩)—বারাণসীতে প্রথম মহীপালের অধিকার। সেখানে বামরাশি নামক গুরুবের জন্য মহীপাল কর্তৃক বিচিত্র ঘণ্টাসহ ঈশানমূর্তি স্থাপন।

১০২৭—১ম মহীপালের পুত্র নয়পালের (আ ১০২৭-৪৩ খ্রী) রাজ্যারম্ভ।

১০৩০—কম্বোজ নারায়ণপালের মৃত্যু এবং তাঁর ভ্রাতা নয়পালের (আ ১০৩০ ৫৫ খ্রী) রাজ্যলাভ।

১০৪১—পালবংশীয় নয়পাল কর্তৃক কলচুরি কর্ণের আক্রমণ প্রতিরোধ। অতিশ (সংস্কৃত 'অতিশয়') দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপন।

১০৪২—অতিশের তিব্বত গমন।

১০৪৩—পালবংশীয় নয়পালের মৃত্যু এবং তাঁর পুত্র ৩য় বিগ্রহপালের (আ ১০৪৩-৭০ খ্রী) সিংহাসনারোহণ।

... — কলচুরি কর্ণের সহিত যুদ্ধ এবং কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ।

১০৫৫—বিক্রমপুরে চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের (আ ১০২০-৫৫ খ্রী) রাজত্বের সমাপ্তি এবং জাতবর্মার (১০৫৫-৭৩ খ্রী) রাজ্যারম্ভ।

১০৬০—রাঢ়ে সামন্তসেনের সামন্ততন্ত্রের সূচনা।

১০৭০-৭৯—৩য় বিগ্রহপালের পুত্র ২য় মহীপালের (আ ১০৭০-৭১ খ্রী) রাজত্ব এবং প্রজাবিদ্রোহে ২য় মহীপালের মৃত্যু।

১০৭১—বরেন্দ্রে দিব্য বা দিব্বোক (আ ১০৭১-৮০ খ্রী) কর্তৃক কৈবর্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা।

১০৭১-৭২—২য় মহীপালের ভ্রাতা ২য় শূরপালের রাজত্ব।

১০৭২—২য় শূরপালের ভ্রাতা রামপালের (আ ১০৭২-১১২৬ খ্রী) রাজত্বের আরম্ভ।

১০৮০—দিব্যের মৃত্যু ও তাঁর ভ্রাতা রুদোকের (আ ১০৮০-৯০ খ্রী) রাজ্যলাভ।

১০৮০—সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেনের (আ ১০৮০-৯৬ খ্রী) রাজ্যারম্ভ।

১০৯০—রুদোকের মৃত্যু ও তৎপুত্র ভীমের (আ ১০৯০-১১০০ খ্রী) রাজ্যলাভ।

১০৯৬—হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেনের (আ ১০৯৬-১১৫৯ খ্রী) রাজ্যারম্ভ।

১১০০—রামপাল কর্তৃক ভীমের পরাজয় ও নিধন এবং বরেন্দ্র পুনরধিকার।

... — সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' রচনা আরম্ভ।

১১২৬—রামপালের পুত্র কুমারপালের (আ ১১২৬-২৮ খ্রী) রাজ্যলাভ।

১১২৮—কুমারপালের পুত্র ৩য় গোপালের (আ ১১২৮-৪৩ খ্রী) রাজ্যারম্ভ।

১১৪৩-৪৫ (বিক্রমাব্দ ১২০১ ও ৩য় বর্ষ)—পাটনা-মুঙ্গের অঞ্চলে ৩য় গোপালের পিতৃব্য মদনপালের (আ ১১৪৩-৬১ খ্রী) অধিকার।

১১৪৬—গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্রের (আ ১১১৪-৫৫ খ্রী) মুঙ্গেরে উপস্থিতি।

১১৫০—মদনপাল (আ ১১৪৩-৬১ খ্রী) কর্তৃক তাঁর ৮ম রাজ্যবর্ষে উত্তর-বাংলায় ভূমিদান।

... —সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'-রচনার সমাপ্তি।

১১৫১—বিজয়সেন কর্তৃক বর্মা রাজবংশের উচ্ছেদ ও রাঢ় থেকে তাঁর রাজধানীর বিক্রমপুরে স্থানান্তর। পশ্চিমদেশে তাঁর নৌ-সেনা প্রেরণ।

১১৫৬-৬১ (১৪শ বর্ষ, ১৮শ বর্ষ-১০৮৩ শকাব্দ)—মুঙ্গেরে মদনপালের অধিকার।

... — বারাণসীতে মদনপালের মন্ত্রী ভীমদেবের উপস্থিতি ও মন্দির নির্মাণ।

১১৫৯—বিজয়সেনের মৃত্যু ও তাঁর পুত্র বল্লালসেনের (আ ১১৫৯-৭৯ খ্রী) সিংহাসনারোহণ।

১১৬১—মদনপালের মৃত্যু। গোবিন্দপালের (আ ১১৬১-৬৫ খ্রী) রাজ্যলাভ।

১১৬৫—পলপালের (আ ১১৬৫-১২০০ খ্রী) রাজ্যারম্ভ।

১১৬৭ (৯ম বর্ষ)—পূর্ববিহারের ভাগলপুরে বল্লালের অধিকার।

১১৬৯-৭০—কোনও মত অনুসারে বল্লাল কর্তৃক 'দানসাগর' রচনা।

১১৬৮-৬৯ বা ১১৬৭-৬৮—কোনও মতানুসারে 'অদ্ভুতসাগর' রচনা আরম্ভ।

১১৭৯—বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের (আ ১১৭৯-১২০৬ খ্রী) সিংহাসন লাভ।

১১৮৫—কলিঙ্গদেশে সমুদ্রতীরে কৃষ্ণ-বলরামের বাসস্থানে (পুরীতে) অর্থাৎ গঙ্গরাজ্যে এবং বারাণসী ও প্রয়াগে অর্থাৎ গাহড়বালরাজ্যে জয়স্তম্ভ-স্থাপনের দাবি। কিন্তু গয়া অঞ্চলে গাহড়বাল জয়চ্চন্দ্রের অধিকার।

১১৯২—তুর্কী মুসলমানের হস্তে গাহড়বালরাজ জয়চ্চন্দ্রের পরাজয়।

১১৯৩—গাহড়বাল রাজ্যে বারাণসী প্রভৃতি স্থানে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠা।

...—ঐ সময় বিহারে তুর্কী মুসলমান সেনানী ইখ্‌তিয়ার্ উদ্দীন্ মুহম্মদ্ বিন্ বখ্‌তিয়ার্ খল্‌জী কর্তৃক ওদন্তপুরী বিহার (বর্তমান বিহারশরীফ) অধিকার।

১২০২-০৩ (শকাব্দ ১১২৪)—ইখ্‌তিয়ার্ উদ্দীন্ মুহম্মদ্ কর্তৃক নওদীয়া বা নোদীয়া (নবদ্বীপ) অধিকার এবং সেখান থেকে লক্ষ্মণসেনের বিক্রমপুরে পলায়ন। তারিখটি 'শেকশুভোদয়া' ও 'পগ্-সম্-জোন্ জংগ্' থেকে গৃহীত।

১২০৫, মে ১০ (হিজরী ৬০১, ১৯ শে রমজান)—ইখ্‌তিয়ার্ উদ্দীন্ মুহম্মদ কর্তৃক গৌড় অধিকার এবং মুহম্মদ ঘুরীর নামে 'গৌড়-বিজয়' স্মারক টঙ্ক (স্বর্ণমুদ্রা) প্রচার।

১২০৬—লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের (আ ১২০৬-২৫ খ্রী) সিংহাসনারোহণ।

১২১০—বিশ্বরূপের ব্যাধি বা শত্রুহস্তে বন্দিত্ব এবং সেজন্য তাঁর পুত্র সূর্যসেনের (আ ১২১০-১৫ খ্রী) তাঁর স্থলে সিংহাসনে অভিষেক।

১২১৫—সূর্যসেন কর্তৃক বিশ্বরূপের হস্তে রাজ্যভার পুনঃপ্রদান।

১২২৫—বিশ্বরূপের মৃত্যু।

১২৪৩/১২৬০—'তবকাৎ-ই-নাসিরী'-র মতে ১২৪৩ কিংবা ১২৬০ খ্রীস্টাব্দের পরে সেনবংশের রাজত্বের অবসান। বোধহয় দেববংশীয় দশরথ (আ ১২৫৫-৯০ খ্রী) সেনবংশ উৎখাত করেন। তাঁর রাজত্বের শেষদিকের আদাবাড়ি শাসন বিক্রমপুর থেকে প্রদত্ত। তাতে মনে হয়, বিক্রমপুর থেকে সেনবংশের উৎসাদন ১২৬০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী।

১২৮১—সোনারগাঁয়ের রাজা দনুজরায় (অরিরাজদনুজমাধব দশরথদেব) কর্তৃক দিল্লীর সুল্‌তান্ ঘিয়াস্ উদ্দীন্ বল্‌বনের সংগে তুগ্রিলখাঁর বিরুদ্ধে চুক্তিবন্ধন।

১২৯০—দশরথের মৃত্যু।

...—পূর্ববাংলায় মুসলমান অধিকারের প্রসার।

প্রমাণপঞ্জী

এইগ্রন্থের ১০-৩৪ পৃষ্ঠায় অনেকগুলি রাজশাসন, প্রশস্তি, কোনও রাজার রাজ্যকালে অনুলিখিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতির মৌলিক আলোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিতান্ত প্রয়োজন বোধে অন্যত্রও এইরূপ নির্দেশ অবশ্যই দিয়েছি; কিন্তু সেগুলির সংখ্যা খুব কম। তাই এখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সাহায্যের জন্য কিছু প্রমাণের নির্দেশ সংযোজনের চেষ্টা করা গেল।

নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে আলোচিত সমস্যাসমূহ মোটামুটি বুঝতে পাঠকের সহায়ক হবে।

গ্রন্থ

১. এফ. এ. খাঁ রচিত Mainamati—a Preliminary Report on the Recent Archaeological Excavations in East Pakistan, Karachi, 1963.

২. রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত গৌড়রাজমালা, রাজশাহী, ১৯১২।

৩. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৩০।

৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার কৃত History of Ancient Bengal, Calcutta, 1971.

৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত History of Bengal, Vol. I, Dacca, 1943.

৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং অন্যান্য দ্বারা সম্পাদিত সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিতম্', রাজশাহী, ১৯৩৯।

৭. ননীগোপাল মজুমদার কৃত Inscriptions of Bengal, Vol. III, Rajshahi, 1929.

৮. B. M. Morrison's Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal, Arizona, 1970.

৯. B. M. Morrison's Lalmai a Cultural Center of Early Bengal, Washington.

১০. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কৃত গৌড়লেখমালা, রাজশাহী, ১৯১২।

১১. H. G. Raverty's translation of Minhajuddin's Tabaqat-i Nasiri, Calcutta, 1880.

১২. হেমচন্দ্র রায় কৃত Dynastic History of Northern India, Vol. I, Calcutta, 1931.

১৩. দীনেশচন্দ্র সরকার প্রণীত Epigraphical Discoveries in East Pakistan, Calcutta, 1973.

১৪. দীনেশচন্দ্র সরকার কৃত শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৯৮২।

১৫. দীনেশচন্দ্র সরকার কৃত Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization, Vol. II, Delhi, 1981.

১৬. দীনেশচন্দ্র সরকার প্রণীত Some Epigraphical Records of the Medieval Period from Eastern India, New Delhi, 1979.

১৭. দীনেশচন্দ্র সরকার কৃত Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, Delhi, 2nd edition, 1971.

১৮. দীনেশচন্দ্র সরকার রচিত Studies in the Society and Administration of Ancient and Medieval India, Vol. I—Society, Calcutta, 1967.

১৯. সরসীকুমার সরস্বতী কৃত পালযুগের চিত্রকলা, কলিকাতা, ১৯৭৮।

২০. বিনয়চন্দ্র সেন প্রণীত Some Aspects of the Inscriptions of Bengal, Calcutta, 1940.

প্রবন্ধ

রমেশচন্দ্র মজুমদার—'বঙ্গে কম্বোজাধিকার', বঙ্গবাণী, চৈত্র, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৯-৫২।

—'Some Dates in the Pala and Sena Records', Journ. R. As. Soc. Ben., Letters, Vol. VII, 1941, pp. 215-18.

—Imadpur Inscription of Mahipala I', Journ. As Soc., Letters, Vol, XVI, 1950, pp. 247 ff. মজুমদার মহাশয়ের পরের রচনায় পরিত্যক্ত।

দীনেশচন্দ্র সরকার—'An Important Date in the Chronology of the Palas', ibid., Vol. XVII, 1951, pp. 27-31 এবং Madanapala and his Successor, ibid,, Vol. XX, 1854, pp. 43-48.

—'Balavalabhibhujanga', Ind. Hist. Quart., Vol. XXVII, 1951, pp. 80-82 ; cf. Vol. XXIX, 1953, p. 294.

—Date of the Imadpur Inscription of Mahipala I', ibid., Vol. XXX, 1954, pp. 382-97.

—Gopala III, Journ. As. Soc., Calcutta, Series IV, Vol.IV, 1962, pp. 5-7 এবং সংস্কৃতবিমর্শঃ, নূতন দিল্লী, ২য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃষ্ঠা ১-৩।

—Brahma-Kshatriya এবং Brahma-Vaisya, Vishveshvaranand Indological Journal, Hoshiarpur, Vol. I, March and September, 1963.

—Rise of Kulinism in Mithila and Bengal, Professor K. A. Nilakanta Sastri Felicitation Volume, Madras, 1971, pp. 349-59.

—Religious Leanings of the Pala Kings of Eastern India, Studies in Indian Epigraphy, Vol. I, 1974, pp. 7-11.

—Mainamati Plates of the Chandra Kings, Sanskrit and Indological Studies (Dr. V. Raghavan Felicitation Volume), Delhi, 1975, pp. 391-94.

—Pala Chronology, Journ. As. Soc., Vol. XVIII, 1976, pp. 97-98 ; Journ. Anc. Ind. Hist., Vol. IX, 1975-76, pp. 97 ff. ; Zeitschrift der Deutchen Morgenlaendischen Geselschaft, 1977, pp. 964-69.

—Date of the Irda and Kalanda Plates, Aspects of History of Orissa, Vol. III, Dept. of History, Sambalpur University, 1981, pp. 1-5.

—An Aspect of Early Indian Religious Life, K. P. Jayaswal Commemoration Volume, Patna, 1981, pp.424-27.

—Some Facts about Mahipala and the Kambojas, Seminar on Early Historical Perspective of North Bengal, Souvenir, Balurghat College, 1982, pp. 3-7.

—Rajibpur Sadasiva Image Inscription of Year 14 of Gopala III, Journal of the Orissa Research Society, Vol. II, 1982 (in the press).

—Election of King by the Subjects, K. P. Jayaswal Volume, Patna (in the press).

—The Kamboja Kings of Bengal, K. K. Handiqui Volume, Gauhati (in the press).

—The Gangaridai, Journal of the Asiatic Society of Bangaladesh (in the press).

—Gomindrapala, Dr. Radhagovinda Basak Felicitation Volume, University of Burdwan (in the press).

—A Matha of the Vaishnava Parivrajakas, Bangladesh Lalitkala, Dacca Museum (in the press).

—Buddha Image Inscription from Burma, Year 497, Ep. Ind. (in the press).

—Vishnu Image Inscription of Surapala I, Year 12, Ep. Ind. (in the press).

রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী—Harikela and related Coinages, Journ. Anc. Ind. Hist., Vol. X, 1976-77, pp. 166 ff.

পত্রিকাদির নাম-সংক্ষেপের সম্প্রসারণ

An. Rep. Ind. Ep.—Annual Report on Indian Epigraphy, Archaeological Survey of India.

A. S. I. An. Rep.—Archaeological Survey of India: Annual Report.

A. S. I. Memoir—Memoirs of the Archaeological Survey of India.

A. S. I. Reports—A. Cunningham's Archaeological Survey of India Reports.

Ep. Ind.—Epigraphia Indica, Archaeological Survey of India.

ibid.=in the same work, পূর্বোক্ত পুস্তকে।

Ind. Ant.—Indian Antiquary, Bombay.

Ind. Cult.—Indian Culture, Calcutta.

Ind. Hist. Quart.—Indian Historical Quarterly, Calcutta.

Ind. Mus. Bul.—Indian Museun Bulletin, Calcutta.

Ins. Beng.—N. G. Majumdar's Inscriptions of Bengal (Vol. III), Rajshahi, 1929.

Journ. Anc. Ind. Hist.—Journal of Ancient Indian History, Calcutta.

Journ. As. Soc.—Journal of the Asiatic Society, Calcutta.

Journ. As. Soc. Beng.—Journal of the Asiatic Society of Bengal—name of Journ. As. Soc. for many years.

Journ. Bih. Or. Res. Soc.—Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Patna.

Journ. Bih. Res. Soc.—Journal of the Bihar Research Soc., Patna—later name of Journ. Bih. Or. Res. Soc.

Journ. R. As. Soc. Beng. (or Journ. R.A.S.B.)—Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal—name of Journ. As. Soc. for some years.

Journ. Proc. As. Soc. Beng.—Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

loc. cit.=at the place cited, পূর্বোল্লিখিত স্থানে।

Proc. As. Soc. Beng.—Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

Reports=A. S. I. Reports.

Select Inscriptions—D. C. Sircar's Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization, Vol. I, Calcutta, 2nd edition, 1965 ; Vol. II, Delhi, 1981.

Stud. Yugapur. Oth. Texts—D. C. Sircar's Studies in the Yugapurana and Other Texts, Delhi, 1974.

V. R. S. Monograph—Monograph published by the Varendra Reseach Society, Rajshahi.

শুদ্ধি ও সংযোজনী

দ্রষ্টব্য—যেসব মুদ্রণপ্রমাদ এখানে বর্জিত হয়েছে, তন্মধ্যে রয়েছে 'য' ও 'ষ'-এর মধ্যে বিপর্যয়। সম্প্রতি পাটনাজেলার অঙ্গ থেকে নালন্দা একটি স্বতন্ত্র জেলা গঠিত হওয়ায়, নিম্নলিখিত পৃষ্ঠা/পঙ্‌ক্তিসমূহে ভুলসংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে—১১।২৮, ১২।১১, ১৬।৬, ১৮।১৬ এবং ১৯।১২। ১৫৭/১, ১৫৯/৩, ১৬০/১০ প্রভৃতি স্থানে 'বাংলাদেশ' স্থলে 'বঙ্গদেশ' পঠিতব্য।

পৃষ্ঠা/পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ/সংযোজন	শুদ্ধ
৭।১৫	উপদান	উপাদান
১০।১১	৭৭৫-৮১৩	৭৭৫-৮১০
১০।১৮	সংযোজন—দীনেশচন্দ্র সরকার, Select Inscriptions, Vol. II, Delhi, 1981, pp. 63ff.	
১১।১১	৮১২-৫০	৮১০-৪৭
১১।২৮	ঘোষরাবা	ঘোষরাবাঁ
১২।৬	৮৫০-৫৮	৮৪৭-৬০
১২।২৫	সংযোজন—(৭) গয়া সংগ্রহশালায় রক্ষিত পিতলমূর্তিলেখ ; ১২শ বর্ষ। বর্তমান গ্রন্থের ৫ম পরিশিষ্টে (পৃষ্ঠা ১৭৪-৭৫) প্রকাশিত।	
১২।২৬	৮৫৮-৬০	৮৬০-৬১
১২।২৮	৮৬০-৯১৭	৮৬১-৯১৭
১৩।২৪	টীকা সংযোজন—Lalit Kala (No. 19, pp. 29-32) পত্রিকায় সদাশিব গোরক্ষকর 'Some Inscribed Balarama Images from Eastern India' প্রবন্ধে রাজ্যপালের ৩৭শ রাজ্যবর্ষে রাজগৃহ-বিষয়ের কোনও গ্রামে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি রাজ্যাঙ্ক ৩৭শ শুদ্ধভাবে পড়তে পেরেছেন বলে মনে হয় না। পাঠ সম্ভবতঃ—৩২শ।	
১৪।৯	সংযোজন—২০ পৃষ্ঠায় ৩য় গোপালের ৩নং অভিলেখ দ্রষ্টব্য।	
১৫।২০	সংযোজন—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	
১৬।১৬	Combridge	Cambridge

পৃষ্ঠা/পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ/সংযোজন	শুদ্ধ
১৭।২০	১৩শ	১৪শ
১৮।২৮	Journ.	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, Proceedings
২০।৪	Vol. VII	Vol. VII, 1941
২০।১২	Journ.	L. D. Barnett, Journ.
	সংযোজন—পুথির চিত্রগুলিকে সরসীকুমার সরস্বতী তৃতীয় গোপালের আমলের বলেছেন (পালযুগের চিত্রকলা, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯)। উপরে ১৪ পৃষ্ঠায় ৫নং দ্রষ্টব্য।	
২০।২৬	আরমী	আরমা (মুঙ্গের জেলা, বিহার)
২১।১৫	Journ./1879	E.B. Cowell ও J. Eggeling, Journ./1876
২২।২০	Journ. 1893	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, Journ./ LXII, 1893
২২।২৭-২৮	নং (১৩) কেটে দিতে হবে।	
২৫।৩	তাম্রশাসন	তাম্রশাসন ; ৮ম বর্ষ।
২৫।৭	সংযোজন—অপ্রকাশিত।	
২৫।২৭	; ২৩শ	মূর্তিলেখ ; ২৩শ
২৮।২২-২৪	পঠিতব্য—(৪) বকুলতলা (সুন্দরবন, ২৪ পরগণা জেলা, পশ্চিমবাংলা) তাম্রশাসন ; সম্ভবতঃ ৩য় বর্ষ। ননীগোপাল মজুমদার, Ins. Beng., Vol. III, pp. 169-71.	
২৯।১১	তাম্রশাসন	তাম্রশাসন ; ১৩শ ও ১৪শ রাজ্যবৎসর উল্লিখিত।
৩২।৩, ৮	ডোম্মন	ডোম্মণ
৩২।৮	মডোম্মন	মডোম্মণ
৩২।২৪-২৮	টিপ্পনী সংযোজন—দশরথের দুটি শাসনের মধ্যে আদাবাড়ি শাসন সেনবংশ উৎসাদনের পর বিক্রমপুর থেকে প্রচারিত। পাকামোড়া শাসন তার পূর্ববর্তী। দুটি শাসনই অপ্রকাশিত।	
৩৩।৬	শকাব্দ ১১৪২	শকাব্দ ১১৪১
৪১।৮	প্রান্তস্থিত	প্রান্ত বা অন্যত্রস্থিত
৪১।১৩	ভাগলপুর	মুঙ্গের-ভাগলপুর

পৃষ্ঠা/পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ/সংযোজন	শুদ্ধ
৪২।শেষছত্র	১২২৬	১১২৬
৪৪।	দ্বিতীয় অধ্যায়	দ্বিতীয় অধ্যায়—পালযুগের সূচনা
৪৪।১৪	৬৬ বর্ষ	৬৬তম্ বর্ষ
৪৬।১৬	৭২৪-৬০	৭২৪-৬১
৪৮।	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—গোপালকর্তৃক	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—প্রথম গোপালকর্তৃক
৬১।২০	বঙ্গপতিতে	বঙ্গপতিকে
৬২।২	প্রতুকে	প্রভুকে
৬৯।শেষপঙ্‌ক্তি	ভাষ্যতত্ত্ববিদ্‌	ভাষাতত্ত্ববিদ্‌
৭৭।২৩	রাজ্যপালের	পালবংশীয় রাজ্যপালের
৮১।১৫	পুনরুদ্বার	পুনরুদ্ধার
৮৬।২১	কোটিদর্ধ	কোটিবর্ষ
৯০।২৬-২৯	পরিত্যাজ্য—স্থানটি গঙ্গা ও করতোয়ার……জানা আছে।	
৯৬।৯	সংযোজন—১১৯ পৃষ্ঠার আলোচনা দ্রষ্টব্য।	
৯৮।৪-৫	ডোম্মনপাল	ডোম্মণপাল
১০৬।২২	সংযোজন—প্রাচীন হরিকেল রাজ্যের কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। কেউ কেউ এই মুদ্রার সঙ্গে আরাকানের চন্দ্রবংশীয় মুদ্রার তুলনা করেন। সপ্তম শতাব্দীর বহুকাল পরে প্রায় ১২শ-১৩শ শতাব্দীতেও কিন্তু হরিকেলের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। কতকগুলি হরিকেলমুদ্রা ত্রিপুরারাজ্যের বেলোনিয়াতে আবিষ্কৃত হয়েছিল।	
২০৬।২৫	চালুক্য	চালুক্য
১০৭।২৯	দিল	ছিল
১০৮।৮	কোন লেখ অবিষ্কৃত	কোনও লেখ আবিষ্কৃত
১১০।২৩	সংযোজন—লড়হচন্দ্র নামক কবির রচনার নমুনা সংস্কৃত শ্লোকসংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়। নামটি খুব সাধারণ নয়; তাই মনে হয়, এই কবি চন্দ্রবংশীয় রাজা লড়হচন্দ্র ব্যতীত আর কেউ নন।	
১১৫।৬	ডোম্মনপালের	ডোম্মণপালের
১২[illegible]।১৮	ইস্টদেবতা	ইষ্টদেবতা
১২৯।১১	টিপ্পনী সংযোজন—সাধারণতঃ 'কাশি' বলতে কাশিজাতি বা কাশি	

পৃষ্ঠা/পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ/সংযোজন	শুদ্ধ

জনপদ এবং নগরী বোঝাতে 'কাশী' ব্যবহৃত হয়। কাশিজাতি বা জনপদের রাজাকেও অবশ্য 'কাশি' বলা যায়।

পৃষ্ঠা/পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৪।১, ১৮	অহ্বনদেবী	অহ্বণদেবী
১৩৪।১৪	বিশ্বেশ্বরের	বিশ্বরূপের
১৩৬।২৬, ১৪১।১৭	১২৪৫	১২৪৩
১৪২।১৭	সেনরাজ	সেনরাজের উৎসাদন
১৪৩।৬	চুন্দা	চুন্দা

১৪৩।শেষপঙ্‌ক্তি সংযোজন—কুমিল্লার নিকটবর্তী ময়নামতীতে পট্টিকেরার কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।

ময়নামতীতে প্রাপ্ত মুদ্রামধ্যে ৭ম-৮ম শতকে প্রচারিত গুপ্তানুকৃত স্বর্ণমুদ্রা এবং ঐ সময়ের এবং পরবর্তী কালের নানা নামযুক্ত বৃহৎ রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এই মুদ্রা স্থানীয় পোদ্দারদের দ্বারা প্রচারিত; কোনও রাজসরকারকর্তৃক প্রচারিত বলে মনে হয় না। সবক্ষেত্রে নামগুলি স্থানীয় রাজাদের নাম কিনা, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। অনেক ক্ষেত্রেই কোনও সুপরিচিত রাজার নাম নিঃসন্দেহে পড়া গিয়েছে বলে স্থির করা কঠিন। এগুলির বেশীর ভাগ হয়তো মুদ্রাপ্রচারক পোদ্দারদের নাম। আর একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই মুদ্রাগুলির ব্যবহার বাংলার দক্ষিণপূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, পাল-সেন রাজাগণের রাজ্যে এর ব্যবহার অনুপ্রবিষ্ট হয় নি। বহির্বাণিজ্যের জন্য প্রচারিত হলে এই মুদ্রা বাইরে পাওয়া যেত।

পৃষ্ঠা/পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৭।১	শিলালেখে	শিলালেখে দেখা যায়
১৫৪।১৮	হলেছে	হয়েছে
১৭০।৫	অঙ্কল	অঞ্চল

১৭৪।৯ সংযোজন—Mrs. Huntington-এর কাছ থেকে আমি পরে জানতে পারি যে, মূর্তিটি এখন গয়া সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

পৃষ্ঠা/পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৪।১৫	আনুমানিক	আনুমানিক
১৭৪।২৭	৭৭৮	৭৭৫

গ্রন্থকার-পরিচিতি

দীনেশচন্দ্র সরকার।—পিতামাতা—যজ্ঞেশ্বর এবং কুসুমকুমারী। জন্ম—শনিবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ (৮ই জুন, ১৯০৭)। জন্মস্থান—পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার প্রধাননগরের কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কৃষ্ণনগর বা শালকাঠী কৃষ্ণনগর গ্রাম।

বিদ্যালাভ।—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স (Honours) সহ বি. এ. (১৯২৯) ; প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি (লেখবিদ্যা ও মুদ্রাতত্ত্ব শাখা) বিষয়ে এম. এ. —প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণ-পদক ও পুরস্কার প্রাপ্তি (১৯৩১) ; প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (১৯৩৪), ডক্টর অব ফিলজফী (Ph. D.) উপাধি (১৯৩৬) এবং মুআট (Mouat) স্বর্ণপদক (১৯৩৭) প্রাপ্তি।
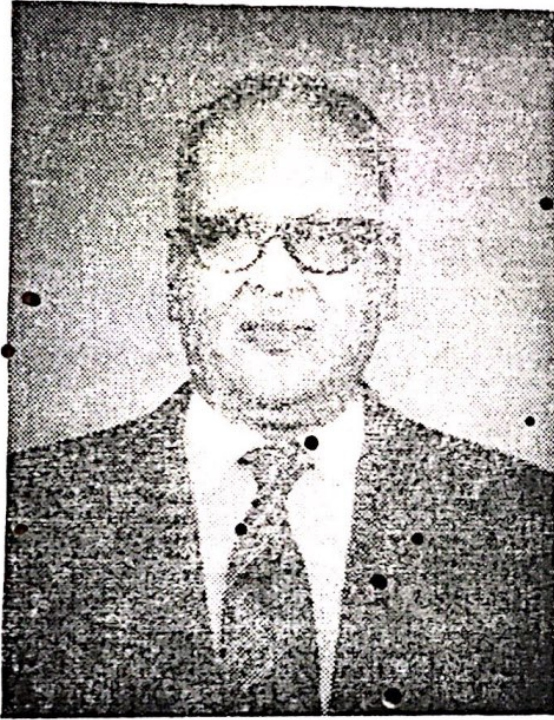
কর্মজীবন।—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে লেকচারার (১৯৩৭-৪৯)। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের লেখবিদ্যা শাখায় প্রথমে অ্যাসিসট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট ফর এপিগ্রাফী ও পরে সুপারিনটেনডেন্ট ফর এপিগ্রাফী (১৯৪৯-৫৫) এবং Government Epigraphist for India (১৯৫৫-৬১—১৯৫৭ সালে কয়েকমাস বাদে)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির Carmichael Professor (১৯৬১-৭২), ঐ বিভাগের প্রধান (১৯৬৫-৭২) এবং বিভাগীয় উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ (১৯৬৫-৭৪)। Visting Professor—পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলাডেলফিয়া, ইউ. এস. এ. (১৯৭৪) ;

ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৭-৭৮), এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৮) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন (১৯৭৮-৭৯)। অধিকন্তু, উল্লেখ্য Visiting Lecturer—তাসকেন্ত, লেনিনগ্রাদ এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ. এস. এস. আর. (১৯৬১), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের National Lecturer in History (১৯৭১-৭২), ইত্যাদি।

বিদেশীয় সম্মেলনাদিতে যোগদান।—দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ক সম্মেলন, স্কুল অব ওরিয়েন্ট্যাল অ্যান্ড্ অ্যাফ্রিক্যান্ স্টাডিজ্, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৬); কুষাণ সংস্কৃতি বিষয়ক সম্মেলন, দুশানবে, তাজিকিস্তান, ইউ. এস. এস. আর. (১৯৬৮); বাংলাদেশ ইতিহাস কংগ্রেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৩); বাংলার শিল্পকলা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আলোচনা সম্মেলন, ঢাকা সংগ্রহশালা (১৯৭৬); জর্মান প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্গণের সম্মেলন, পশ্চিমবার্লিন (১৯৮০); ইত্যাদি।

বিশেষ বক্তৃতা (Endowment Lectures) দান—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (রঘুনাথ প্রসাদ নোপানী, ১৯৬২-৬৩, ও বিশ্বেশ্বরলাল মোতীলাল হালওয়াসিয়া, ১৯৬৮); লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় (ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী, ১৯৬৪); মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (Sir William Meyer, ১৯৬৬); পঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়, পাটিয়ালা (সীতারাম কোহলী, ১৯৭২); আতমবাপু গবেষণাকেন্দ্র, ইমফাল (আতমবাপু শর্মা, ১৯৭৩); বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলকাতা (রামলাল হালদার ও হরিপ্রিয়া দেবী, ১৯৭৭); আন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের পুরাতত্ত্ব ও সংগ্রহশালা বিভাগ, হায়দরাবাদ (মল্লংপল্লি সোমশেখর শর্মা, ১৯৮০); রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিট্যুট অব কালচার, কলকাতা (লীলা ব্যানার্জী, ১৯৮০); বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন (সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮১); ইত্যাদি।

অন্যান্য কয়েকটি বক্তৃতা।—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬২, ১৯৭০); মগধ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৮); কর্ণাটক (ধারওয়াড়) বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৯); মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৯); ভারতবিদ্যা ও সংগ্রহশালা বিষয়ক বিদ্যার উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র, বিরলা সংগ্রহালয়, ভূপাল (১৯৭৪); উইস্কন্সিন্ (ম্যাডিসন্ ও অশ্কশ্), পেন্সিলভ্যানিয়া (ফিলাডেলফিয়া), মিশিগান ও কলাম্বিয়া (নিউইয়র্ক) বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওরিয়েণ্ট্যাল ক্লাব, ফিলাডেলফিয়া, ইউ. এস. এ. (১৯৭৪); ফ্রী য়ুনিভার্সিটি অব বার্লিন (পশ্চিমবার্লিন) এবং বন,

কো এল্‌নে, মারবুর্গ, হাইদেলবার্গ ও ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমজর্মানী (১৯৮০) ; ইত্যাদি।

অধিকন্তু এদেশে বিহার গবেষণা সমিতি (পাটনা, ১৯৬২), বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৯), নিখিল উড়িষ্যা ইতিহাস কংগ্রেস (ভুবনেশ্বর, ১৯৬৯), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ (১৯৭০), কলকাতা সংস্কৃত কলেজ (১৯৭১ ও ১৯৭৯), সাগর, জওয়াহরলাল নেহরু (নয়াদিল্লী) ও মেরাঠ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭২), কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি (গৌহাটি, ১৯৭৩), ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪), ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণা সমিতি (পুনা, ১৯৭৫), শ্রীবেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় (তিরুপতি, ১৯৭৮), ভারতীয় সংগ্রহালয় পরিষদ (ডক্টর মোতীচন্দ্র বক্তৃতা, ১৯৮০) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতাদান উল্লেখনীয়।

সম্মানলাভের কয়েকটি উদাহরণ।—সভাপতি, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আদিমধ্যযুগ শাখা (১৯৪৮), ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব পরিষদ (১৯৫৫ ও ১৯৫৬), অখিলভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের ইতিহাস শাখা (১৯৫৭), ভারতবিদ্যা শিক্ষার আধুনিকীকরণ বিষয়ক আলোচনা সম্মেলন, গুজরাত বিদ্যাপীঠ, আহমদাবাদ (১৯৭২), ভারতীয় পুরাভিলেখ পরিষদ (১৯৭৫), বাংলার মুদ্রা-বিষয়ক আলোচনা সভা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৮), উট্টঙ্কিত বিদ্যা অরণ্য ট্রাস্ট, মহীশূর (১৯৮১), ইত্যাদি।

এ ছাড়া উল্লেখ করা যায়, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের সাহিত্য শাখা (মগধ বিশ্ববিদ্যালয়, বোধগয়া, ১৯৭২), নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখা (আগরতলা অধিবেশন, ১৯৭৪), অরুণাচল সরকারের গবেষণা বিভাগীয় রজতজয়ন্তী সম্মেলনের ইতিহাস শাখা (শিলং, ১৯৭৭) প্রাক্‌কুষাণ যুগের মথুরাবিষয়ক সম্মেলনের শাখাবিশেষ (মাক্স্ মুএলার ভবন, নয়া দিল্লী, ১৯৭৭), প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ভৌগোলিক পটভূমিবিষয়ক সম্মেলন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৯৭৯), প্রত্নলেখবিদ্যা, ও ভারতীয় ভাস্কর্য বিষয়ক সম্মেলনের শাখাবিশেষ (অ্যামেরিক্যান ইন্‌স্টিট্যুট অব্ ইণ্ডিয়্যান স্টাডিজ, বারাণসী, ১৯৮০), কুষাণ যুগের মথুরাবিষয়ক সম্মেলনের প্রত্নলেখবিদ্যা শাখা (ঐ, নয়া দিল্লী ও মথুরা, ১৯৮০) প্রভৃতিতে পৌরোহিত্য।

মূল সভাপতি (General President), অখিল ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা

সম্মেলন (১৯৭২), ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস (১৯৮০) এবং আন্ধ্রপ্রদেশ ইতিহাস কংগ্রেস (১৯৮০)।

বিশেষ সম্মান লাভ।—সম্মানিত সদস্য, ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব পরিষদ (১৯৭১), পুরাতত্ত্ব পরিষদ (১৯৭৪) ও পুরাভিলেখ পরিষদ (১৯৭৪), বিহার গবেষণা সমিতি (পাটনা, ১৯৭৪), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (কলকাতা, ১৯৭৭), বিহার পুরাতত্ত্ব এবং সংস্কৃতি পরিষদ (গয়া, ১৯৮১), পুরাতত্ত্ব সংসদ (কলকাতা, ১৯৮২), ইত্যাদি। Sir William Jones স্মৃতিপদক (এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭২), আকবর পদক (ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব পরিষদ, বারাণসী, ১৯৭৩), সম্মানিত 'বিদ্যাবারিধি' উপাধি (নবনালন্দা মহাবিহার, নালন্দা, ১৯৭৫), ভারতীয় পুরাভিলেখ পরিষদের 'তাম্রপত্র' (১৯৭৮) প্রভৃতির অধিকারী এবং ভারতীয় সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের Honorary Correspondent (১৯৭৫) ও বিভাগীয় School-এর Fellow (১৯৮২), ইত্যাদি।

মূল্যায়ন :—প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অগণিত সমস্যা নিয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার সারাজীবন গবেষণা করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসংখ্যা একাত্তর এবং প্রবন্ধাদির সংখ্যা বার শতের অধিক। রাজনীতিক ইতিহাস, শিলালেখ-তাম্রশাসনাদি, ভূগোল, মুদ্রা, লেখবিদ্যা, ব্যাকরণ, অভিধান, সমাজ, ধর্মজীবন শাসনব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থা, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি, সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালি সাহিত্য, মূর্তিতত্ত্ব প্রভৃতি ভারতবিদ্যাসম্পর্কিত সমস্ত বিষয়েই তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, দীনেশচন্দ্রের নামই তাঁর রচনার উচ্চমানের পক্ষে sufficient guaranty এবং তিনি যা কিছু লেখেন, সে সবের ভিত্তি হল wide, accurate and dependable scholarship, আর সেগুলি হচ্ছে characterised by sound and critical objectivity. বলা হয়েছে যে, "যে তথ্যটি অবিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে নিষ্প্রভ অর্থহীন বলে বোধ হয়, তার উপর ভারতবর্ষের যে-কোনো প্রান্ত থেকে ইতিহাসের যে কোনো যুগ থেকে সংগৃহীত সাহিত্যিক বা প্রত্নলেখগত তথ্যের আলো ফেলে দীনেশচন্দ্র তাকে অনায়াসেই ঐতিহাসিক তাৎপর্যে দ্যুতিমান করে তুলতে পারেন। এই কাজে দীনেশচন্দ্রের সমকক্ষ কেউ নেই, আগেও ছিল না।"[১]

১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি একবার অ্যামেরিকার কোনও Oriental Club-এ

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধীয় কয়েকটি সমস্যা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। Club-এর সম্পাদক মহাশয় তাঁকে so well known around the world as the greatest master now living in this field of study বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (London) পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন, দীনেশচন্দ্রের নাম হচ্ছে a household word in the orientalist circles here.

ভারতীয় লেখবিদ্যা বিষয়ক গবেষণায় দীনেশচন্দ্র জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। Epigraphia Indica পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা ২০৭-টিতে উঠেছে। ওতে এত বেশি প্রবন্ধ আর কেউ লিখতে পারেন নি। বলা হয়েছে যে, এই "বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয় ও অনতিক্রম্য। তাঁর পূর্বেও কেউ তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি, আর দৃষ্টিগম্য ভবিষ্যতেও কেউ তাঁর স্থলবর্তী হতে পারবেন এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।"

নির্ঘণ্ট

অ

আ

খ

নির্ঘণ্ট

পাল-সেন—১৪

ভ

ম

ল

শ

পৃষ্ঠা ৬৪ / পঙ্‌ক্তি ৭ — 'পশ্চিমে' স্থলে 'পূর্বে' পঠিতব্য।
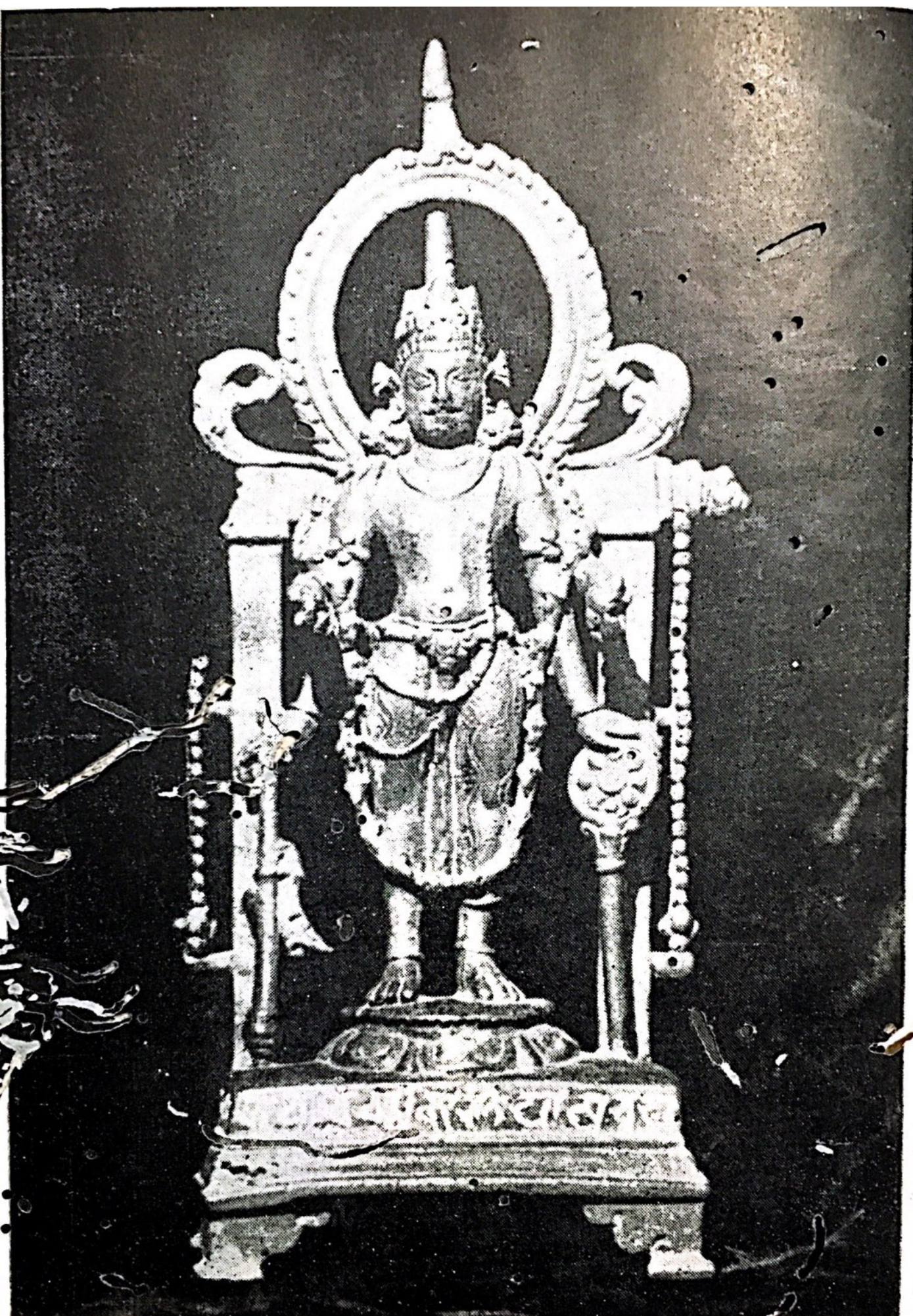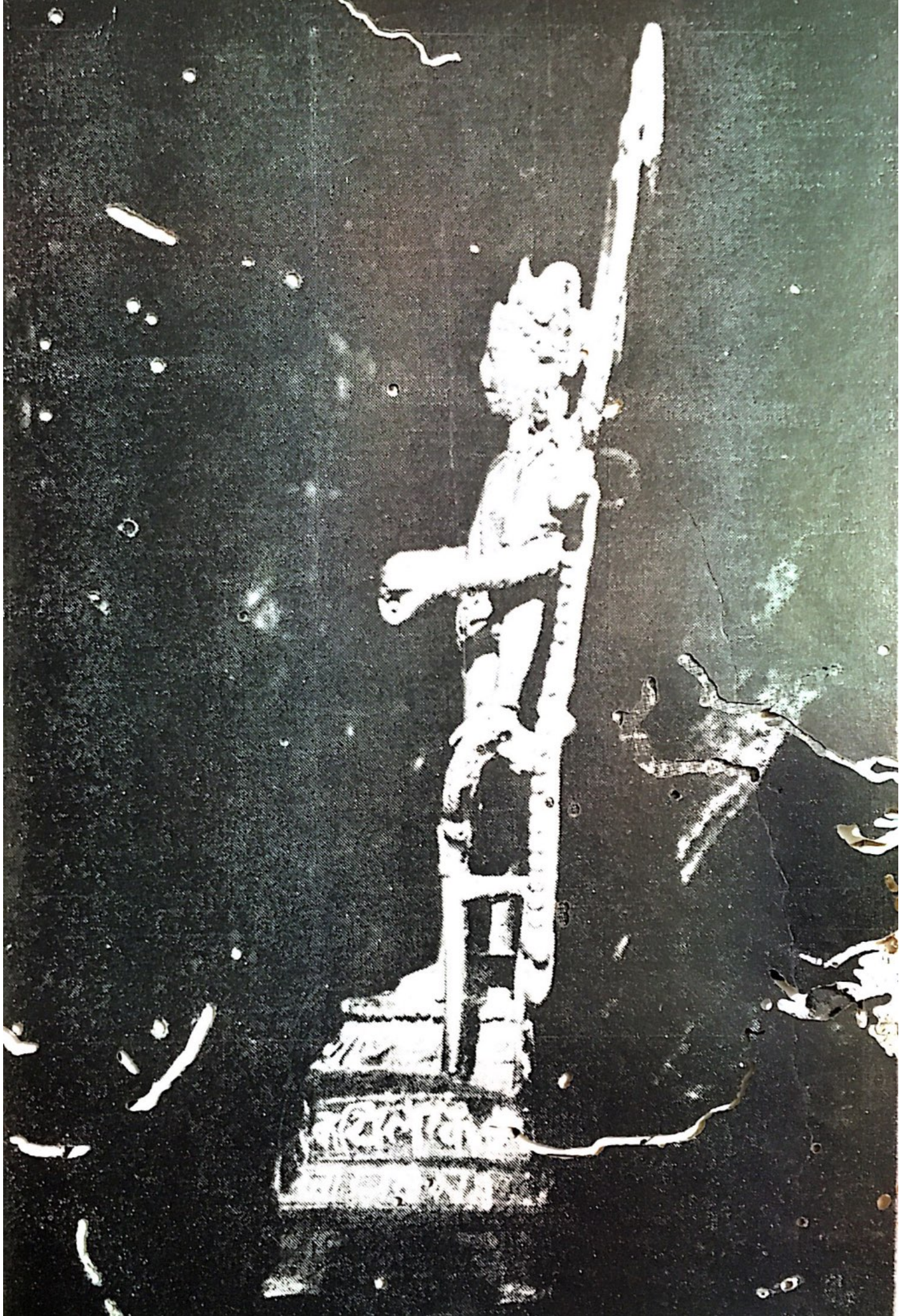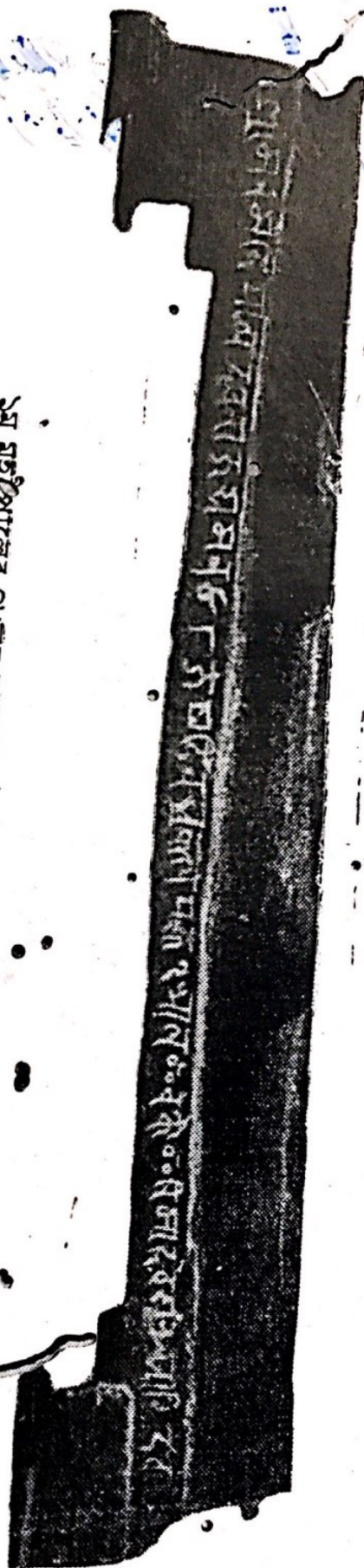
চিত্র নং ১

চিত্র নং ৬

১ম মহীপালের ৪৮তম রাজ্যবর্ষের ইমাদপুর মূর্তিলেখ

চিত্র নং ৮

সেন রাজবংশের সদাশিব-মুদ্রা
(লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসন)

চিত্র নং ৮খ

বা[illegible] অংশ

দক্ষিণ অংশ
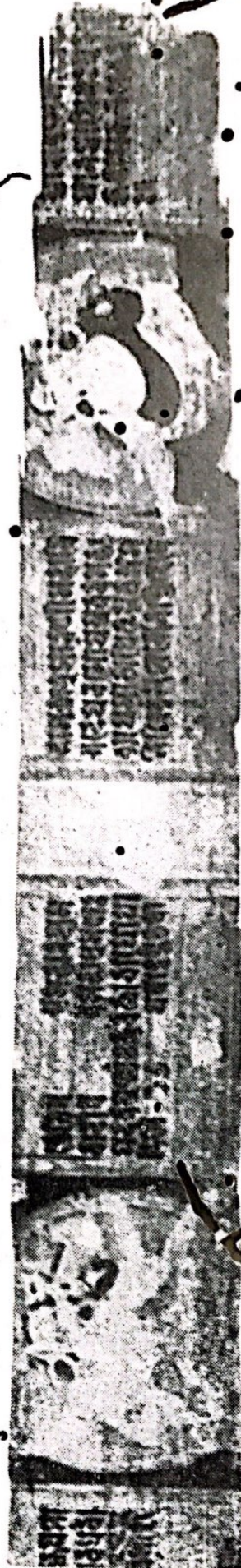
নয়া দিল্লীতে জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত রামপালের ৫৩তম রাজ্যবর্ষে অনুলিখিত পাণ্ডুলিপি